

মেঘের পরে মেঘ

প্রতিভা বসু

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক : শ্রী মৌরেন্দ্রনাথ বসু

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রী বিনয় সাহা

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৫, আগস্ট ১৯৫৮

দাম : টা. ৩.৭৫

মুদ্রক : শ্রী গোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

উৎসর্গ

শ্রীনরেশ গুহ

শ্রীঅর্চনা . হ

কল্পকমলেষু

মেঘের পরে মেঘ

প্রথম খণ্ড

..... এক

‘টিকিট । টিকিট দেখি দাদা ।’

কলকাতার একমাত্র লেল্যাণ্ড বাস । বিদেশ থেকে সন্ত এসেছে, সন্ত তাকে ছাড়া হয়েছে রাস্তায়, বিত্যাংবেগে সে আধঘণ্টায় শ্রীমবাজার থেকে বালিগঞ্জ এসে পৌঁচছে, আবার ফিরে যাচ্ছে ডিপোতে । গাড়ি কালচে নীলের বলকে, রাজরাজেন্দ্রাণীর মতো চলনে, আশ্চর্য হৃন্দর চেহারায় স্তব্ধ ক’রে দিচ্ছে শহরবাসীকে । ফুটপাথে চলতে-চলতে পথিক পাড়িয়ে যাচ্ছে দেখব্রর জন্ত, রাস্তার ধারের দোতলা বাড়ির অধিবাসীরা ছুটে এসে দাঁড়াচ্ছে বারান্দায়, তেতলার জানালা খুলে যাচ্ছে পটাপট ।

এমন একটিমাত্র অপরাধ যানের আরোহী হ’তে কার না শখ পেছে- তখন ? চলন্ত দোতলায় ব’সে, উঁচু থেকে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে করুণ করতে কে না ভালো বেসেছে ? রাজা-মহারাজারাও রোলস্‌স্বয়েল গাড়ি ছেড়ে একদিন উঠেছেন ঞ্টাতে, মহামাত্র রাজকরচারীরা ভ্রম ফেলেছেন নিজেদের দিয়ে, উঠেছেন ভদ্রলোকেরা ভদ্রমহিলারা, ছেলেরা মেয়েরা, যুবকরা যুবতীরা— সব । সবাই । মানসী দত্তমল্লিককে নিয়েও পার্টির পরে একদিন বেড়াবার উপলক্ষে গাড়ি ছেড়ে বাসে চ’ড়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে এলেন তার ভাবী স্বামী সোমেশ্বর বাগচি ।

মানসী একগাল হেসে গালে টোল ফেলে মিষ্টি ক’রে বললো, ‘হৃন্দর তো ।’ সোমেশ্বর দোতলায় উঠতে-উঠতে টলমলায়মান মানসীর হাত ধ’রে ফেলে বললেন, ‘আগে সাবধান । প’ড়ে যাবে— ওপরে চলো, তারপর দেখবে আরো কত হৃন্দর ।’

রাত এগারোটার শেষ বাস, সাংঘাতিক ভিড ছিলো না, কাজেই সামনের দিকেই একটা ফাঁকা আসন পেলে তারা। মানসী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রাস্তা দেখতে ব্যস্ত হ'লো আর সোমেশ্বর দেখতে লাগলেন মানসীকে। কিয়রীকণী মানসী, কোকিলকণী মানসী। যার গানের স্বর সারা বাংলা দেশকে ভাসিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্বের বাতাস মুখর করতে চলেছে, যাকে সোমেশ্বর এতোদিনের চেষ্টায় বিয়েতে মত করাতে পেরে ধন্য হয়েছেন। সেই মানসী যার জন্ম হিন্দুস্থান গাড়ি বেচে স্বেচ্ছা কিনিছেন সম্প্রতি।

এরই মধ্যে উজ্জল দিনের রোদের মতো নীলবেগুনিসব্জ-মেশ। ফ্লুরেসেন্ট আলোয়, চেরা-সিঁথির মতো মাঝখানেব রাস্তা দিয়ে এগুতে-এগুতে, থাকির জোঝা পরা নির্মল কণ্ঠাঙ্কুর দু-পাশের লোক-জনকে সচকিত ক'রে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে 'টিকিট, টিকিট দেখি দাদা' ব'লে চেষ্টায়ে উঠলো।

সোমেশ্বর অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে পয়সার জন্ম হাত দিলেন পকেটে, তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে অক্ষুঁটে বললেন, 'ইডিয়ট।'

বলবার কারণ ছিলো তাঁর। টিকিট চাইতে এসে টিকিট না-নিয়ে হঠাৎ গালে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকা মানসীর অনাবৃত ঘাড় আর পিঠ আর এলানো খোঁপায় ঘেরা গালের এক পাশের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলো নির্মল। চমকেও উঠেছিলো, কিন্তু বাসের কাঁকানিতে বোঝা গেলো না সেটা। ভেতরে-ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা তার লাফিয়ে উঠলো সজোরে। ঠোট নাড়লো মনে-মনে : 'টুনি ! টুনি না ? টুনিই তো !'

শুধু মনে-মনেই নয়, উত্তেজনায় নিজের অবস্থা ভুলে প্রায় ডেকেই উঠেছিলো জোরে। পলা-রং শিফন পরী, চুল রোল করা, নখে রং মাখা,

প্রায় ফর্সা হৃন্দরী স্তগন্ধি মেয়েটির পিঠের উপর প্রায় ছুঁইয়ে ফেলেছিলো নিজের শিরা-ওঠা ঘামে-ভেজা নোংরা হাতটা। সোমেশ্বর তাকে বাঁচালেন হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে। রুষ্ট গলায় বললেন, ‘হাঁ ক’রে আছে। কেন, তাড়াতাড়ি দাও, বালিগঞ্জ।’

তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিলো নির্মল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে যদিও সময় লাগলো। একটু, তবু সহজ হয়েই টিকিট দুটি দিলো, তারপর অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে নেমে এলো একতলায়। এনামেল-করা রূপোলি রড ধ’রে ধুকতে লাগলো অস্বস্থ রোগীর মতো।

সহকর্মী নলিনী এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি, ‘কী হ’লো? শরীর খারাপ করছে নাকি?’

‘বড্ডো।’

‘এই ছাপো। এখন উপায়?’

‘কিছু হবে না। দয়া ক’রে তুমি যদি ওপরে যাও তাহ’লে সুবিধে হয় আমার।’

‘তাই ভালো। ওপরে যা বাকুনি, তুমি নিচেই থাকো।’

নির্মল জবাব না-দিয়ে দাঁড়িয়েই রইলো চুপচাপ। কখন মেয়েটি নামবে তারই অপেক্ষায় যেন কাঁপতে লাগলো ভেতরটা।

দেরি হ’লো না, দু-এক স্টপ পরে নেমে এলো ওরা। প্রথমে সোমেশ্বর, পেছনে মানসী দত্তমল্লিক। আর ওরা নেমে যেতেই চলন্ত বাস থেকে এতোখানি ঝুঁকে পড়লো নির্মল, বৃকের রক্ত তার তোলপাড় ক’রে উঠলো, ইচ্ছে করলো সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাস্তায়। হয়তো লাফিয়ে নামতেও যাচ্ছিলো, কে একজন চিংকার ক’রে ধ’রে ফেললো থাকি বুশশার্টের কাটা কোণ, ধমকালো ‘খেপেছো নাকি হে।’ সারা বাসে একটি গুঞ্জন উঠলো তাকে নিয়ে, হাতের ভাঁজে মাথা রেখে সে যখন সিঁড়ির

ঝড়টাতে হেলান দিলো সবাই বুঝলো গরমে অস্থির হয়েছে লোকটা তাই প'ড়ে যাচ্ছিলো।

ঐ ট্রিপের পরেই সেদিন শেষ হ'লো নির্মলের ডিউটি। মেসে ফিরে এলো। অখিল মিস্ত্রি লেনের নোনাধরা কোনো-এক মাফাতার আমলের তেতলা বাড়ির একতলার ভাপসা-গন্ধ এইটুকু একটি চার-দেয়াল-ঘেরা চৌকো সিমেন্টের ফালিতে এক কোণে একটি গুটোনো বিছানায় ঢেলে দিলো নিজেকে। এতো তার ক্লান্ত লাগলো যে কলে গিয়ে হাত মুখটা পয়স্তু ধুতে ইচ্ছে করলো না। কম আশ্চর্যের কথা নয়, এখনো এই সুদীর্ঘ দশবছর পরেও টুনিকে চিনতে তার এক-পলক দেরি হ'লো না। এই সাজসজ্জা সত্ত্বেও। আর সব চাইতে আশ্চর্য—এখনো, আজও টুনির জন্তে তার হৃদয়ে এতো ব্যাকুলতা, এতো কষ্ট। এখনো মুখে-মুখে চোখ বুলিয়ে সে টুনিকেই খোঁজে। সেই কবেকাব টুনি, তার ছোট্টো টুনি-পাখি, যে-মেয়ে একদিন চিরুনি দিয়ে খোঁপা বাঁধতো, নন্দভুলাল ফুলের মালা মাথায় জড়িয়ে গামছায় মুখ মুছে কপালে খয়েরের টিপ প'রে ব্যাকুল চক্ষু মেলে জামতলায় দাঁড়িয়ে থাকতো তার আশায়। সেই চেহারাটা ভেবে আজও বুক কাঁপলো নির্মলের।

কিন্তু আজকের এই স্ববেশ স্তন্দর, হয়তো বা বিবাহিত মেয়েটির সঙ্গে মিল কই তার? এই মেয়ে আর তাকে চিনবে না কোনোদিন, চিনলেও চেনে বলতে লজ্জিত হবে। ভাবতেও বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

মাথার রগটা টিপে ধ'রে, অন্ধকারে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কত কথাই যে মনে পড়লো। কত ঢেউ যে বৃকের তটে আছাড় খেয়ে আবুলি-বিকুলি করতে লাগলো। কডকড়ে ভাত তেমনি ঢাকা থেকে-থেকে আরো কডকড়ে হ'লো, খাওয়া হ'লো না। দেশলাই সিঁগায়ে

তেমনি প'ড়ে রইলো পাশে। ধরানো হ'লো না। যেন কবেক'র অঙ্ককার
স্মৃতির অরণ্যে হারিয়ে ফেললো রাস্তা, যেন কবেকার কোন জন্ম জন্মান্তর
আগের একটা ধূধু কাহিনী মনে পড়লো কি পড়লো না।

বেড়ে উঠলো রাত, তবু ঘুম নেই। অগ্নদিন ঘুমুতে-ঘুমুতেই ফিরে
আসে কাজ থেকে। এসেই গোটা চারেক সিগারেট টানে, রাস্তার
মোড়ের দোকান থেকে মস্ত এক গ্রাশ চা আনিয়ে পায়, তারপর
বারোয়ারি কলতলায় গিয়ে চৌবাচ্চার তলানি থেকে ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে ঘটি
দিয়ে জল তুলে ছডছড ক'রে মাথায় ঢালে, সবই যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে।
এক খাবায় আধখুঁচড়া ক'রে ভাত খেয়ে অমনি ঢ'লে পড়ে বিছানায়।
তারপর নিটোল একটি স্বপ্নহীন ঘুম।

আজ কী হ'লো? এই মেয়েটি আজ আবার তাকে অশান্ত করলো
কেন? যে-মেয়ে শামলা ছিলো, বিনা কাজলেই যে-মেয়ের চোখ কাজল
ডোবানো ছিলো, লজ্জার ভারে আনত মধুর ছিলো যে-মেয়ের মুখ, তার
সঙ্গে—এই মেয়ের আজ কী মিল খুঁজে পেলো নির্মল কণ্ঠাঙ্কুর যার জগ্ম
শাস্তি গেলো তার, গেলো আহা, গেলো নিদ্রা।

ছোটো চৌকো ঘরের চারকোণে চারজন শোয় তারা। আজ তিন-
জনের ঘুমের ঘন নিশ্বাস ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠলো, অসহ্য হ'য়ে উঠলো
ঘরের গরম, অঙ্ককারে তালপাতার পাখাটা খুঁজলো, তারপর অতিষ্ঠ
হ'য়ে বেরিয়ে এলো সরু গলিটায়। মাথার ওপর বিশাল আকাশের
বিস্তৃতি যেন অনেকটা শাস্তি দিলো মনে। উণ্টোদিকের বাড়ির একতলা
সরু বারান্দায়, যেখানে তিন-চারটে ছাগল রাত কাটায়, পাশে খোলা
ডাস্টবিনটা দুর্গন্ধ ছড়ায়, একটা ঝাঁড় সেই সব চিবোতে-চিবোতে বিমোহ
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, সেখানে সে বসলো। উবু হ'য়ে হাঁটুর উপর তার লম্বা
দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে, তারপর বদলে গেলো ছবি। গলিটা আর গলি

বইলো না, আঁকাবাঁকা কাঁচা বাস্তা হ'য়ে গেলো, কলকাতা শহরটা নিমেষে সবুজ গাছে ঢাকা প'ড়ে গেলো, ফাঁকে-ফাঁকে দেখা গেলো, এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি। ঘোষের বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি, বামুনপাড়া, ফাঁকে-ফাঁকে টলটলে জল, পুকুর, ডোবা আব খানা-খন্দ।

নির্মল কতকাল পরে আবাব ফিবে তাকালো তাব ফেলে-আসা হারিয়ে-যাওয়া সোনার মতো দিনগুলোব দিকে।

.... দুই

প্রিয়নাথবাবু অক্ষম। প্রায় দু-বছর যাবৎ অর্ধাঙ্গ অবশ হ'য়ে প'ড়ে আছেন বিছানায়। শাস্ত সমাহিত হ'য়ে শুয়ে আছেন পিঠের তলায় বালিশ হেলান দিয়ে, তাকিয়ে আছেন জানালায়। দুই চোখে সারা আকাশের মেঘ। প্রিয়নাথবাবুব স্ত্রী নিজের দৈনন্দিন্য নিয়ে অবিরত কপাল চাপড়াচ্ছেন, ভাগ্যকে গাল দিচ্ছেন মুহূর্তে, বকছেন স্বামীকে, বকছেন মেয়েকে, রাগ্না করতে গিয়ে বাড়ন্ত চালের হাঁড়ি দেখে কেঁদে ফেলছেন বরবার ক'রে। এই অভাবেব জালা তিনি সইতে পারছেন না।

আর প্রিয়নাথবাবুর মেয়ে? টুনি? বেচারী দিনরাত ফরমাশ খাটছে মা-র, নিঃশব্দ ঘ্রানমুখে মালিশ ক'রে দিচ্ছে তার দু'খী বাবার সরু পায়ে, বাসন মাজছে, মসলা পিষছে, তালি দিচ্ছে ছেঁড়া কাপড়ে— তবু বকুনি খাচ্ছে পদে-পদে মা-র কাছে। মেয়ের বিরুদ্ধে যেন তাঁর আর নালিশ ফুরোয় না। কেমন ক'রে ফুরোবে? মেয়েটা যে মেয়ে এ-কথা কি এক দণ্ডের জ্ঞাত ভুলতে পাবেন তিনি? যদি তাঁর একটাই সন্তান, তবে সে কেন ছেলে না-হ'য়ে মেয়ে হ'য়ে জন্মালো? সেটা তো সম্পূর্ণই টুনির

দোষ ! অযাচিত হ'য়ে আসবার দরকার ছিলো কী তার ? এ ছাড়াও টুনির মা ননীবালার মেয়ের উপর রাগের আরো-একটি মস্ত কারণ ছিলো : গান করতো টুনি । গলায় তার স্বর যেন উপচে পড়তো সারা-দিন । অনেক দুঃখ-দৈন্তেও সেটাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারতো না, বেড়ে ফেলতে পারতো না । খেজুরের গুঁড়ি-পাতা পুকুর-ঘাটে বাসন মাজতে-মাজতে তার গলা ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করতো । সব কষ্টের তার সেই সঙ্গীটির উপর ননীবালা একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন । নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে রুট গলায় সেই স্বর তিনি ভেঙে খানখান ক'রে দিতেন । কিন্তু নির্মল মুগ্ধ হয়েছে, গান পাগল করেছে তাকে, মনে হয়েছে একটা কিছু না-করলে আর চলে না সত্যি । ব'লে-ক'য়ে ধ'রে-প'ড়ে কতবার কত জনকে নিয়ে এসেছে দু-একটা গান শিখিয়ে দেবার জন্ত । আর সেই গান যখন টুনির গলায় মধু হ'য়ে ঝরেছে, কানায়-কানায় ভ'রে উঠেছে তার হৃদয় ।

গুম হ'য়ে থাকতেন টুনির মা, রাগে গরগর করতেন । বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য ক'রে শোনাতে : 'ইঃ । গান । গান শিখছেন মেয়ে । গান শিখে তিনি আমার তিন কুল ধুয়ে দেবেন । ভদ্রঘরের মেয়ে, তার আবার অত গান-বাজনার কী দরকার ? খেতে নেই শুতে রাঙাপাটি ।' অবিশ্রি তা তো তিনি বলতেই পারেন । গান-বাজনায় যতটুকু সময় টুনি অপচয় করবে সেই সময়টুকু ঘরের কাজে মন দিলে আরো একটু অয়াস হয়ন্তার । টুনি ভয়ে চোর হ'য়ে গেছে । নির্মল বলেছে, 'কী বোকা ! এতো কিসের ভয় ! অভাবে-অশান্তিতে কাকিম্মার মাথার ঠিক নেই ।' তবু চোখ থেকে টুনির ভয়ের ছায়া নামে নি । ও বুড়ো ভীক ছিলো, বড়ো নরম আর শান্ত ।

• কিন্তু ননীবালার মেজাজ আরো বিগড়োতো যখন নির্মল কোনো

জিনিস একান্ত ক'রে টুনির জগ্গেই নিয়ে আসতো। অথচ তেমন জোর দিয়ে কিছু বলতেও পারতেন না, নিজের প্রতিবাদটা নিজের মনের মধ্যেই রুমতো ফুঁশতো, বালটা শেষে দিকভ্রান্ত হ'য়ে যে-কোনো উপায়ে মেয়ের উপরেই পড়তো গিয়ে। এই অক্ষম স্বামী নিয়ে নির্মলের উপরই তাঁর ভরসা। নির্মলকে কিছু বলবেন এমন সাহস তাঁর ছিলো না। একটু প্রশ্রয় না-দিলে সে-ই বা বশ মানবে কেন? ভগবান কি তাঁকে একটা ছেলে দিয়েছেন যে আজ না হোক, কাল অন্তত খেটে খুটে উপার্জন ক'রে তাঁদের দুঃখ ঘোচাবে? এ তো পরেব ছেলে নির্মল। নির্মলই তো ধ'রে আছে ভাঙা হাল, ছেড়া পাল খাটিয়ে সেই তো বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ফুটো নৌকো। ভরাডুবি থেকে সে-ই বাঁচিয়ে রেখেছে।

‘এমন কপাল’ নির্মলের কাছে ব'সে কপালে করাঘাত হেনেছেন তিনি, ‘যে আশেপাশে নিন্দে করতে, ক্ষতি করতেই সকলে পটু, ছুপে কষ্টে ম'রে গেলেও একটা আধুলি সাহায্য করতে কেউ নেই। বুঝলে বাবা, সেইজগ্গেই বলি যে এই তোমার উপহার-টুপহারগুলো— ও-সবের দরকার কী? তোমার কাকার জগ্গ একটা যদি ফুড আনো বলবার কিছু নেই, সংসারের জগ্গ যদি কিছু করে। তাও কেউ বলতে পারবে না— কিন্তু এই টুনির জগ্গ যদি— বোঝোই তো সব। এমন বুদ্ধিমান ছেলে তুমি।’ আড়ে-আড়ে নানাভাবে নির্মলকে এ-সব কথা বুঝিয়েছেন তিনি। নির্মল চুপ ক'রে শুনেছে, আর তারপরেই হয়তো কলকাতার পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘুরে-ঘুরে চমৎকার এক স্বরলিপি-পদ্ধতি কিনে এনেছে পরের সপ্তাহে।

তখন ছাত্র সে। সবে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে। কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়ে। কুড়ি কি একুশ বছর বয়স। কিন্তু কলকাতার মতো মহা-নগরীতেও তার মন টেঁকে না, চ'লে আসে প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে এই

পানাপুকুর আর শেওলা-ধবা এঁদো গ্রামে। মা বলেন, ‘ওরকম সব হুপ্তাতেই আসিস নি বাছা, খুব তো কাছে নয়, ওতে শরীব খাবাপ হয়, টাকাও নষ্ট।’

মাকে জড়িয়ে ধ’বে নির্মল বলে, ‘তোমাকে না-দেখে যে থাকতে পারি না, মা।’

মা-ব ছু-চোখে স্নেহ ঝ’বে পড়ে। ‘শোনো আমার বুড়ো খোকার কথা। কী যে বলিস।’

আব সন্ধ্যাবেলা নির্জনে দেখা হ’তেই চোখ চলছিলে হ’য়ে ওঠে টুনিব, ‘তুমি কেন এমন করো?’

‘কী করি?’

‘প্রত্যেক সপ্তাহে আসবাব কী দরকার?’

‘অত আমি হিসেব দিতে পারবো না।’

‘আবাব বই এনেছো কেন?’

‘গান শিখবে না?’ খুশিতে উদ্ভাসিত হ’য়ে ওঠে এবাব নির্মল, ‘আমি একটা টিউশনি নিয়েছি জানো?’

‘টিউশনি?’

‘পনেনো টাকা মাইনে। কাউকে বোলো না কিন্তু। এ-টাকা আমি সব একা তোমার জন্তে খরচ করবো।’

‘আমার জন্তে? আমার কী দরকার?’ আবাব ভয় নেমেছে টুনির চোখে।

নির্মল পলকহীন হ’য়ে তাকিয়ে থেকেছে সেই টলটলে দুটি চোখের দ্বিধিতে, আস্তে বলেছে, ‘তোমার জন্তে একজন ওস্তাদও বেখে দেবো টুনি।’

‘না, না—’

‘আরো কী ভেবেছি জানো ?’

‘কী ?’

‘আমি পড়া ছেড়ে দেবো। কী হবে প’ড়ে ? তার চেয়ে চাকরি করা ঢের ভালো।’

অস্থির হ’য়ে পড়েছে টুনি, ‘দোহাই তোমার। ও-সব তুমি করতে যেয়ো না। তুমি পড়া ছেডো না।’

‘পড়া আমার হবে না।’

‘কেন ?’

‘কলকাতায় মন টেকে না।’

এবার টুনি চোখ নামিয়ে নিয়েছে। মন তারই বা টেকে কই ? তারপর ঘন হ’য়ে উঠেছে সন্ধ্যার আঁধার। ঝোপে-ঝাড়ে হাজার বাতি জালিয়েছে জোনাঙ্কির দল, পুকুর থেকে পঙ্ক উঠেছে জলের, নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে ভাবি হ’য়ে উঠেছে গ্রামের রাত। অনেক পরে টুনি মুখ তুলে চাপা-চাপা রুদ্ধ গলায় বলেছে— ‘তুমি কিছু বোঝো না কেন ?’

‘কী আবার বুঝবো ?’

‘এভাবে— এভাবে— তুমি কি কখনো কিছু বুঝবে না ?’

‘বুঝি, বুঝি। সব বুঝি।’ হাসি-ভরা চকচকে চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে বলেছে নির্মল, ‘যার যে-বিগ্গের ক্ষমতা আছে তার জন্তে যে তাই ব্যবস্থা দরকার সে আমি খুব বুঝি।’

‘সবাই কত যা-তা বলে—’

‘বলুক গে। আমরা তো কলকাতাই চ’লে যাবো।’

‘কলকাতা !’

‘কলকাতা না-গেলে কিছু হয় না। এই পাড়াগাঁয়ে ব’সে থাকলে—’

কেবল জুজুব ভয় ।’ আস্তে একটা টোকা দিয়েছে সে টুনির গালে, ‘টুনি, টুনটুনি, টুনি পাখি ।’

লজ্জায় আরক্ত হ’য়ে পালিয়ে গেছে টুনি ।

.... তিন

তাবপর একদিন নির্মল সত্যিই পড়া ছেড়ে দিলো । গ্রামেব স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে যে-ছেলে তিনটে লেটার পেয়ে, দশটাকার জলপানি পেয়ে দেশেব দেশেব বিধবা মায়ের মুখ উজ্জল করেছিলো, মাস্টারমশাইরা যে-ছেলে জজ হবে ব’লে রায় দিয়েছিলেন, সমাজপতিরা ভেতরে-ভেতরে বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে বলেছিলেন, ‘সাবাস, সাবাস’ তার এই আচমকা খেয়ালে সবাই সচকিত হ’লো । ফাস্ট ইয়ার থেকে খুব ভালো ক’রে, প্রথম পাঁচজনের একজন হ’য়ে সব সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে, মাকত আশায় বুক বেঁধে তাকে কলকাতা পড়তে পাঠিয়েছেন, কত তাঁর আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ জীবনেব কত উজ্জল ছবি রচনা, সব— সব গেলো । সরোজিনী দুঃখে, ক্ষোভে প্রায় কৈদে ফেললেন, ‘তুই কি আমাকে একবার জিগ্যেস করাও দরকাব মনে করলিনে ? যা নিজে বুঝলি তাই করলি ?’

নির্মল মিষ্টি ক’রে হাসলো, ‘ঐ ঝাখো । এ নিয়ে এতো কী কষ্ট তোমার বলো তো ? পাশ করলেই বুঝি একটা মস্ত দিগ্গজ হ’য়ে যেতুম ? কিন্তু এ কথা তো বোঝো যে, পাশই কবি আর যা-ই করি, চাকরি না-করলে আমাদের চলতো না ?’

‘যখন চলতো না তখন চলতো না । তাই ব’লে এখুনি তুই পড়া ছেড়ে দিবি ?’

‘ভালো একটা কাজ পেয়ে গেলাম, না-নেওয়া বোকামি হ’তো না ?’

‘এখনি তোঁর কাজ করবার হয়েছে কী ? না-থ্যে তোঁ আর ম’রে যাচ্ছিলাম না ।’

‘তা না-ই হ’লো, বয়েস তোঁ আমার কম হ’লো না ? এখন চাকরি করারই সময় ।’

বাবার মৃত্যুর পরে বছর দুয়েক নষ্ট হয়েছিলো নির্মলের, সে-কথাটাই উত্থাপন করলো সে, ‘একুশ বছর বয়সের ছেলে আর আই. এ. পড়ে না ।’

‘না, তা পড়বে কেন ?’ এবার সরোজিনী গঞ্জনা দিলেন, ‘পড়াশুনো ছেড়ে সবাই-ই সাত তাড়াতাড়ি তোঁর মতো পরের সংসারের গোলামি করে ।’

এ-কথায় একটু থমকে গেছে নির্মল, কিন্তু তক্ষুনি হেসেছে— ‘কাউকে কিছু করতে পারা কি খারাপ ?’

‘না, খারাপ কেন হবে ? তুই যে তাদের দাসখং লিখে দিয়েছিস ।’ রাগে দুঃখে মুখ খুলে গেছে মা-র । ‘প্রিয়নাথ দত্তমল্লিকের সাতপুরুষের জমিদারি তোঁ বাঁধা আছে তোঁর কাছে । তাই তার বউ-মেয়েকে খাওয়াতে তোঁর চাকরি নিতে হবে ।’

ব্যথিত গলায় নির্মল বলেছে, ‘তিনি আমার মাস্টারমশাই, তিনি আমার গুরু । তুমি কি আজ সেই সম্বন্ধটাও অস্বীকার করবে ?’

‘গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা একেবারে । গুরুর জন্তে সব উৎসর্গ না করলে কি আর তোঁমার এখন চলে ?’

‘না মা, চলে না । যেমন ছাত্রের জন্তে একদিন রাত না জেগে পড়ালে গুরুরও চলতো না ।’

প্রিয়নাথবাবু মাস্টার ছিলেন এই রাধানগর হাইস্কুলের, আর নির্মল ছিলো তাঁর পরমপ্রিয় ছাত্র । তার বাবা যখন মারা গেলেন, আর

সরোজিনী শোকার্ত হ'য়ে মেঝেতে প'ড়ে থাকা ছাড়া সব ভুললেন সংসারের, নির্মল অমনি স্বাধীন হ'য়ে তাড়াতাড়ি স্কুল যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলো। তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হ'লো ঘুড়ি ওড়ানো, পাড়া বেড়ানো আর লাট্টু খেলা। ধীরে-ধীরে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই ভদ্রলোকই তখন তাকে আবার একদিন হাতে ধ'রে স্কুলে নিয়ে ভতি ক'রে দিলেন, ভালোবেসে পড়ালেন, পরীক্ষার সময় প্রাণপাত করলেন তার জন্ত, আর সে যখন কৃত্তী হ'য়ে স্কুলের গণ্ডি পার হ'লো, আনন্দের অংশটা তাঁরই ছিলো সব চেয়ে বেশি। আর তারপর একদিন এই বিপদ এলো অতর্কিতে।

স্কুল থেকে ফিরছিলেন প্রিয়নাথবাবু, কোনো ফেল-করা রুট ছেলে ছুটে এসে জব্দ করবার জন্ত রাস্তার মোড়ে কলার খোসা রেখে গেলো কয়েকটা, সেই খোসাতে পা হড়কেই ভেঙে গেলো তাঁর কোমর থেকে পায়ের জোড়ার হাড়টা। আর তিনি উঠতে পাবলেন না শয্যা থেকে।

সরোজিনী ছেলের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'সত্যি ক'রে বল তো নিম্ম, সবই কি তোর প্রিয়নাথ মাস্টারের জন্তই?'

জবাব দিলো না নির্মল।

'বল না সত্যি ক'রে, খুঁজে-পেতে এই যে অ্যানুমিনিয়মের কারখানায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের এক কাজ নিলি তুই, তার মূলমন্ত্রটা কী?'

'মূলমন্ত্র হচ্ছে টাকা। টাকার বড়ো দরকার, মা।'

'খুব দরকার, না? শায়ের সাধ আকাজ্জ্বার চেয়েও বেশি। লেপা-পড়া ক'রে পাঁচজন ভদ্রলোকের মতো হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়েও বড়ো।'

নির্মল মা-র হাত দুটো নিজের গলায় জড়িয়ে এবার হেসেছে শুধু।

আর কিছু বলে নি। কী লাভ? মা কি বুঝবেন এ-সব কথা? বড়ো-বড়ো করুণ চোখে টুনি যখন তাকায় তার দিকে, বিশ্বসংসারে এমন কী আছে যা সে বিনিময় করতে না-পারে তার জন্ত?

আজ কতকাল পরে মনে পড়লো সেই সব কথা, সেই সব দিন, সেই সব স্মৃতির সমুদ্র আজ মথিত হ'লো। মনে পড়লো, মা কত যত্ন ক'রে খাবার সাজিয়ে ব'সে অপেক্ষা করতেন, বাইরে সাইকেলের পরিচিত বেলটি শুনলেই বেরিয়ে আসতেন ব্যস্ত হ'য়ে। ছপূরবেলাকার প্রথর সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেদনায় করুণ হ'য়ে উঠতো তাঁর চোখ। আর যখন টুনির কাছে এসে দাঁড়াতো, গালের কাছটা লাল হ'য়ে উঠতো তার, মুখ-ভার ক'রে একটু পবে বলতো, 'এতো দেবি?'

নির্মল হেসে বলতো, 'অঙ্ক ক'ষে আসতে হয় কিনা?'

'অঙ্ক!' টুনি অবাক।

নির্জন জামরুল তলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঘামতে-ঘামতে নির্মল গম্ভীর মুখে জবাব দিতো, 'হ্যাঁ, অঙ্ক বৈকি।'

'ফ্যাক্টরির চাকরিতেও অঙ্ক লাগে?'

'হুঁ-উ।'

'ঈশু!'

'কী ঈশু?'

'অঙ্ক ভীষণ বিচ্ছিরি।'

'আর অঙ্কও কি সোজা অঙ্ক নাকি?' চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে নির্মল সেই অঙ্কের তালিকা দিয়েছে, 'ধরো, ফ্যাক্টরিতে খাবার ঘণ্টা বাজলো, পিলপিল ক'রে সব বেরুলো গেট দিয়ে— পাঁচ মিনিট। আমি মাঠ-ঘাট ভেঙে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালালাম। তারপর— তারপর একটা মন্ত

বড়ো হিসেব ঘুরতে লাগলো মগজে। যথা—শ্রীমতী টুনিপক্ষী ছাড়া আর কে আছে খিডকির ঘাটে—এক, তার মা-র খাওয়া এই মুহূর্তে শেষ হয়েছে কিনা—হুই, তিনি ঘাটে এসে একঘণ্টা কুলকুচি ক’রে আঁচিয়ে, জলে বাসনের পঁজা ডুবিয়ে, ঘবে গেছেন কিনা—তিন, পান খেয়ে পিচ্ ক’রে জানলা দিয়ে পিকফেলে, পাংলা চুল বালিশে মেলে মেঝেতে পাটি পেতে শুয়েছেন কিনা—চার, তারপর ‘অ টুনি, হেঁসেলে যেন বেডাল টোকে না আবার। গোবব-গ্যাতাটা ভালো ক’রে বুলিয়ে মিস। এখন আবার খিডকির-ঘাটে তোব কী দবকার রে বাপু,’ ইত্যাদি ইত্যাদি বলা হয়েছে কিনা—’

‘ধ্য২।’

‘ধ্য২। এতো সব হিসেব বুঝি সোজা কথা? তারপর শ্রীমতী কখন রান্নাঘরের দরজায় শেকল তুলে সদর বন্ধ ক’রে, দয়ার অবতার হ’রে অধীনকে দেখা দেবার জুত জামরুল তলায় দাঁড়াবেন, কখন সরকার-বাড়ির পদটি বাসন ধুয়ে চ’লে যাবে, ঘাট থাকবে স্তমসাম, কেবল মাথার উপর নীল আকাশ আব তার তলায়—’

ঝরনাব জলের মতো ঝবঝব ক’রে এবার হেসে ফেলেছে টুনি, ‘এই বুঝি অঙ্ক?’

‘অঙ্ক নয়? এতোখানি হিসেব ক’রে এতোগুলো মাইল ডিঙোনো তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিকের কাজ! অঙ্ক বলছো কী তুমি?’ নির্মল টুনির চোখে চোখ রেখেছে, ‘আচ্ছা, সত্যি ক’রে বলো তো, ঠিক এই মাত্রই তুমি সব সেরে এখানে এসে দাঁড়িয়েছো কিনা?’

হাসির আভাষ হুই চোখ উজ্জ্বলিত ক’রে মুখ নিচু করেছে টুনি।

নির্মল ঘাম ঝেড়েছে কপালের, ‘একটা খবর আছে।’

‘কী?’

‘লিফ্ট হবে একটা, মাইনে দ্বিগুণ হ’য়ে যাবে।’

খুশিতে টলটলে হ’য়ে উঠেছে টুনি, ‘আজ জানলে?’

‘এক সপ্তাহ আগেই জেনেছি।’

‘বলো নি তো!’

‘খবর তো তখনো পাকা ছিলো না?’

‘আজ বুঝি ঠিক হ’য়ে গেলো?’

‘হ্যাঁ।’

টুনি এবার একটু চুপ ক’রে থেকেছে, একটু উদাম হ’য়ে তাকিয়েছে রোদু-ব-বলশানো পুকুরের জলে, কচি-কচি জামরুল পাতা দাঁতে কাটতে-কাটতে বলেছে : ‘বাবা কী বলেন জানো?’

‘কী?’

‘আমাদের জন্তেই তোমাব সব ব্যর্থ হ’লো।’

‘মাইনে বাড়ছে দ্বিগুণ, কাজ পেয়েছি ভালো, ব্যর্থ?’

‘বাবা বলেন তোমাব মতো পরিষ্কার মাথা কোনো ছাত্রের জ্যাথেন নি তিনি। তাঁর ভীষণ দুঃখ তুমি পরীক্ষাটা দিলে না ব’লে।’

নির্মলের মুখেও যেন ছায়া পড়েছে একটি, কিন্তু তক্ষুনি হেসেছে, ‘তারি পরীক্ষা। বেশ তো, এতো দুঃখ কিসের, একসময় না-হয় দিয়েই দেওয়া যাবে।’

‘আর তোমার সময় হবে কিনা। সকাল থেকে রাত অন্ধি কাজ।’

‘তার ফাঁকে-ফাঁকেই অন্তত পাশ করবার মতো পড়া আমি ভৈরি ক’রে নেবো ঠিক।’

‘পারবে?’

‘কেন পারবো না? তুমি বললে আমি কী না পারি?’

‘আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?’ একটু ভেবে নিয়ে মুখের দিকে

তাকিয়েছে টুনি, ‘ছুটি নিয়ে, পরীক্ষাটা দিয়ে দিলে হয় না ? বাকি তো নেই বেশি ?’

‘সবে কাজে ঢুকেছি, এখন কি ছুটি দেয় ?’

‘দেয় না বুঝি ?’

‘মনিবরা সবাই সমান । এই ছাখো না, এক মিনিট দেরি ক’রে এলে তোমার কাছেই কত কৈফিয়ৎ দিতে হয়, আমি তো ভয়ে মরি, বুঝি বরখাস্তই ক’রে দিলে, অবিশিষ্ট ওরা ঠিক তোমার মতো এতো কড়া মনিব নয় ।’

‘যা ।’ টুনি একেবাবে লজ্জায় লাল ।

তার কথায়-কথায় লজ্জা । আর সেই লজ্জা যে কত মধুর ছিলো, তা তো নির্মল আজ এই মুহূর্তেও ঠিক তেমনি ক’রেই অন্তর্ভব করতে পাবছে বুকের মধ্যে ।

.... চাব

একদিন টুনির মা থমথমে মুখে বললেন, ‘আর তো আমাদের গ্রামে টেঁকা দায় নির্মল ।’

নির্মল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আতঙ্কিত হ’লো, ‘কী হয়েছে কাকিমা ?’

‘না, কী আর হবে ।’ দাওয়ায় ব’সে শাকপাতা কাটতে-কাটতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি । ছোট্টো মাটির উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় ব’সে মসলা পিষতে-পিষতে একবার এদিকে তাকালো টুনি ।

নির্মল বললো, ‘কেউ কিছু বলেছে ?’

‘বলবেই বা না কেন ?’ ননীবালা চোখ টান করেছেন, ‘হাল, চাল, তরিবং এগুলো তো মানো ? না কি মানো না ?’

নির্মল অকাতরে ঘাড় হেলিয়েছে, ‘হুঁ—উ—উ । নিশ্চয়ই মানি ।’

‘তবে ?’

‘কী তবে কাকিমা ? অপরাধ হয়েছে নাকি কোনো ?’

‘অপরাধ নিরপবাধের কথা নয়, কথা হচ্ছে সমাজে বাস করতে গেলে পাঁচজনের কথা মতোই চলতে হয়, তা নৈলেই নিন্দে ।’

‘বুঝি কেউ নিন্দে করেছে আমাকে ?’

‘তোমাকে আর কেন করবে ? সোনার আংটি আবার বাঁকা । পুরুষ মাহুষের তো সাতখুন মাপ । কিন্তু তুমিই বলো দেখি বাছা, আমাদের মতো ঘরের এতো বড়ো মেয়ে যদি গলা ছেড়ে দিন-রাত গান-বাজনা করে, তুমি কাকে না কাকে ধ’রে নিয়ে আসো শেখাতে, তাহ’লে লোকে ছোটো বিচ্ছিরি কথা কেনই বা বলবে না ?’

‘ও, এই ?’ এতোক্ষণে আসল কথা টের পেলো নির্মল । এবার একটু হাসলো সে, ‘টুনির গান শুনে সকলেরই হিংসে হয় কিনা কাকিমা, তাই ওরকম করে । ও-সব কিছু না ।’

‘তা তো ঠিকই ।’ কাকিমার তরকারি কাটা বন্ধ হয়েছে, ‘তুমি অবিশ্বি অনেক করো, আমি সেজ্ঞা কৃতজ্ঞও তোমার কাছে, কিন্তু তাই ব’লে তো হক কথা না-ব’লে পারিনি ।’

ওদিকের বারান্দা থেকে মসলা পিষতে-পিষতে টুনির ভীত চকিত হাত থেমে গেছে, হরিণের ভয় নেমেছে তার চোখে । কী জানি, মা আবার কী বলবেন ঠিক আছে কিছু ?

নির্মল দরাজ গলায় হেসেছে, ‘বা রে, বলবেন বৈকি ? দোষ কমলে খুব ব’কে দেবেন ।’

‘ঠাট্টা তামাশা ক’রে তো আর জীবন কাটে না ?’

‘তাই তো ।’

‘হাজার হোক আমরা তোমার গুরুজন ।’

‘নিশ্চয়ই ।’

‘তোমার মাস্টারমশাই তোমাকে ছেলের মতোই ভাবেন ।’

‘মাস্টারমশাইকেও আমি আমার পিতৃতুল্যই ভাবি, কাকিমা ।’

‘তা হয়তো ভাবো । কিন্তু এ-কথা কি ভেবেছো— ক’দিন পরে তুমি যখন আর্থেক রাজস্ব আর কুঁচববন কণ্ঠার মেঘবরন চুল এনে ঘর আলো কববে তখন এই কালো মেয়ের গতি কী হবে ? মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে ? গান দিয়ে তো পেট ভববে না ।’

‘তা হয়তো ভরতে পারে ।’ চোখ কুঁচকে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে নির্মল । ‘কলকাতায় আজকাল গানের ভীষণ আদর । জানেন কাকিমা, কত মেয়ে এই গান গেয়েই স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিচ্ছে সংসার ।’

‘ছি ছি ছি ।’ ননীবালা মরমে ম’রে গেছেন এ-কথা শুনে । ‘নির্মল, তুমি আমার পেটের ছেলের বয়সী, আমার মুখেব কাছে ব’সে তুমি এমন কুচ্ছিৎ ইঙ্গিতটা করতে পাবলে ?’

নির্মল হকচকিয়ে গেছে, ‘কেন ? কেন ? কী বললাম ?’

ওদিকের বারান্দা থেকে টুনিও চঞ্চল হ’য়ে উঠেছে । হাত কঁপে উঠেছে তার ।

ননীবালা হাঁক দিয়েছেন, ‘তোরা হ’লো ? যা না বাপু, রান্নাঘরে গিয়ে একটু উত্তনটা তাতিয়ে দে —’

কাঠের বারকোশে লাল-লাল আঙুলে মসলা তুলে ঘরে ঢুকে গেছে টুনি । নির্মলের বুকটা কড়কড় করেছে, মনে হয়েছে লক্ষা বেঁটে ওর হাত না জানি কত জ্বলছে, নরম-নরম হাতে শিলের উপর নোড়া ঘষতে

না জানি কত কষ্ট হয়েছে ওর। ওর নিচু-করা-কপালের বিন্দু-বিন্দু ঘাম লেগে বয়েছে চোখেব মধ্যে। অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে বলেছে, 'আমি কি কিছু অত্যাচার বলেছি কাকিমা?'

ননীবালা গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছেন, 'তুমি বোঝো না? গবির হ'তে পারি, তাই ব'লে সম্ভ্রম খোয়াতে পাবিনে তো? আমরা দত্তমল্লিক বংশ, আমাদের বংশের মেয়েবা আগে সূর্যের মুখ ছাথে নি। আর তুমি বলছো সেই ঘবেব মেয়ে বাইজিদের মতো গান গেয়ে বোজগার কববে? ছি! এব আগে আমার মরণ হ'লো না কেন?'

নির্মল একেবারে সনির্বন্ধ হ'য়ে উঠেছে, 'আপনি ভুল বুঝেছেন কাকিমা, আমি ও সব কিছুই ভাবি নি। কলকাতায় অনেক বড়ো-বড়ো ঘরের মেয়েবাও আজকাল—'

'থাক। বড়ো ঘরের বড়ো কীতি। ও-সব আমি শুনতে চাইনে। না-খেয়ে মরি সে-ও ভালো, তবু যেন এমন দিন আমার না-আসে।'

এবার চুপ ক'রে গেছে নির্মল। ননীবালা ঝুঁটি কাৎ ক'রে তরকারির চুপড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, 'শুনলাম তোমাব মা নাকি ললিত হালদারের ছোটো নাংনিব সঙ্গে তোমাব সম্বন্ধ করছেন। তা ভালো। পাবে-থোবে অনেক।'

নির্মলের কাছে খবরটা নতুন। কিন্তু তবুও এতোকণে পাণ্টা জবাব দেবার মতো প্রশ্ন পেয়েছে একটি, মুছ হেসে বলেছে, 'টুনিরও তো শুনলাম চৌধুরী বাড়ির তিনু চৌধুরীর সঙ্গে আপনি সম্বন্ধ ঠিক করছেন?'

'ও মা!' ননীবালা একেবারে গালে হাত দিয়ে তাজ্জব। 'কে বলেছে? যতো সব মিথ্যে কথা!' পাছে কান-ভাঙানি দেয় কেউ এজ্ঞে তিনি কত সম্ভ্রপণে কথা চালাচালি করেছেন অনাদি ঠাকুরের সঙ্গে, এর মধ্যেই জানাজানি?

ভারি মুখে নির্মল বলেছে, ‘কিন্তু তিহু চৌধুরী তো টুনির পায়েরও যোগ্য নয়।’ বলতে-বলতে বাইশ বছরের ছেলের বুক তেতাল্লিশ বছরের বিপত্নীক তিহু চৌধুরীর উপর ঈর্ষায় টগবগিয়ে উঠেছে।

‘তা, কী আর করি—’ আবার দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়েছেন ননীবালা, ‘ঘটটা বুঝে তো ফলটা ? আমার মেয়েই বা এমন কী ?’

‘কী নয় ?’ রীতিমতো রাগ ফুটেছে নির্মলের গলায়, ‘সারা গ্রামে ওর মতো আর ক’জন মেয়ে আছে শুনি ?’

‘সে-কথা তুমি বললে তো আর হবে না ? বিয়ের বাজারে আমার মেয়ের দর আমি জানি। সেজগ্রেই তো বলি বাবা, একটু তো বুঝে-সুঝে চলতে হয় ? এই গাঁয়েই তো বাস করতে হবে সকলের সঙ্গে।’

‘উছ ! সে আমি কথা দিতে পারিনে।’ পাকা ভদ্রলোকের চিন্তিত মাথার মতো নির্মলের মাথাও এপাশ-ওপাশ হেলেছে এবার।

‘তুমি কথা দিতে পারো না মানে ? তোমার কথাতে কী এসে যায় ?’ টুনির মা অবাক।

‘মানে বিয়ের পরে টুনি খুবসম্ভব কলকাতাতেই থাকবে কিনা—’

‘বিয়ের পরে।’

‘মেয়ের বিয়ে দেবেন না ?’

‘তা তো দেবো।’

‘তাই বলছি।’

‘কী বলছো ?’

‘বলছি টুনির জগ্রে আমি পাত্র ঠিক করেছি, এখন দেখুন আপনার পছন্দ হয় কিনা। তবে ঐ তিহু কঙ্কুষের চেয়ে যে সে শতগুণে ভালো এ আমি হালপ ক’রে বলতে পারি।’

মুহূর্তে আলো হ'য়ে উঠেছেন টুনির মা । ‘কোথায় বাবা ? কোথায় ?’
গলার স্বরই বদলে গেছে একদণ্ডে ।

‘পাত্র এই গ্রামেরই ।’

‘কী করে ? ঘরে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে তো ?’

‘তা মোটাগুটি আছে বৈকি ।’

‘আমি বাবা কিছুই চাইনে, যদি মেয়েটা দুটো খেতে-পরতে পায় ।’
এই বলে তিনি সবই চেয়েছেন । ‘তা ছেলেটি কেমন ?’ গলা বাড়িয়ে
ষম হ'য়ে এগিয়ে এসেছেন নির্মলের কাছে । নির্মল পরম উদাসীন থেকে
দলেছে, ‘লোকে তো ভালোই বলে ।’

‘জমি-জমা কিছু—’

‘তাও আছে, বছরের ধান হয় । পাকা বাড়ি আছে ।’

‘আহাহা । তবে তো চমৎকার । দেখতে-শুনতেও বোধহয়—’

‘তা মন্দ কী— রং ফশা, মুখ-চোখও ভালো, আর স্বাস্থ্য এমন যে
একদিন তার একটু সর্দিও হয় না ।’

‘আর স্বভাবচরিত্র ?’

‘অতিশয় ভালো ।’

‘সংসারে আর-আর আছে কে ? ক’টি ভাই-বোন ?’

‘না, সে-বিষয়েও নির্বাক । টুনি খুব স্থখে থাকবে সেখানে ।’

গদগদ ননীবালা একেবারে চুপড়ি-টুপড়ি ফেলে এলিয়ে গেছেন,
‘চাকরি-বাকরি করে কিছু ?’

‘তাও করে । মাইনেও ভালো ।’

‘আমার টুনির কি এতো ভাগ্য হবে ?’ হাত জড়িয়ে ধরেছেন নির্মলের,
‘এমন সোনার চাঁদের হাতে দেবার যোগ্যতা কি আমার আছে ?’

‘কেন থাকবে না কাকিমা ?’ নির্মল একেবারে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বর

ছেড়েছে—‘টুনিকে আপনি অত ছোটো ক’রে রাখেন কেন ? আমি তো ভাবছি সেই ছেলেরই কি এতো যোগ্যতা আছে যে সে টুনিকে পাবে ?’

‘কী যে বলো তার ঠিক নেই। তুমি তাকে বলেছো তো বাবা আমাদের কী অবস্থা ?’

‘হ্যাঁ। এ-সবই সে জানে।’

‘কিছুই যে দিতে-থুতে পারবো না—’

‘দবকার নেই।’

‘তাহ’লে তুমি এক্ষুনি ঠিক ক’বে দাও। বলো, কবে নিয়ে আসবে তাকে মেয়ে দেপাতে।’

‘একগ্রামের ছেলে, মেয়ে তো তাব দেখা।’

‘দেখা ! কবে দেখেছে ?’

‘বোজই তো আছে।’

‘নৌ-জ ছা-থে।’ এবার টুনির মা একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছেন নির্মলের মুখের দিকে, ধীরে-ধীরে বলেছেন, ‘তার নাম কী বলতে পারো ?’

মৃহ্ হেসে মাথা নিচু করেছে নির্গল, ‘আমাকে যদি অপছন্দ না করেন—’

‘তোমাকে !’

‘মাস্টারমশাই যদি—’ এবার ঘন-ঘন মুখ মুছেছে সে, বারে-বারে লাল হ’য়ে উঠেছে কান।

‘তোমাকে অপছন্দ করবো !’ টুনির মা তেমনি অপলকে তাকিয়ে থেকেছেন তার মুখের দিকে।

লাজুক ভঙ্গিতে নির্মল আবার বলেছে, ‘যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, ছ’মাস পরে আমার চাকরি পাকা হ’লে, তখন আমি— আমার মাইনেও তখন আরো কিছু বাড়বে—’

‘নিম্ন, আমি কী ব’লে তোমাকে আমার—’ ননীবালার গলা বন্ধ হ’য়ে এসেছে রুতজ্জতায় ।

নির্মল উঠে দাঁড়িয়েছে তাড়াতাড়ি, ‘আমি আজ যাই কাকিমা, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে কিনা —’

.... পাঁচ

রাতিরে খেতে ব’সে মাকে বললে নির্মল, ‘আমি বিয়ে করবো, মা ।’

মা আহ্লাদে আটখানা হ’য়ে বললেন, ‘আমিও সে-কথাটাই বলবো তাবছিলাম ।’

‘তোমার শরীব কত খারাপ হ’য়ে গেছে ।’ মা-র দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো নির্মল । কুঁকড়ে যেন ছোটো হ’য়ে গেছে মাহুঘটা, অথচ বয়স আর এমন কী । ভাবি মায়া হ’লো । টুনি ভালো মেয়ে, মাকে সে স্ত্রী করতে পারবে ।

সরোজিনী সন্নেহে হাসলেন, ‘একা ঘরে আর মন টেঁকে না আমার ।’

‘বউ এলেই ঘর ভ’রে যাবে ?’

‘যাবে না ? শ্রী ফিরবে বাড়ির, তুই ও আর এতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াবিনে ।’

‘আমি বুঝি ঘুরে বেড়াই ?’

‘তা একটু বেড়াস বৈকি । চাকবি কি তোরা সারাদিনই ?’

এর আর কী জবাব দেবে নির্মল, কথাটা তো সত্যিই । মা-র কাছে আর সে কতটুকু থাকে ? মা ভাত বেড়ে ব’সে থাকেন, দয়া ক’রে এসে খায়, বিছানা পেতে রাখেন, অন্তগ্রহ ক’রে শোয় । সত্যি, সন্তানের মতো অরুতজ্জ পৃথিবীতে আব-কিছু না । কেবল নিয়েই খালাস । তারপর যেই পাখাটি গজালো অমনি উড়লো আকাশে । দিলো কী সে ?

‘শোন—’ সরোজিনী ছেলের দিকে তাকালেন, ‘হালদার-বাড়ির লাবিকে দেখেছিস বড়ো হয়েছে পবে?’

নির্মল ব্বালো, টুনির মা যে-কথা বলেছিলেন ধীরে-ধীরে এবার সেই প্রসঙ্গেই আসছেন মা। বড়ো-বড়ো গ্রাসে সে ভাত খেতে-খেতে বললো, ‘আমার কি এতোই ভাগ্য যে হালদার-বাড়ির মেয়েদেব এই চর্মচক্ষে দেখতে পাবো।’

‘তা, ঠিক।’ সরোজিনী হাসলেন, ‘ললিত হালদার একটু বেশিই পর্দানশিন। মেয়েদেব একেবারে ঘরের দাওয়াটিতে পর্যন্ত প। বাডাতে দেন না।’

‘মেয়েবাও তেমনি আস্ত-আস্ত এক-একটা রাঙা আলুব-বস্তা।’

‘সে আবার কী?’

‘একেবারে ভেড়া সব।’

‘বলছিস কী?’

‘অমন বিচ্ছিরি শামন শোনে কেন মেয়েগুলো?’

‘ও মা, গুরুজনের কথা শুনবে না? আর ললিত হালদার কি একটা যে-সে লোক? একটা বাঘ।’

‘বাঘই। বাঘও নয়, রাক্ষস।’

‘কী যে বলিস যা-খুশি তাই—’

‘ঠিকই বলেছি, কিন্তু যাকগে, ললিত হালদারের কথায় আমাদের দরকার কী?’ খাওয়া শেষ ক’রে জল খেলো নির্মল।

মা বললেন, ‘দরকার একটু আছে বাছা। আমি ভাবছি ঐ লাবির সঙ্গে তোব সম্বন্ধ করি।’

‘কেন, তারা কি বলেছে কিছু?’

‘কত কথাই তো বলেছে।’ উদাসভাবে নিশ্বাস ছাড়লেন সরোজিনী,

‘আর বলতেই বা বাধা কী ? বাড়াবাড়ি করতে কি তুই কম করিস ?’

মা-র ইঙ্গিতটা বুঝেও না-বোঝার ভান কবলো নির্মল, ‘কিসের বাড়াবাড়ি ?’

‘সারাটাদিন প’ড়ে থাকিস প্রিয়-মাস্টারের ঘবে, লোকে ছাথে না ?’

‘দেখবে না কেন ? আমি কি চোর নাকি যে চুপে-চুপে যাবো ?’

‘কী দবকাব তোব ওদের ওখানে সারাদিন ?’

‘মাস্টারমশায়ের অস্থখ না ? আমি ছাড়া আব-কেউ যায় সেখানে ?’

‘সবাই নিন্দে কবে তোকে ।’

‘কেন ?’

‘অত বড়ো একটা মেয়ে ঘরে । ওরাই বা কী ? ওদেবও তো একটা কলঙ্কের ভয় আছে । মেয়েব বিয়ে দেবে না ?’

‘আমার ঘাবার সঙ্গে বিয়ে দেবাব বাধাটা কোথায় ?’

‘ছূর্নাম হয় যদি তোকে জড়িয়ে, তখন ? কে বিয়ে করবে ঐ মেয়ে ?’

‘আমাকে জড়িয়ে ছূর্নাম হ’লে অবিশ্বি আমারই দায়িত্ব ।’ বিজ্ঞভাবে মাথা নাডলো নির্মল ।

ছেলে বড়ো বুঝের, এই মনে ক’বে খুশি হলেন সরোঁ

থেতে-থেতে ধাঁ ক’রে বাঁ হাতটা মা-র কাঁধে রেখে, যেন আচমকা মনে পড়েছে এরকম ভাবে, বললো নির্মল, ‘তার চেয়ে এক কাজ করি না মা ?’

‘এই ছাখো, দিলি তো ছুঁয়ে, আবার চান করাবি আমাকে ।’

নির্মল চোখ-ভরা হাসি নিয়ে জিব কাটলো, ‘মনেই ছিলো না । আর

কেনই বা থাকবে? তুমি আমার মা না? তোমাকে আমি সব সময় ছোবো। আর মাছ বুঝি তুমি খাও নি কোনোদিন? নাড়ীভুঁড়ি ধুতে পেরেছে।’

‘শোনো ছেলের কথা।’ সবোজিনী উঠে দাঁড়িয়েছেন, ‘বুড়ো ঢেকির কথা শুনলে রাগ হয় কিনা।’

নির্মলও উঠে দাঁড়িয়েছে, এবার ভালো ক’রেই বা হাতে জড়িয়েছে মাকে, ‘রাগও হয়, আবার শোনোও তো সব কথা। আরেকটা কথা শুনবে?’

ছেলেব আদব থেকে বিচ্ছিন্ন হ’য়ে মাছের আশেব গন্ধে তিনি নাকে কাপড় দিয়েছেন, ‘সাধে কি বলি যে বিয়ে কব। এ-সব আর ঘাঁটতে পারিনে আমি।’

‘বিয়ে করলেই বুঝি আর তোমাকে ঘাঁটতে হবে না?’

‘না। আমি কেন ঘাঁটবো? তোর বউ তোকে রোঁধে দেবে। আমি তো একরকম ঠিকই করেছি, এখন তুই মেয়ে দেখে পছন্দ করলে সামনেই যে-তারিখ পাবো এক ক’রে দেবো দু-হাত।’

‘যদি পছন্দ না হয়?’

‘পছন্দ আবার হবে না। রং গোলাপ ফুলেব মতো। আর ললিত বুড়ো দিতে-থুতেও কম দেবে না। মরুঝি পাবি একটা মাথার উপর।’

‘আর তারপর গুণবান দাদাশ্বশুরের সঙ্গে বারোয়ারিতলায় ব’সে ঘোট পাকাবো প্রিয় মাস্টারের বিকন্ধে, তার কালো মেয়েটার যাতে বিয়ে না হয়, ভাংচি দেবো জনে-জনে।’

‘আহা। তা কেন?’

‘তাই তো। তাছাড়া আর কী। একটা লোক পঙ্গু হ’য়ে প’ড়ে আছে তবু কেন ভিক্ষে করছে না বাড়ি বাড়ি এই আক্রোশেই তো ম’বে যাচ্ছে

সাবা গ্রামেব লোক । আব সব চেয়ে আশ্চর্য, তুমিও যোগ দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ।’

‘আমি কেন যোগ দিতে যাবো ।’

‘তানয়তো কা? যে লোকটা তার সব চেয়ে শত্রু তার বাড়ির মেয়েদ সঙ্গে ছেলেব বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা পাতাতে চাইছে।’

দ্বিধায় পড়লেন সরোজিনী । বুদ্ধি তাঁর প্রথমে নয়, এমনিতে মানুষটা ভালো । সাথে নেই পাংচ নেই, আছেন চূপচাপ নিজের ছেলে নিয়ে নিজে । দিন চ’লে যাচ্ছে সুখে দুঃখে । তাছাড়া সত্যিই তো তিনি তাঁর ছেলেব বিষয়ে প্রিয়নাথ মাংগায়েব কাছে রুতজ্ঞ । তার দুঃখের সব চেয়ে চরম দিনগুলোতেই তিনি বন্ধু হ’য়ে জড়িয়ে আছেন মনের মধ্যে । আব মেয়েটা । মেয়েটাই কি কম লক্ষ্য নাকি ? এসেছে, বসেছে কতদিন বেধে রেখে গেছে । এখন কালের প্রবাহে সবই ভুলে গেছেন তিনি, সেই সঙ্গে ওদেরও ভুলেছেন । কিন্তু তাই ব’লে তাদের শত্রুব সঙ্গে তো জোট পাকতে পারেন না ?

মায়েব এই দ্বিধাবিত অবস্থার স্বযোগ নিলো নির্মল, ‘তার চেয়ে তোমাকে ঋণা বিপদের দিনে কবেছেন, তাঁদেরই তুমি একটা উপকাব করো না ।’

‘আমি কী উপকাব কবতে পারি ? আমাব সাধ্য কতটুকু ? তুই তো যা পারিস কবিসই ।’

‘তাতে তো আবো অপকাবই হয় । দুর্নাম হয় ওদের ।’

‘তাই তো ।’

‘তার চেয়ে আমি বিয়ে কবি না টুনিকে ।’

‘কী !’ সরোজিনী উপকাবের তালিকা শুনে অবাক ।

‘কী আবার । টুনিব মতো ভালো মেয়ে আর আছে নাকি তোমাদের

গ্রামে। সব কটা তো ঝগড়াটি আর হিংস্রটি আর কুচুটে—’মা-র
অপলক চোখের দিকে সে তাকালো। চোখ নামিয়ে নিলেন সবোজিনী।
৭ম একবারে আসন্ন বর্ষাব আকাশের মতো থমথমে।

‘কী হ’লো ? বাগ কবলে নাকি ?’

জবাব নেই।

‘বলো না।’

‘আমার বলবার জ্ঞান কি তোমার কিছু আটকে থাকবে ?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘এতোদিন ধ’রে যা যা কবেছা সবই বোধহয় আটকে ছিলো, না ?’

‘বী ক’বছি ?’

‘মাস্টারের সেবার নামে ভাব কবেছিল মেবেটার সঙ্গে। আবাব
কী।’ এক ঝাপটা মেবে সরোজিনী বাগাঘর ছেড়ে বুদোতলায় এলেন,
অন্ধকারে শুধু তাঁর দড়ি টেনে বালতি ফেলাব আওয়াজ শোনা গেলো,
ঝপঝপ ক’বে জল ঢালার দ্রুততায় বোঝা গেলো তাঁর উত্তেজনা।

তাদের পুকুর নেই। অনেকদিন আগে শুকিয়ে একটা ডোবা হ’য়ে
আছে বাড়ির পেছন দিকে। গভীর ক’বে এই কুয়োটি নির্মলেন বাবাই
মববার আগে খুঁড়িয়েছিলেন। সুন্দর টলটলে জল। সবাই বলতো মিঠে
জল। গ্রামের লোক বিজাত ট্যাঙ্কের জলের চাইতেও এই জল পছন্দ
কবতো বেশি। গবমেব সময় এই ঠাণ্ডা কুয়োর জলে প্রাণ ঠাণ্ডা
হ’তো।

নির্মলও আঁচাতে এনো সেখানে। খোশামুদে গলায় বললো, ‘তুমি
অনর্থক বাগ কবছো মা। ঘবে এসো, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে
বলবো—’

‘নুঝতে আমার কিছুই বাকি নেই বাছা। মাস্টারের কথা ধরছিলেন,

তার বউয়ের কথাই ভাবছি। পারের ছেলেকে এমন ফাঁদ পেতে ধরতে কি ননীবালায় বিবেকে একটুও আটকালো না? ছি ছি ছি। গ্রামের মধ্যে শেষে এই সব কেলেঙ্কারি কাণ্ড? মেয়ে দেখিয়ে ছেলে তুলানো? স্লেচ্ছদেব মতো দেখাশুনো ক'বে বিয়ে?’

নির্মল দিশাহাবা। ভেবেই পায না কী যুক্তিতে সে ঠাণ্ডা করবে মাকে। তাঁর অহেতুক সংস্কারকে সংস্কৃত কববে।

তারপর একদিন নয়, দু-দিন নয়, দিনের পব দিন চললো এই মন-কষাকষির পালা। মা কোনোরকমেই বুঝতে পারেন না যে-মেয়েকে নির্মল নোজ দু-বেলা দেখছে তাকে আবাব বউ ক'বে ঘরে আনবে কেমন ক'রে? যে-মেয়ে ওর সঙ্গে বছরের পব বছর মাথাব ঘোমটা ছেঁড়ে কথা বলেছে, নতুন ক'বে ঘোমটা টানবে কোন লজ্জায়? তিনি শুনেছেন সাহেব-মেমরা নাকি এমনি ক'বেই বিয়ে কবে। তা তারা ককক। তারা হ'লো অল্প রকম। তাদের আবাব ঘর, সংসার, আর বউ-গিরি। তাই ব'লে তাঁর ঘবে এই কাণ্ড? গ্রামের মাতব্বররা আছেন না? বিধবা মাণ্ডুষ, সকলের দয়াতেই শাস্তিতে আছেন, শেষে সকলকে খেপিয়ে অবশ প্রিয়নাথের কালো মেয়ে ঘরে এ'ন কি তিনি সাত হাত জলের তলায় ডুববেন? অবশ্য শেষ পর্যন্ত মত দিতেই হ'লো তাঁকে। কী করবেন, সমাজ ত্যাগ কবলেও ছেলে তো আর ত্যাগ কবতে পারেন না? আর ছেলে তাঁর যেরকম জেদী। আবদার দিয়ে-দিয়ে অবিশ্রি তিনিই মাথা খেয়েছেন, এগন বুঝুন তাঁর ফল।

তবু মন্দের ভালো, ভাবই ককক, যা-ই ককক, মেয়েটা নিতান্ত স্থস্থির। একদিন বেড়াবাব অছিলায় ভালো ক'রে দেখে এলেন গিয়ে। দেখেছেন তো কতবারই, তা ব'লে এখনকার দেখার সঙ্গে তো আর

তুলনা হয় না ? আর দেখে বেশ ভালোও লাগলো । বডো হ'য়ে অনেক
সুন্দর হয়েছে দেখতে । কই, আগের মতো কালোও তো নেই, অথচ
লাজুক আছে তেমনি ।

মার মত পেয়ে খুশিতে সেদিন লাফাতে লাগলো নির্মল । মাকে দুঃখ
দিতে কাব ভালো লাগে ? মা ব অমতে, মী ব বিরোধিতায় কাজ করতে
কান ছেলেব না মন খারাপ হ'য়ে যায় । সেদিন যেন আবার নতুন
ক'বে ভালোবাসা হ'লো মা ব সঙ্গে তাব । মা আব ছেলের সম্বন্ধ আবে
যেন নিবিড় হ'লো ।

সব ঠিক । কেবল টনির মা বললেন, 'ছ মাস পরে যখন তোমাব
চাকরি পাকা হবে, তখনই বিয়ে হবে । সেই তো ভালো । কী বলো ?'

নির্মল বললো, 'বেশ তো ।'

'নির্মলের মা কিন্তু তারি অস্থির হলেন, বললেন, 'কেন, ঘরে কি
তোব খাবাব নেই, তোব বউ এলে কি আমি তাকে একমুঠো ভাত দিতে
পাবনো না যে চাকরি পাকা না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা ?'

নির্মল বললো, 'তা হোক, এতো তাড়াহড়োর দরকারই বা কী ?'

'কী আবার । শুভকাজ ফেলে রাখাব নিয়ম নেই শাশুে ।'

'ফেলে রাখলে কী হয় ?'

'কত কিছু হয় । শেষে হয়তো হয়ই না । আর পেছনে কত শত্রু
তার ঠিক আছে কিছু ?'

নির্মল হাসলো মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে, 'না-হ'লে তো তুমি
খুশিই হবে, কী বলো ? তোমার তো আর মত ছিলো না ।'

'অলুক্ষে কথা আর বলিসনে, যা । মনে-মনে যাকে বউ ব'লে বরণ
করেছি, তাকে তো ভালোও বেসেছি । না কি বাসি নি ? মুখে কি তো'ব
কিছু আটকায় না ?'

মাকে আদব কবেছে নির্মল, ‘তুমি ভারি ভালো, মা। তুমি খুব ভালো।’

মা ব কাছে বললো বটে, দেরিই ভালো, কিন্তু দেবীতে তাব নিজেরও মত ছিলো না। কিন্তু টুনিব মা যখন বলছেন তখন আব কী করে সে ? তবু পবেব দিন গিয়ে বললো, ‘মা বলছেন, অত দেবি না-কবাই ভালো ?’

বলতে দাক্ষ লজ্জা কবলো তাব, মানে তাবও। স্বভাবত লজ্জা-শব্দ নির্মলেব একটু কমই, মা তো সব সময়েই বলেন, ‘বেহায়া। নিজের বিয়ের কথা আবাব নিজে বলে নাকি অত ?’ তা কী কববে, নিজেই যেখানে নিজের গুরুজন সেখানে লজ্জাব বাব ধেবে কী লাভ ?

টুনিব মা মুখ মলিন কবলেন, ‘এই কটা দিন তুমি দিদিকে সবুর কবতে বলো বাবা। আমাব তো মেয়েব বিয়ে, একটু তো সাধ-আহ্লাদ আছে। একটু সময় দাও আমাকে।’

সময় পেলেই তিনি যে সাধ-আহ্লাদ পুনোবাব কা সম্পদ জোগাড় কবতে পাববেন বুঝতে পাবলো না নির্মল। তবু চুপ ক’বে রইলো। তিনি দাতা, সে গ্রহীতা, জোব খাটাবাব তাব অধিকার নেই।

মাকে সে বোঝালো। মা বুঝলেন। বললেন, ‘আহা, তাই তো, আপন বকেব ধন, জন্মেব মতো পবেব হাতে তুলে দেবে, সময় তো চাইতেই পাবে। তা বাপু থাক, আব তাড়াহুড়া ক’রে কাজ নেই। ছ-মাস আব কী, দেখতে-দেখতে ফুবিষে যাবে।’

ফুরিয়েই গেলো। শুধু সময়ই ফুবোলো না, সবই ফুরোলো। আব এতোদিন পবেও সেই ফুবিষে যাবার যন্ত্রণাময় স্মৃতিটা হাইচাপা আগুনের মতো সামান্ত ভাবনাব বাতাসেই তপ্ত হ’য়ে উঠলো নির্মলের বুকে।

প্রথম ফুবোলেন তাব মা । কিছুই না, বলতে গেলে । একটু বুষ্টিতে ভিজ়ে মদি হ'লো কি হ'লো না, বকে ঠাণ্ডা ব'সে তিনদিনের মধ্যেই শেষ হ'য়ে গেলেন তিনি । ভালো ক'বে কিছু বুঝতেই পাবলো না সে, চিকিৎসা পযন্ত কবাবাব সময় পাওয়া গেলো না । মেয়েদেব মতো বকে মাথা রেখে জ্বাবে-জ্বাবে কাঁদলো । মা ছাড়া যে আর কিছুই ছিলো না তাব ।

কাটলো ছ-মাস । চাকবি পাক' হ'লো । মাইনেও বেড়ে দ্বিগুণ হ'য়ে গেলো । এবাব বিয়ে ।

কিন্তু টনিব মা বললেন, 'আব ক'টা দিন সব্ব কবো বাবা ।'

নিমল অবাক । আবো সব্ব কবতে হবে ? ননীবালা কি জানেন না তাব মাতুহান, জ্বালোকহান একা ব'ডি তার পক্ষে কত কষ্টের । ববং তাবই তো নিঃসঙ্গ নিমলের কাছে তাডাতাড়ি মেসেকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত । একটু গস্তীরভাবে বললো, 'আমাব রোজ় এখানে আসা-যাওয়া করতে অস্ববিধে হয় । তখন মা ছিলেন, আসতাম, এখন প্রত্যেকদিন এখানে আসা যাওয়ার কী কৈফিয়ৎ দেবো আমি সকলেব কাছে ?'

'সবই তো বুঝি, তবে একটু অস্ববিধে আছে কিনা, মানে —' দীঘশ্বাস ছাডেন তিনি ।

এবার নির্মল শ্রান, গস্তীর মুখে চেয়ে থাকে দূবেব দিকে ।

এদিকে প্রিয়নাথবাবুব অবস্থা দিন-দিনই খাপাপ হচ্ছে । পু'জি ভাঙিয়ে আব ক'দিন চলে । বলতে গেলে সমস্ত ভারটাই নির্মলের উপর পড়লো এসে । দবকাব হ'ল মাইনের বেশিব ভাগটা তো সে দিতোই, এমনকি নিজের সিগারেটের খরচটি পযন্ত তুলে দিতে হ'তো কোনো-কোনো মাসে । কী ভেবেছিলেন তিনি তখন ? এখনকার নির্মল কণ্ট্রির তাবলো মনে-মনে । কেন তিনি ক্রমাগত টালবাহানা ক'রে-ক'বে পিছিয়ে

দিচ্ছিলেন, বিয়েটা কবলে টুনিকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ আলাদা হ'য়ে যাবে সে, আব আলাদা হ'লে তাঁদের কী হবে ? এই কি ছিলো তাঁর মনেব কথা ? যে-কর্তৃত্ব তিনি এখন চালাচ্ছেন নির্মলের উপর, জামাই হ'লে, মেয়েকে একবার হাতেও মুঠোয় পেলে আব কি শেষে শাশুড়িকে ততো মানবে ? না কি সব টাক। এনে এমন নিঃশেষে তুলে দেবে তাঁব হাতে ? এই কি তখন ভেবেছিলেন টুনিব মা ননীবালা। কী ? কী ভেবেছিলেন ? গলিব মাথাব উপরে অনন্ত আকাশেব অজস্র তাণ্ডা তাকিয়ে এ কথা আজ ভাবলো নির্মল।

গ্রাম থেকে তাব কাজেব জাযগ। বড়ো সহজ দূবে ছিলো না। ট্রেনে গেলে দুই স্টেশন পবে। মাঠ-ঘাট ভেঙে পাগলেব মতো সাইকেল চালিয়ে সে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি চালায়। তাব স্বাস্থ্য ব'লেই শীতে গ্রীষ্মে এই হাড ভা। পবিত্রম সহ্য হয়, অল্প কেউ হ'লে হয়তো পারতো না। মা-র মৃত্যুব পরে ছেড়ে-খাওয়া বাড়িব তালা-বন্ধ একা ঘবে সত্যি আব ঢুকতে ইচ্ছে করে না। টুনি এলে ঘব বাড়ি আবার আলোকিত হ'য়ে উঠতো, নষ্ট হ'য়ে যেতো না জিনিসপত্রগুলো। ও-ই সব ঠিক ঠাক ক'বে যত্ন ক'বে বেখে দিতো। এখন ওখানকান মেসেই খায় ব'লে, খেতে আস। বাবদ দুপুবকান ছুটিটুকুতে আব সে এখানে আসতে পারে না। সমস্ত দিনেব পরে, কাজ সাধ হ'লে সন্ধ্যাব অন্ধকাবে চ'লে আসে ক্লাস্ত দেহে। আর এলেই কি সে টুনিকে দেখতে পায় ? কত কর্তব্য আছে। আছে মার্গাব-মশায়ের বিছানায় ব'সে দুটো কথা ব'লে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া, ননীবালাব দুঃখের ফিরিস্তি শোনা, তাবই ফাঁকে দুটি ককণ কাতর দুঃখী চোখের চকিত পরশ।

শেষ পযন্ত অসহ্য হ'য়ে উঠেছিলো নির্মল। তাব ধৈর্যের বাধ ভেঙে

গিয়েছিলো। একদিন বীতিমতো জোব দিলো সে গলায়, ‘আমি আব দেবি করতে পারবো না।’

টুনির মা অমনি বললেন, ‘তোমার মা মাঝে গেছেন মাত্র কয়েক মাস, সাক্ষাৎ গর্ভধাবিণী, একটা বছর তো তোমার অশৌচ পালন করা উচিত?’

‘ও সব আমি মানি না।’

‘হিন্দুব ভেলে, একটু-আধটু মানতে হয় বৈকি বাবা।’

উদ্ধত হ’য়ে জবাব দিলো নির্মল, ‘যা মানি না তা মানিই না। আপনি যদি অল্প কারণে বিয়ে পেছিয়ে দিতে চান সে কথা আনান, কিন্তু এটা আমি মানবো না।’

‘গ্রামের লোকেরা বলবে কী?’

‘বলাকে কি আপনি খুব ভয় পান? অনেক কথা তো এখনো বলছে।’

টুনির মা মুগ্ধভাবে কবলেন, ‘আমরা সাবেকি লোক, ও সব অশৌচের ব্যাপার না মেনে পারি না।’

নির্মল একটু তাকিয়ে থেকে বললো, ‘আমার মা এ মৃত্যুর আলী ও তো সব ঠিক হ’য়ে পাঁচমাস কেটেছে, তখনো তো আপনার আপত্তি ছিলো। মা ব কত ঠাণ্ড কত মাধ অপূরণ থেকে গেলো, আমি তো ভাবছি মা-র প্রথম বাৎসরিক কাজে, টুনির ও কাজ থাক কিছু। হয়তো স্বর্গে গিয়েও ভূপ্তি হবে তাঁর।’

টুনির মা এর কোনো জবাব না-দিয়ে উঠে গেলেন সেখান থেকে। আব কী-যে বাগ হ’লো নির্মলের, বলা যায় না। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলো সে। বেকবাব মুখে, অন্ধকারে মাধবীতলায় চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমান টুনিকে সে দেখেও দেখলো না, কেবল তার মুহূ গলার ভীত চকিত করণ ডাকটি ভেসে এলো পেছনে, ‘শোনো।’

যুদ্ধ লেগেছে তখন। চারদিকে এই কথা, এই প্রসঙ্গ, এই আলোচনা। দিগ্বিদিকে টাকা ছড়ানো, চাকরি ছড়ানো, ভয় ছড়ানো। দিকে-দিকে লোক ছুটছে, হাঁটছে, খাটছে, তাঁবু বানাচ্ছে, এরোড্রামের কনট্রাক্ট নিয়ে লক্ষপতি হচ্ছে। যাচ্ছে সৈন্য হ'য়ে, যাচ্ছে ডাক্তার হ'য়ে, যাচ্ছে সেবক হ'য়ে। জাপানি বোমা পড়লো ব'লে কলকাতা শহরে। তারপর আর কী! গেলো সব। নগর, গ্রাম, বাণিজ্য, বন্দর সব ছাতু।

হঠাৎ নির্মলও একদিন গিয়ে যুদ্ধের চাকরিতে নাম লিখিয়ে এলো। প্রত্যহর এই প্রতীক্ষার ভার থেকে তো অন্তত বাঁচা যাবে। অবিশিষ্ট সবটাই যে বাগ ছিলো তা নয়, টাকার মোহও মন্দ ছিলো না। তারপর কাউকে না-জানিয়ে একেবারে সব ঠিক ক'রে এসে খবর দিলো টুনির মাকে।

আতঙ্কিত হ'য়ে টুনির মা বললেন, 'মে কী?'

'কী আর।' আত্মপ্রমাদে হাসলো নির্মল। 'আপনাদের ভালোই হ'লো।'

'ভালো হ'লো? তুমি গেলে কে দেখবে?'

'টাকা পাঠাবো বেশি ক'রে। টাকারই তো মূল্য।'

প্রিয়নাথবাবু কাদো-কাদো হ'য়ে বললেন, 'টাকাই কি বাবা সব?'

'অনেকখানি তো।'

'না, না, কিছুই না।' তিনি হাত চেপে ধরলেন আবেগে, 'তুমি কাছে না-থাকলে আমার কিছুই কিছু না।'

'আপনি ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? কোনো অসুবিধে হবে না।'

টুনির মা-র মুখে ছায়া পড়েছে, চিন্তার ঘন রেখায় কুঁচকে গেছে কপাল। দ্রুত গলায় বলেছেন, 'তবে বিয়ে ক'রে যাও।'

'আর সাতদিনের মধ্যেই আমাকে রওনা হ'তে হবে, কাকিমা।'

এখন আমার বিয়ে কবাব সময় কোথায়। আব তাছাড়া যারা যুদ্ধে যায় তাদের জীবনের সঙ্গে কি অণু জীবন জড়ানো উচিত ?

‘নিয়, এ তুমি কী কবলে ’ প্রায় চোখে জল এসে গেছে ননীবালার। হয়তো এতোদিনের স্বার্থপরতার কথা ভেবে একটু অশ্রুতাপও হয়েছিলো মনে-মনে, কে জানে। নির্মল কিন্তু খুব খুশি হয়েছিলো এই আঘাতটা দিতে পাবে।

কিছুদিন থেকে মনে-মনে টুনির উপরেও একটা গভীর অভিমান জমা হচ্ছিলো তার। সেও তো কিছু বলতে পারে। জোব দিতে পারে মাকে। কেন এতো মেনে নেয় ? কিসেব এতো লজ্জা ? আসলে নির্মলের দুঃখটা তার কিছুই নয়। নির্মলের কোনো কষ্টই তার কষ্ট নয়।

আজ মোচড দিয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। সে-বেচাবার দোষ কী ? তার মতো ভীষণ শান্ত মেয়ে, অমন প্রচণ্ড মা-ব বিরুদ্ধে কী কবতে পারে ? সে নিজেই বা পাবছিলো কই ?

ফেরবার সময় দেখা কবাব নৌব নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে চপ ক’রে দাঁড়াতেই টুনি একেবারে বুকের কাছে এসে ছেলেমানুষের মতো ফু পিয়ে উঠলো। ঠিক এতোখানির জন্ত প্রস্তুত ছিলো না নির্মল। এইটুকু থেকে বডো হ’তে দেখলো সে, লজ্জায় মুখ তুলতেই যে লাল হ’য়ে যায়, দুঃখের সঙ্গে বনিবনাও ক’বে থাকতেই যে অভ্যস্ত, তর্কাতর্ক তার এই আবেগ নির্মলের সারা হৃদয় মথিত ক’বে দিলো।

বাড়ির পিছন দিককার নিরান পুকুরের শাব, ঝোপঝাড়, হিজলের ডাল আর শ্রাওলাব রাজত্ব। বুনো ফুলের মাঝে, বেল কামিনী মিসে-মিসে গন্ধ, চারদিকের ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে উদ্বেলিত নির্মল সহসা দুই হাতে তাকে জাপটে নিলো বুকের মধ্যে, ঘন চুলে ভরা মাথাটার

উপর মুখ ঘষতে-ঘষতে বললো, ‘এই ভালো, এই ভালো। কাছাকাছি থেকে আঁব আমি পারছিলাম না ছেড়ে থাকতে।’

‘না, না, না। তুমি যাবে না। তুমি যাবে না।’

টুনির সেই কান্নাভরা বেদনাব গুঞ্জন দিকে-দিকে ভেসে বেড়ালো, নির্মলের চুল ছি ডতে ইচ্ছে কবলো নিজেব আহাম্মক বাগেব জগ্ন। একটা হালভাণ্ডা নৌকোব মতো শিথিল হ’বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুনিব কঁপে-কঁপে-ওঠ। মাথাটায ক্রমাগত হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তাবপব অবিশ্রি অনেক চেষ্টা কবেছিলো সে এ থেকে মুক্তি পাবাব। কিন্তু পাবলো না। যুদ্ধেব চাকবিতে একবাব নাম লেখালে কি আর তাব উচ্ছেদ আছে ?

প্রিয়নাথবাব হাতাকাব ক’বে উঠলেন, ননীবালাও চোখ মুছলেন আচলে, নির্মল নিজেও স্থিব থাকতে পাবলো না, একমাত্র টুনিই চূপ

যাবাব আগেব দিন সাবা বেলা কাটালো সে তাদেব সঙ্গে, ননীবালা মেয়েকে বিশ্রাম দিলেন সেদিন, নিজেই বাস্তা কবলেন নানাবকম, ব্যথিত গলায বললেন, ‘মাঝে-মাঝে ছুটি আছে তো ?’

থেতে-থেতে নির্মল বললো, ‘তা হয়তা আছে।’

‘যে কোনো একটা ছুটিতে এসে বিয়ে ক’বে যেযো।’

কোণে পুতুলেব মতো নিঃশব্দ নিম্পন্দ টুনিব দিকে তাকিয়ে নির্মল বললো, ‘এতো ভাবছেন কেন। কত লোক যাচ্ছে, কবে আসছে, ছুটি তো হামেশাই পাচ্ছে তাবা।’

ননীবালা বললেন, ‘তবু তো ভয় কবে।’

‘ভয় কিছুই নেই। ববং প্রচূব টাকা নিয়ে একদিন যখন ফিরে আসবো, কত ভালো লাগবে আপনাদেব।’

যবেব জানালাব কাছে তাকিয়ে-থাকা প্রিয়নাথবাবুর গলা পাওয়া
গেলো, ‘তাই তো। টাকাই তো সব।’

যাবাব সময় টুনির কাছে বিদায় নিলো নির্মল, ‘তবে যাই?’

টুনি চুপ।

‘ভালো থেকো।’ কান্নাকে চোক গিলে বৃষ্টির ভেতবে পাঠিয়ে দিলো সে।

টুনি চুপ।

‘টুনি।’

সাদা নেই।

‘কথা বলো।’

মানুষটাবকি প্রাণ নেই? কাধের উপব ছই হাত বেখে চোখে-চোখে
তাকালো নির্মল। চাবটি চোখের অপলক দৃষ্টি যেন অনন্ত কালের জগৎ
থেমে বঠলো। তাবপব কখন মেঘ গ’লে বৃষ্টি নামলো, বৃষ্টির অবিবল
বা বায় নির্মলের নতুন-বেনা শাটের বক চুপচুপে হ’য়ে ভিজে গেলো কখন
কে জানে। ঝড়ের দাপটে ব্যাকুল গাছেব মতো ছটকট করতে-কবতে
পায়েব কাছে লুটিয়ে পড়লো টুনি, ‘তুমি যেয়ো না, যেয়ো না।’

আব তাবপব?

তাবপব আজ এই। এই তো ব’সে সব গলিটায়, এই তো ব’সে-ব’সে
যা নেই, তার জগৎই সমস্ত মনপ্রাণ ব্যাকুল কবে ঘুমকে বিদায় দিচ্ছে,
যা ছিলো তার যন্ত্রণায় অস্থির হ’য়ে বেবিযে এসেছে বাইবে, রাস্তায়,
আকাশেব তলায়।

কিন্তু টুনি। তুমি কি আজ সব ভুলে গেলে? সব? এক কণা স্মৃতিও
কি নেই আর তোমার মনের মধ্যে? কিছই নেই।

বাত হগেছে। দু-একটা বিকশব টুংটুং, নিজ্ন বেডালের পা টিপটিপ, আব কুকুবেস ঘেউঘেউ। গোকটা জাবব কাটতে-কাটতে কখন ব'সে পড়েছে, গলি জুড়ে ছাগলগুলো শুয়েছে ঘেঁষাঘেঁষি ক'বে, আর নির্মল ভাবছে রাত শেষ হ'য়ে আবাব আলো ফুটবে কখন।

এই কলকাতা শহরে আবাব কি কখনো আমি তাকে দেখতে পাবো না? কতটুকু শহর? এব মধ্যে খজে-খুঁজে কি আবাব বাব কবতে পারবো না সেই মুখ? কখনো কি আব দাঁড়াতে পারবো না সেই সুন্দরী স্নগন্ধি মেয়েটির মগোমুখি? চোখে চোখ বেখে একবাব জিগ্যেস কবতে পারবো না কোনোদিন সে চিনতো কিনা এই হতভাগাকে, যে-হতভাগাকে দেখে আজ তাব স্মৃণা নেমেছে চোখে, লজ্জাবোধ হয়েছে স্রবেশ ভদ্রলোকটির পাশে ব'সে একদা চিনতো ব'লে। যে-হতভাগ্য দিনেব পব দিন, বছরের পব বছর পাগলেব মতো তাকেই খুঁজে বেডিয়েছে।

একটা সিগারেট ধবিয়ে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালে সে। একটু দাঁড়িয়ে বইলো, তাকিয়ে বইলো, তাবপর হাঁটতে লাগলো কী জানি কোনদিকে। হা ওয়া দিলো ফুবফুব ক'বে। এই গলিতেও ঈশ্ববেব দাক্ষিণ্য। সে আছে। আছে। এই তো মাথাব উপব আছে জ্যোৎস্নাধোয়া আকাশ, চোখের উপর তাবা, আব নির্মল কণ্ঠস্ববেব অখিল মিস্ত্রি লেনের এমন এঁদো পচা মেসেব গলিতেও তাব ঠাণ্ডা নিশ্বাস। তাব আশীর্বাদ।

দ্বিতীয় খণ্ড

এক

পবিত্র হ'য়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে, ঝকঝক কবছে বলকাতা শহর।
পিচের বাস্তায় গাছেব ছায়া। মানসী বাস থেকে নেমে তার ঝুলন্ত
খোঁপায় রং-কবা আঙল বুলিয়ে ভুরু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।
সোমেশ্বর বললো, 'সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, না ?'

মানসী তেমনিই সামনেব চল-যাওয়া বাস্টাব দিকে তাকিয়ে থেকে
জবাব দিলো, 'হঁ।'

'কী করবে ? ইট্টেই যাবে, না একটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি ধববো ?' বডো
বাস্তা থেকে সামান্যই দূর মানসীর বাড়ি। হাঁটা কিছুই কঠিন নয়, কিন্তু
সে অভ্যেস তার নেই। গাড়ি এখনো কেনে নি সে, কিন্তু যাদের গাড়ি
আছে তারা আছে তাব দরজায়। তাছাড়া এখানে-ওখানে যখনই গানের
ঢাক পড়ে গাড়ি তো তারাই দেব। কাজেই বাস ট্রাম রিক্সা, হাঁটা
কোনোটাই আব দবকার হয় না তার।

অগ্রমনস্ক মানসী আবার বললো, 'হঁ।'

সোমেশ্বর অবাক হ'য়ে ঘুবে দাঁড়ালো, 'হঁ কী ? কী দেখছো তুমি
অমন ক'রে ?'

কী দেখছে ? মানসী নিজেও যেন ভাবলো সে-কথাটা। নামবান
সময় সে-লোকটা ছডমুড ক'বে পিছন-পিছন দু-চোখ দিয়ে ধাওয়া করেছে,
মুখোমুখি না-দেখলেও সে-লোকটার অসভ্য দৃষ্টি অন্ততব ক'রে রাগে
সারা শরীর চিডবিডিয়ে উঠেছে তার, তাকে দেখছে নাকি ? না কি
চলন্ত বাসের ল্যান্ডিং-এর একেবারে প্রান্তে, হাতের মুঠোয় একটুখানি

ভর রেখে শরীরের প্রায় সবখানিই বা'র ক'রে দিয়েছে যে-লোকটা, আর একটু হ'লেই যে-লোকটা প'ড়ে যেতো তার পায়ের কাছে, একটা ল্যাম্পপোস্টের চকিত আলোয় তার মুখখানা দেখেই সে থমকেছে ? বুঝে উঠতে পারলো না ঠিক । দোতলা লেল্যাও ডেকান, রাজার মতো গর্বিত ভঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ বাক ফিরে যত দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে গেলো তাব চোখ থেকে, তত দ্রুত একটা কিছু ভুল দেখতেই বা বাধা কী ? তবে কি মানসীর মনের গভীরতম প্রদেশে এখনো কোনো একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বপ্ন ছায়া ফেলে রেখেছে ? কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আলগা ক'বে রেখেছে একটুখানি জায়গা ? যে-জায়গাটুকু সবুজ ঘাসেব আস্তরণে এখনো শামল । নয়তো আজ হঠাৎ চমৎকার পার্টির পরে, চমৎকার গান গেয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে অতিশয় ধনবান ভাবী স্বামীর সঙ্গে এমন নিরালো নিজন রাতে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে এই ভ্রান্তি হবে কেন চোখের ? সোমেশ্বরের কথায় হাসলো একটু, মুছ গলায় বললো, 'কিছু না ।'

'লোকটাকে ধ'রে চাবকানো উচিত ।'

শিহরিত হ'য়ে মানসী বললো, 'কাকে ?'

'কাকে আবার ! ঐ লোফারটাকে । কী ভাবে ঝুলে পড়েছিলে দেখেছো ?'

'চেনা-চেনা লেগেছিলো বোধহয় ।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরে-ধীরে হাঁটতে লাগলো মানসী ।

'তাহ'লে হেঁটেই যাবে ?'

'আহা । এটুকু আবার হাঁটবো না তো গাড়ি চড়বো নাকি ?'

'তাই ভালো ।' সোমেশ্বর গদগদ হ'লো, 'এসময়ে হাঁটতেই ভালো লাগে । আর তোমাদের পাড়াটিও সুন্দর ।'

'তা ভালোই ।'

‘একখণ্ড জমি তো কিনেছি লেকের ধাবে, দেখি এ-বছরের মধ্যে
তুলে ফেলতে পারি কিনা বাড়িটা।’

‘আমাকে ভাড়া দেবেন তখন।’

‘তাই তো। সেই ভাড়াব টাকাটা আবার নিজের আঁচলের চাবি
দিয়ে নিজের আলমারিতেই তুলতে হবে তোমায়, মন্দ কী।’ বসিকতা
ক’বে খুব হাসলো সোমেশ্বর। আব মানসী ইজ্জিতটা বুঝে চুপ ক’রে
বইলো।

‘মানসী,’ সোমেশ্বরের গলা বেশ গাঢ় হ’লো এবার, ‘আব আপত্তি
না ক’বে তাবিখটা ঠিক ক’বে ফেলো, কেমন?’

মানসী আশু বললো, ‘বেশ তো।’

‘অন্তত লোকজন ডেকে একটা উৎসব তো হ’য়ে যাক, তারপর
না-হয়—’

‘তাই তো।’

‘তোমাব যেন কিছুতে মন নেই। কেন বলো তো? এই তো খানিক
আগেও কত মুডে ছিলে।’

‘কই, না তো।’ সমস্ত চিন্তার জটে একটা ঝাঁকানি দিলো মানসী।
বাসের অগুন্তি লোকেব মধ্যে কে-একটা লোকের মুখে কী ভুল সে
দেখেছে তাব ঠিক নেই, আর তাই নিয়ে কী সব বাজে চিন্তা। নিজেকেই
নিজ্জে চোখ রাঙালো। যাব চেহারা ভালো ক’রে মনে নেই তাকে ভেবে
কেবল সময়ের অপব্যবহার। শেষ তাকে কবে ভেবেছে মানসী, তাই
কি মনে পড়ে আজ? ছেগেবেলাকার এক ভাঙা পুতুলের স্মৃতি। স্মৃতি
স্মৃতিই। তাই নিয়ে মানসীর মন কোন পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার
হ’য়ে পিছু হটতে চায়? পেছনে কী আছে? কেবল গভীর অন্ধকারে
আচ্ছন্ন কতগুলো যন্ত্রণাব ইতিহাস। না, না, আর আমি ফিরে তাকাতে

চাই না। যা গেছে তা গেছে, যা হয়েছে তা ঠিক হয়েছে। হবার জগুই যায়।

‘মণি।’

বুকটা ধড়াস করলো মানসীর। সোমেশ্বরের আবেগভরা গলা নীরব রাস্তায় ভয় ধবিয়ে দিলো তাকে। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ‘একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন দয়া করে, মা হয়তো ভাবছেন কত কিছু।’

‘কিছু ভাবছেন না।’ একেবারে গা ঘেষে পাশে-পাশে হাঁটলো সোমেশ্বর, ‘তিনি জানেন তাঁব মেয়ে ঠিক জায়গায় ঠিক মানুষটির হাতেই আছে।’

তা ঠিক। সে-কথা মানসীও জানে বৈকি। দেবি করলে চিন্তা করা তো দূরবে কথা, সাবাবাত না-ফিবলেও কি তিনি খুব বেশি বিচলিত হবেন? বরং তাঁব বোকা মেয়ে একটু চালাক হয়েছে ভেবেই আবো নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন পায়ের উপর একটি পাংলা চাদর টেনে দিয়ে।

তবু সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো, প্রায় ঝড়ের বেগে। ভারি সোমেশ্বর হয়বান হ’লো তাতে। মানসী পাংলা মেয়ে, সাবা শরীর তাব পুষ্ট কিন্তু এতো পুষ্ট নয় যাকে মেদ বলে, কাজেই দৌড়তেই বা তার কষ্ট কী? কিন্তু সোমেশ্বর তা পারে না। শুধু তো শরীরের ভারই নয়, দৌড়ে, ছুটে, হাঁপিয়ে, ঝাঁপিয়ে তাকে কি কখনো কোনো কাজ করতে হয়েছে আজ পযন্ত? কলকাতাব বনেদি বডোলোক তারা, বাপ-দাদার সম্পত্তি গিয়ে-গিয়েও যা আছে তাতেও নাতি পযন্ত কেটে যাবে স্থখে। না-হয় রোলস রয়েসের বদলে আজকাল হিন্দুস্থান গাড়িতেই পর্যবসিত হয়েছে অবস্থা, তবু এই বাগচিরা বাগচিই। এই তো সেদিন বাপ মারা গিয়ে স্বাধীন ক’রে গেলেন তাকে। ভাগ্যেব স্থলয়ে সে একমাত্র পুত্র হ’য়েই জন্মেছিলো, সবই তার, আর তা একা তার পক্ষে যথেষ্ট।

....হুই

গান-বাজনার উপর বোঁক বাগচিদের বংশাশ্রমে । চতুর্থ পুরুষ আগে সোমেশ্বরের প্রপিতামহের বাপ রত্নেশ্বর বাগচির আমলে ভারতবর্ষের সব চেয়ে বিখ্যাত গুস্তাদদের সম্মেলন হ'তো বাড়িতে । পুজোর সময় আর জন্মাষ্টমীর সময় একপক্ষকাল পর্যন্ত চলতো সেই উৎসব । হাজার হাজার টাকা জলের মতো বেরিয়ে যেতো ঐ ক'দিনে । রত্নেশ্বর নিজে ছিলেন মস্ত মুদঙ্গ-বাজিয়ে, বড়ো-বড়ো ধ্রুপদীদেব সঙ্গে বাজিয়ে হয়রান ক'রে দিতে পাবতেন, রাতের পর রাত বাজিয়ে একফোঁটা ক্লান্ত হতেন না । আব-কোনো নেশা ছিলো না তাঁর, শুধু এই । আর তাঁর ছেলে বীরেশ্বর শুনতেন বাঁজির গান, মশগুল হ'য়ে থাকতেন বাগানবাড়িতে, চুর হ'য়ে থাকতেন নেশায়, লালশেব মতো গেরবর্ণ মোটা শরীষটা টেনে তুলে খাস-চাকর রামকিঙ্কর তাঁকে নিয়ে আসতো ভোর-বাত্রে বাড়িতে, ডুরে শাড়ি-পর্য, ঘোমটা-টানা ছোটো বউ, ফোলা-ফোলা ঘুমভাঙা, কান্না-রাঙা চোখে দরজা খুলে দিতো শোবার ঘবেব । তারপর মাথায় ঠাণ্ডা জল দিতো, চন্দন-পাথর বাতাস দিতো, হাত বুলিয়ে দিতো পায়ে, বীরেশ্বর আমেজ ক'রে ঘুমুতেন । তারপরে রামেশ্বর । সোমেশ্বরের ঠাকুরদা । তত-দিনে জমিদারির তেজও যেমন ক'মে এসেছে, আধুনিকতার হাওয়াও বইছে তেমনি জোরে । তিনি আমূল পরিবর্তন ক'রে ফেললেন সব । ফরাস-তাকিয়ার বদলে পাতলেন সোফা-সেটি, গলায় তুলসীর মালা কতুয়া গায়ে ম্যানেক্জার তারিণী সরকারের বদলে এক স্ফট-বুট-পর্য ছোকরাকে নিয়ে এলেন জমিদারির রাশ টানতে । ছিপছিপে চেহারা, তীক্ষ্ণ নাক, জলজলে চোখ, বিলেতের জল খেয়েছে সাত বছর । ব্যয়-বাহুল্য কমিয়ে, বাগানবাড়ির পাট উঠিয়ে আবার গুছিয়ে নিলেন সব রামেশ্বর । পাঁচ মেয়ের পর এক ছেলে সুরেশ্বরকে বিলিতি ইঁস্কলে

পড়ালেন। আর স্বরেশ্বরের ছেলে এই সোমেশ্বর। সে তার পিতার চেয়ে আরো বেশি অগ্রসর। কলেজের গণ্ডিও ডিঙিয়েছে সে, ঘুরে এসেছে বিলেত থেকে। দেনার দায়ে তিনটে বাড়ি বিক্রি হ'লেও, শ্রামবাজারের বসতবাড়িটা সেখানে তেমনি অটুট চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে মাথায় গোল গম্বুজ নিয়ে। গম্বুজের মাথায় এখনো তেমনি আলো জ্বলে, সেই আলো বহুদূর থেকে দেখতে পায় লোকেরা, বলে, রাজবাড়ির আলো। মস্ত ফটকের ভেতরে তাকালে প্রথমেই মাঠের মাঝখানকার মোটা লোহার চেনে আবদ্ধ সবুজ লনটা চোখে পড়ে, চারদিকে বং-বেরঙের ফুলের বর্ডার, আর সেই লনের ঠিক মধ্যখানে, মস্ত সিংহমুখ ফোয়ারা থেকে ছিটকে-ছিটকে জল পড়ে সারাদিন। এপাশে-ওপাশে গোল হ'য়ে ঘুরে গেছে লাল স্বরকির বাস্তা, একেবারে একতলা সমান উঁচু বাড়ির শ্বেত-পাথরের বারান্দাব পায়ের তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ধাপে-ধাপে উঠে গেছে প্রশস্ত সিঁড়ি, এতোদিন এই বাড়িতেই বাস করেছে সোমেশ্বর, এই সিঁড়ি দিয়েই নেমে এসে হিন্দুস্থান গাড়িতে চ'ড়ে হাওয়া খেতে গেছে, গেছে বডো-বডো হোটেলের নির্দিষ্ট কামরায়, অনেক রাত হ'য়ে গেছে বাড়ি ফিরতে। তাকে নামিয়ে দিয়েই গাড়িটা গেটের বাঁ-দিক জুড়ে পাশাপাশি চারটে গ্যাবেজের একটাতে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছে আবার কালকের রাত জাগবার ধকল সহ্য করবার জন্ত। কর্তাদের আমলে এই ঘরগুলোতে ঘোড়া থাকতো। শোনা যায়, হাতিশ নাকি ছিলো দুটো। কৃষ্ণচূড়া গাছের গুঁড়িতে মোটা লোহার শিকলে বাঁধা থাকতো। সারাদিন, সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতো। এখন সে-যুগ নেই, সোমেশ্বরের ঠাকুরদার আমল থেকেই মোটর গাড়ির চল হয়েছে। হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া—এ-কথাগুলো এখন স্বপ্নের কথা। সেই ঘরগুলোর চেহারাই কি এরকম ছিলো? এই গ্যাবেজের

মতো ? না কি সেই সব ক্রহাম-ফিটনের সহিসরাই এই থাকি প্যান্ট আর বুশশার্ট-পর্য ড্রাইভারদেব মতো নিরলংকার ছিলো ।

এই বাড়িটাও অবিশিষ্ট কিছুদিন থেকে পছন্দ হচ্ছিলো না সোমেশ্বরের । বড়ো পুরোনো ধবনেব । বাড়ির অধিবাসীদেরও সহ হচ্ছিলো না । কিন্তু যদি সুরেশ্বর বাগচি বেঁচে ছিলেন, থাকতেই হয়েছিলো, তাঁর মৃত্যুর পরেও ছিলো কিছুদিন, কিন্তু মানসীব সঙ্গে আলাপ হওয়াব পরেই ছেড়ে দিলে । পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা ঠাকুমা বইলেন সেখানে ভিটে আগলাতে, আব বইলো তাঁর বিধবা মেয়ে, অর্থাৎ সোমেশ্বরের একমাত্র পিসি তাঁর তেবোটি সন্তান নিয়ে, আর রইলো রাশীকৃত আশ্রিত-আশ্রিতার দল । সোমেশ্বর মাসোহারা দিলে চুকিয়ে দেয় তাদের সঙ্গে সব দেনা-পাওনা । নিজেব মা মারা গিয়েছিলেন শিশুবয়সে, নিঃসন্তান সংমা আছেন কাশীতে, তাব মাসোহারাও যায জমিদারি থেকে — আর সে নিজে শ্রামবাজারের পচা রাস্তা আর পুবোনো বাড়ি ছেড়ে এসে উঠেছে কুইনস পার্কের মস্ত এক ফ্ল্যাটে । আছে হাত-পা ছড়িয়ে স্বাধীনভাবে । বয়স ভারি হ'য়ে এসেছে, চুলের বং তামাটে হয়েছে, বাঙালির পক্ষে প্রায় অসম্ভবিত যৌবন । এতোদিন বিয়ে কবে নি কেন তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই । কেউ বলে সেটা বিলেতে থাকতেই সেরে এসেছিলো, কেউ বলে কোয়ার্টাই তার চিরব্রত । আবার কেউ-কেউ বলে বুড়ো বয়সে সুরেশ্বর বাগচি ছেলের জন্ত মেয়ে দেখতে গিয়ে নাকি নিজেই বিয়ে ক'রে এনেছিলেন, সেই থেকেই এই ভীষ্মত্বপ্রাপ্তি । তা যা-ই হোক, এখন সে মানসীর জন্ত বুক বিছিয়ে দিতে পাবে রাস্তায়, জমিদারি লাটে উঠিয়ে সন্ন্যাসী হ'তে পাবে । এই কোকিলের মতো গলার মেয়েটির জন্ত সে না-করতে পারে কী ?

গান । গানই পাগল করেছে তাকে । গানের জন্ত আলাপ করেছে খুঁজে-খুঁজে, গানের জন্তই এই মেয়েটির আকর্ষণ আজ পর্যন্ত ছাড়াতে

পারছে না। তা নৈলে এই মেয়ের বিমুখতাই কি সে কম সহ্য করেছে। এই তো, এই যে দৌড়ে-দৌড়ে হাঁটছে সে, তাব পেছনে ছুটতে কি কষ্ট হচ্ছে তার? ছুধের মতো মন্সণ গায়ের রঙে ঝলকে-ঝলকে বস্তু দেখা যাচ্ছে, দুই ভাঁজ থংনিব ফাঁকে অকথ্য ঘাম।

বাড়িব দবজায় কলিং বেলে হাত বেখে হাঁক ছাড়লো মানসী দত্ত মল্লিক। যেন ঘাম দিয়ে জব নামলো তাব। মুখ ফিবিযেঁ মুছ হেসে বললো, ‘আপনাব কত কষ্ট হ’লো হাঁটতে।’

ঘাড়ে গলায় কমাল ঘষতে-ঘষতে সোমেশ্বর সংশোধন কবলো, ‘হাঁটতে নয়, দৌডতে।’

‘আমবা সব নিতাস্ত গরিব ঘবের মানস্ব,’ গলায় বেশ দরদ দিলে মানসী, ‘হাঁটা-চলা সবই ব্যস্ত-ব্যস্ত, আপনাব তো কষ্ট হবেই।’

‘তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছো?’

‘না। ছি।’

‘তবে এ-সব বাজে কথাগুলো বলো কেন?’

‘ঠিক ব’লেই বলি। বাগ কবলেন?’

‘বাগ ক’বে আব থাকতে পারি কই?’

তা সত্যি। বাগ ক’বে সে থাকতে পারে না। তা যদি হ’তো তবে কি আজ এই মেয়েকে বাগে আনতে পারতো? মানসী স্বভাবতই শাস্ত নম্র। মধ্য-মধ্য হঠাৎ-হঠাৎ কেন যে এমন একটা নিষ্ঠুরতা বেরিয়ে আসে, বুঝতে পারে না সোমেশ্বর।

তা হোক, তবু মেয়েটা ভালো। সচ্চরিত্র।

মানসী আবার কলিং-বেলে চাপ দিলো জোরে, বললো, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন, মা আমার জন্ত মোটেও ভাবছিলেন না।’

‘কী ক’বে জানলে ?’

‘গভীর ঘুম না হ’লে কি দু-বাব বেল বাজাতে হয় ?’

‘তাই তো। তবু তো তুমি কত দৌড়ঝাঁপ কবলে।’

‘আমার ভুল হয়েছে।’

‘তোমার বাড়িটি বেশ।’

‘হ্যাঁ, লেকটা একেবারে কাছে কিনা।’

‘সুন্দর লন আছে একটি।’

‘সবকারি লন, কী-ই বা লাভ তাতে।’

‘আহা। লাভ-লোকসানের কথা কী। একটা আউটলুক আছে না ?’
কত ফ্ল্যাট ভেতরে গেলে বেশ, কিন্তু এনট্রেনসটা একেবারে রেচেড।
অতি হতচ্ছাড়া। আমি এ-বিষয়ে খুব পার্টিকুলার, বাড়ি পছন্দ কববার
আগে তার বাইবেব শোভাটা দেখে নিই।’

‘ভালোই কবেন।’

‘বাই দি ওয়ে, মণি, একটা কথা—’

‘নলুন,’ মানসী’র হাত বেলের উপর আনো জোঁব চাপ দিলো।

‘সামনের মঙ্গলবাব, ছোট মীনস্ টোয়েনটিবেথ মার্চ, আমাদের এনাগেজ-
মেন্টের উৎসবটা আমবা সেবে ফেলি না।’

‘সামনের মঙ্গলবাব।’

‘তুমি তো বলেইছিলে আব দেবি করবে না, সামনের মঙ্গলবার
তোমার জন্মদিনও আছে, আরো একটু লার্জ স্কেলে পার্টিটা যদি দাও
তাহ’লে— কিছু মনে কে।রো না, থরচ কিছু আমি দেবো।’

মানসী চুপ ক’রে বইলো। সে জানতো না মঙ্গলবাব তার জন্মদিন,
জানতো না মা কখন নিমন্ত্রণ কবেছেন এঁকে। ভাবতে লাগলো সত্যি-
সত্যি তা’ব জন্মদিন কবে। সত্যিই তা’ব বয়স কত। এ-সব খবর মানিজ়েই

কি জানেন ? যখন ছোটো ছিলো বয়সের কথা ভাবে নি, কেউ জিগ্যেস করলে মা বলতেন ‘এই ছ’ সাত’, অতএব সে নিজেও তাই বলতো । সেই বলাচাঁ বহুদিন চলবার পরে একদিন মা-র গলা জড়িয়ে ধ’রে রাত্রি-বেলা জিগ্যেস করলো, ‘মা, আমাব কি এখনো ছ’ সাত বছর বয়স ? তুমি কবে বলেছিলে, তার পরে তো কতদিন হ’য়ে গেলো, আমি এবার বড়ো হবো । পু’টির কেমন তরতর ক’রে দশ হ’য়ে গেলো, আমি বুঝি সেই ছ’ সাতোই প’ড়ে থাকবো ?’

হাত দিয়ে গলার বাঁধন ছাড়িয়ে দিলেন মা, বললেন, ‘মেয়ের খালি পাকা কথা । পু’টি আর তুই বুঝি সমান ?’

‘ই্যা তো । সমান তো । আগে তো সমান ছিলাম ।’

‘নে চূপ কর । বকবক করিস নি মেলা ।’

টুনি দুঃখিত মনে চূপ করেছে কিন্তু জিগ্যেস করলে ছ’ সাতও বলে নি আর, কিছুই বলে নি ।

তারপর ন-দশ হ’য়েও অনেকদিন ছিলো, আর তার পরে ষোলো-সতেরোর গণ্ডি কাটাতে তার প্রায় গলদঘর্ম হ’তে হ’লো । আর মিথ্যে কথা বলতে-বলতে মা নিজেই ভুলে গেলেন মেয়ের জন্মতারিখের কথা । হঠাৎ একটা জন্মদিনের খবর শুনে তাই অবাক না-হ’য়ে পারলো না সে । আর তাকে চূপ ক’রে থাকতে দেখে, সম্মতি ভেবে খুশি হ’লো সোমেশ্বর । খুব ঘন হ’য়ে কাছে দাঁড়িয়ে, প্রায় কানে-কানে বলার মতো আশ্বস্ত ক’বে বললো, ‘আর কোনো ওজর না, কেমন ?’

দরজা খুলে দিলেন মিসেস দত্তমল্লিক । আর খুলেই সামনে মেয়েকে আর সোমেশ্বরকে অত ঘন হ’য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্ত-ঘুমভাঙা স্তিমিত চোখ সতেজ হ’য়ে উঠলো । গুরুজনমূলভ লজ্জায় তিনি জেজের

টুকে গেলেন। আর সেই সময়টুকু মধ্যাহ্নে মাকে অনেক বারের মতো আরো একবার নতুন ক'বে দেখতে পেলো মানসী।

কতই পর্যন্ত ঢাকা ধবধবে শাদা অতিশয় দামি পাংলা কাপড়ের ব্লাউজ পড়েছেন তিনি। পবনে দামি সর্ক কালোপাড তাঁতের ধুতি, পায়ে শাদা কাপড়ের অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো স্ট্রাউল। দেখাচ্ছে বেশ। চুলের ত্রীলটি মা-র ববাববই স্নন্দব, তাকে তিনি আরো স্নন্দব ক'বে আঁচড়েছেন। কে বলবে যে এই মা একদিন মোটা খাপি ছেঁড়া শাড়িতে আধো শরীর ঢেকে পুকুরঘাটে ব'সে বাসন মেজেছেন, জল ঘেটে-ঘেঁটে হাজা হযেছে হাতে। মনে-মনে হাসলো মানসী। আমাকে দেখলেই কি আজ কারো মনে পড়বে সে-কথা? যে-লোকটা বাস থেকে প্রায় ঝুলে পড়েছিলো রড ব'বে সে-ই কি ভাবতে পাববে কিছু?

উপবে উঠে এসে ঘবে টুকে ড্রিংক্রমের আলো জ্বাললো সে। ঝলঝল ক'বে উঠলো দক্ষিণখোলা, মোজেক করা, মানসী দত্তমল্লিকের স্ক্রুচিসম্পন্ন বসাব ঘর।

মানসী দত্তমল্লিক। কলকাতার বিশিষ্ট অধিবাসী। গানের জগতের মধ্যমণি। গুণী-সম্প্রদায়েব একজন। আবার মনে-মনে হাসলো মানসী। মা বললেন, 'তোমাদেব পাটি বেশ জমেছিলো তো?'

'জমবে না? পাটিটা বস্ত্রত কাকে নিয়ে ছিলো তা বোধহয় আপনি জানেনই না।' সোমেশ্বর হাসিতে সারা শরীর দোলালো।

'কাকে নিয়ে?' মিসেস দত্তমল্লিকও কথাগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে খুশির গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলেন।

'আপনার প্রতিভাশালিনী মেয়েকে নিয়ে। ওকেই আজকের সম্মিলনীতে আমরা প্রধান অতিথির পদ দিলাম। নেক্সট সভায় ঠিক হযেছে একটা মানপত্র দেওয়া হবে। তা আমি বলছিলাম কী-'

‘বলো—’ মা-র গলা গদগদ ।

মানসী ভেতবে ঢুকে গেলো পর্দা ঠেলে

প্রথমে নিজেব ঘবে এসে দাঁডালো চূপচাপ । মাঝাবি সাইজের সুন্দব
খোলামেলা ঘবটি । দক্ষিণদিকে তাকালে সোজা লেকেব আকুল জলরাশি ।
আকুল ? বিশেষণটা ভুল হ’লো । লেকেব জল কোনো সময়েই আকুল নয,
ঘুমন্ত । প্রচুব আলস্ত্রো আচ্ছন্ন সেই জল । প’ড়ে আছে, শুষে আছে, আকণ্ঠ
খাওয়া ময়ালের মতো নিশ্প্রভ, নিস্তেজ । লেকেব দিকে তাকালেই মানসীব
আব-একটি মেয়েকে মনে প’ড়ে যায়, যে-মেয়েটির একটিমাত্র ভঙ্গিই শুধু
তাব স্মৃতিতে লেগে বযেছে, যে-ভঙ্গি তাব কান্নার । কান্নার পাখাব, চোখেব
জলেব বগ্গা । সেই কান্না কেউ দেখে নি, শুধু মানসী দেখেছে । মানসী তাকে
ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কঁাদতে দেখেছে, হাসবাব সময় কঁাদতে দেখেছে, কথা বলাব
ভঙ্গিতে কঁাদতে দেখেছে, দেখেছে শুয কঁাদতে, ব’সে কঁাদতে, বিনিস্র বাতে
বালিশ ভিজিয়ে কঁাদতে । কত যে গভীব সেই কান্না, কত নিশেধ, কত
বেদনাময়, তা ও মানসী জানে । কান্নাব দেয়াল-ঘেরা একটি বাড়িতে
খাকতো সে, সেখানে আকাশ ছিলো না, বাতাস ছিলো না, কিন্তু রাত্রি-
বেলা তাবাবা ছিলো । তাদেব দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে, ঠাণ্ডা সবুজ নবম
একটুকবো আলোব ইশারা পেযেছে সে, ঐ একটি স্তম্ভিত মুহূর্ত সারা-
দিনেব কান্নাব পবে । আর সব সমুদ্রেব নোনা স্বাদ ।

মানসী শিথিল হাতে ভেজিয়ে দিলো দরজাটা, তারপর দামি
শাড়িটা লুটিয়ে দিলো ছোটো চৌকো কার্পেটে, আলনা থেকে একটা
শাদা শাড়ি টেনে নিয়ে গায়ে জডালো । কিন্তু ব্লাউজটাও খোলা
দবকাব । কী জবডজং । অতএব ব্লাউজটাও সে ছাড়লো । তারপব বাথ-
রুমে এলো । কেমন যেন লাগছে, স্নান না-কবলে আব ঠাণ্ডা হবে না
মাথা ।

সময়ের হিসেব ছিলো না।

দরজায় জোবে-জোবে ধাক্কা দিলেন মিসেস দত্তমল্লিক। ‘চান কবছিস নাকি ? এই অসময়ে এতো বাত্রে কল খুলে এ কি স্নানের ঘটনা ?’

একটু থমকালো মানসী। যেন কতদূর থেকে আবার ফিরে এলো ‘স’।

মিসেস দত্তমল্লিকেব বিরক্ত কণ্ঠস্বর আবার বাংরুত হ’লো, ‘অদ্ভুত মেয়ে। ওদিকে সোমেশ্বর যে ব’সে আছে সে-খেয়ালও কি নেই ? না-হয় ও চ’লে যাবাব পরেই চান কবতিস। আয়, তাডাতাডি বেবিয়ে আয়। ৭ যাবে। তোকে ডাকছে।’

ঝরনার ঝরঝরো শব্দে অনেকক্ষণ মানসী ডুবে যেতে দিলো মা-র সেই ব্যস্ত উদ্বেলিত গলাব আওয়াজকে। তারপর একসময়ে ধীর গলায় জবাব দিলো, ‘কিছু বলছে।’

‘হ্যাঁ, বলছি !’ মিসেস দত্তমল্লিক রুষ্ট না-হ’য়ে পারলেন না, ‘কানে শুনিস না নাকি ? এতোক্ষণে খেয়াল হ’লো ?’

ভেতর থেকে টুনির শিখিল গলা তেমনি নিরুৎসাহ হ’য়ে দরজার বাইরে এসে পৌছোলো, ‘কেন ?’

‘কেন মানে ? সোমেশ্বর ব’সে রয়েছে আর তুই এতোক্ষণ ধ’রে স্নানই করছিস ?’

‘তুমি যাও না—’

‘সে-পরামর্শ তোমাকে দিতে হবে না। দয়া ক’রে একবার বেরিয়ে এসো। ওর গাড়ি এসে গেছে, ও এবার যাবে।’

‘যান না। আমি কী করবো ?’

মিসেস দত্তমল্লিক মেয়ের কথা শুনে তাজ্জব হ’য়ে গেলেন। একটু ‘প ক’রে থেকে জ’লে গিয়ে বললেন, ‘কী আবার করবি। লোকটা।

যাবে, বিদায় দিবি। যেমন পাঁচজন ভদ্রলোক ভদ্রলোককে দিয়ে থাকে যাবাব সময়ে।’

‘তুমিই তো আছে। আমাব একটু দেরি হবে।’

মিসেস দত্তমল্লিকের চাপা-চাপা ক্রুদ্ধ আওয়াজ সহসা প্রথব হ’য়ে উঠলো, ‘যেমন স্বপ্নল থেকে এসেছিস তেমনি জঙ্গলে স্বভাব। ভদ্রতা অভদ্রতাব জানিস কিছু? আজন্মের ছোটোলোকি অভ্যেস যাবে কোথায়?’

অনেকদিন আগের আব-একজন ভদ্রমহিলাকে ঝাপসা-ঝাপসা দেখতে পেলো মানসী এই গলাব শব্দে। আব-কিছু না ব’লে বাথটব থেকে নেমে গা মুছে, জামাব উপব শাড়ি জড়িয়ে বাইরে এলো।

চুল থেকে জল পডছে টুপটুপ। এখনো মানসীব কত চুল। নানা বকম আধুনিক খোঁপা কববাব স্তবধেব জগু লম্বায় অনেকটা কেটে নিযেছে সে, তব আছে। ঘন, কালো, ঢেউ ঢেউ। আঘনায় দাঁড়িয়ে ভেজা চুলটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে আবাব মুছলো। মুখ মুছলো, হাতের পাতা মুছলো— তাবপব চিকনিটা ছোঁয়ালো কি ছোঁয়ালো না, বেরিয়ে এলো ঘব থেকে।

বিদায় দিতে শুধুমাত্র দোতলাব ফ্ল্যাটের দবজা পযন্ত নয, একতলার দবজা পযন্তই আসতে হ’লো তাকে মিসেস দত্তমল্লিকের ইঙ্গিতে। সোমেশ্বব খুশি হ’য়ে বললো, ‘কাণ্ড ছাখো, আবাব একতলায় নেমে এলে?’

‘তাতে কী হযেছে?’ আবছা হাসলো মানসী।

সোমেশ্বব গাডিব পা দানিতে পা দিয়ে ঘাড় ফেবালো, ‘তাহ’লে ঐ কথাই রইলো?’

‘কী?’

‘মঙ্গলবাবই ঠিক হ’লো সব তোমাব মা-র সঙ্গে। আমি নিমজ্জিতদেব একটা লিফ্ট নিয়ে আসবো’খন।’

‘মঙ্গলবার ! পরশু ?’

‘তোমার মা ! সত্যি ! ওয়ানডারফুল ! এরকম শিক্ষিত একজন মহিলা আমি দেখি নি । তিনি আমাকে প্রকৃতই ভালোবাসেন ।’

মানসী দীর্ঘশ্বাস নিলো ।

‘তবে চলি !’

‘আম্বন ।’

‘কাল সকালে আসবো আবার, কেমন ?’

‘আসবেন ।’

‘তোমার যিহাসেল নেই তো কোনো ?’

‘না ।’

পা-দানি থেকে পা নামিয়ে একটু এগিয়ে এসে মানসীর হাতটা একটু ছ’লো সোমেশ্বর, মুহূ হেসে বললো, ‘রাত কাটাবার খোরাকটুকু নিয়ে যাই, যা কড়া তুমি, ভয়ই কবে আমার ।’ মানসী ভেতরে-ভেতরে কৈপে উঠলো, কিন্তু জ্যোৎস্না বাতের মতোই একটা হাসি ফুটে উঠলো মুখে ।

কিন্তু কেন ? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে ভাবলো সে । এর চেয়ে ভালো, সুন্দর, সুখের আর কী জীবন আমি আশা করতে পারি ? সমাজে সোমেশ্বরের পদমর্যাদা প্রায় শীর্ষস্থানে, তার স্বামিস্ব যে-কোনো মেয়ের কাম্য । তবে আমার আটকাচ্ছে কোথায় ? কেন আমি দিনের পর দিন তারিখের পর তারিখ পিছোচ্ছি— আর নিজেও গুটিয়ে যাচ্ছি শায়কের মতো ? এর কারণটা কী ?

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস দত্তমল্লিক, বললেন, ‘চ’লে গেলো ?’

মানসী মা-র মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো, ‘হ্যাঁ ।’

মেয়ে ভেতরে ঢুকলে তিনি দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। এতক্ষণে আবাব খোলস ছেড়ে আসল মানুষটি বেকলো তাঁর দেহ থেকে। পটাপট ব্লাউজের বোতাম খুলতে-খুলতে বললেন, 'ভালোয়-ভালোয় এখন দু-হাত এক করতে পারলে আমি বাঁচি।' গা থেকে আঁচলটা ফেলে ব্লাউজটা ছেড়ে নিলেন, ভেতরকাণ শাদা লেসেব ছোটোহাত আঁটো বডিসটাও খুলে ফেললেন চলতে-চলতে। মিসেস দত্তমল্লিকের বৃদ্ধ বৃকের দিকে এক পলক তাকিয়ে একটা সোফাস ব'সে পড়লো মানসী। পাখাব স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে মিসেস দত্তমল্লিকও বসলেন মুখোমুখি, কোমবেব পেটিকোটের দড়িটা খুলে ঢিলে ক'বে হাওয়া খেতে-খেতে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে লাগলেন পাটির কথা।

ব্রাহ্মণদের দ্বিজ বলে না? মা-র প্রশ্নেব হ-হাঁ জবাব দিতে-দিতে ভাবলো মানসী। কেন বলে? তাদের কি দু-বার জন্ম হয়? না তো। কিন্তু জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই তো তারা ব্রাহ্মণ হয় না, হয় পৈতে নেবার পবে। পৈতে নেবার পবে তাদের আবেক জন্ম হয়, তাই তাবা দ্বিজ। এতোকাল পবে এই ব্যাখ্যাটা বিশদভাবে মনের মধ্যে মানসী আলোচনা করলো। আর দ্বিজ বলে সাপেঁদের। তাবা খোলস ছাড়ে। সেটা তাদের আরেক জন্ম। আব দ্বিজ আমার মা।

'সবই ঠিক হ'য়ে গেলো, কে জানতো ভাগ্যের শ্রোতে ভাসতে-ভাসতে আমরা এখানে এসে দাঁড়াবো।'

মা-র বিগলিত কণ্ঠস্বর মানসীর চিন্তাব স্রুতো ছিঁড়ে দিলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'যাই, শুই গে।'।

'কী-কী গান কবলি আজ?'

মানসী আডমোড়া ভাঙলো । ‘ঐ তো সব আজ্জবাজ্জ—’

‘কেন ? আজ্জবাজ্জ কেন ? “প্রিয়তম”-এব গানটা গাস নি ?’

মা-ব চোখে চোখ রেখে, মুহূর্তকাল চুপ ক’রে থেকে মানসী বললো, না ।’

‘ও মা, তবে কী গেয়েছিস । ঐটাই তো সকলে শুনতে চায় । “বুকে এসো, নখনে নখন রেখে ?” সেটা ?’

‘না ।’

‘কেন ?’

‘এমনি ।’

‘অমনি আবার কী । একশোবার বলে দিলাম—’

রাগে গজগজ করলেন মিসেস দত্তমল্লিক, তারপর কোমরের আলগা চাপড় ধরতে-ধরতে চ’লে এলেন শোবার ঘরে, একেবারে নিজেব বৈছানাঘ । গা ঢেলে দিয়ে বললেন, ‘কে কী বললো ?’

পাশাপাশি ঘব । মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে দু জন দু-জনে দখতে পায়, দু জন দু-জনেব সঙ্গে কথা বলতে পাবে । আগে মানসী II-র সঙ্গে একঘরেই শুতো, এ-ঘবটা অমনি প’ড়ে থাকতো, কাপডেব মালমাঝি আব ড্রেসিং টেবিল বুকে নিয়ে । কিছুদিন যাবৎ একটা ছোট্টো II ট পেতে সে এ-ঘরে শুচ্ছে । খুট ক’বে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে মা-ব চাখের আডাল হ’য়ে বললো, ‘কী আর—’

‘এই যে তুই আধখানা-আধখানা কথা বলিস না, আমার ভীষণ রাগ বে ।’

‘কী বলবো ।’

‘কে কে এসেছিলো, কী কী বললো, গান ভালো হয়েছিলো কিনা । ব বলবি তো ?’

‘তুমি গেলে না কেন ? তোমাব তো নেমস্তন্ন ছিলো !’

‘তোদের সব সমানবয়সীদের মধ্যে আমি কী ক’রে যাবো ?’

‘তুমি তো যাও !’

‘গেলে তো আবাব তুই-ই বিবক্ত হোস !’

‘না তো !’

‘না তো আবাব কী ! আমি আব বুঝি না কিছু ?’

চাঁদেব আলোতে ঘব অন্ধকাব হ’লো না, হ’লেই ভালো ছিলো । আজ মানসী অন্ধকারকেই প্রার্থনা কবছে মনে-মনে । হঠাৎ জানালা দুটো বন্ধ ক’বে দিলো, তারপব বিছানায় ডুবে গিয়ে বললো, ‘বডেডা ঘুম পেয়েছে, মা !’

মিসেস দত্তমল্লিক সন্ধ্যা থেকে লম্বা ঘুম দিয়ে জেগে উঠেছেন, তাঁর ঘুম পাবাব কথা নয়, কিন্তু কী কবেন, মেয়েব ঝাঁপে আজ আবাব ভূত চেপেছে, আবাব আগেব মতো । স্তব্ধ ভাব ধবেছে সে, বেশি না-ঘাঁটিয়ে চুপ ক’বেই বইলেন ।

কিন্তু বেশ তো ছিলো যাবাব সময়ে, কী হ’লো হঠাৎ ? কতদিন ধ’রেই তো বেশ আছে, কত ফুটি, আনন্দ, বেডানো খেলানো, নিজের যেচে সোমেশ্বরের সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়েছে, আবাব এ ঢং ধরলো কেন ?

‘আচ্ছা মা,—’ মানসী ও-ঘর থেকে বিছানায় শুয়েই বললো, ‘মঙ্গল-বাব আমার জন্মদিন কবছো কেন ?’

‘একটু চুপ ক’বে থেকে মিসেস দত্তমল্লিক বললেন, ‘জন্মদিন, তা-ই !’

‘আমাব তো কখনো জন্মদিন হয় না !’

‘হয় না ব’লে যে কখনো হবে না তাব কী মানে !’

‘তাছাড়া আমাব জন্মের তাবিখও বোধহয় তে’মার মনে নেই !’

‘কেন থাকবে না । এই বকম শীত-গ্রীষ্মেব প্রথম দিকেই তুই জন্মেছিলি !’

‘এই মার্চ মাসেই ?’

‘তা হবে।’

‘ঠিক কুড়ি তারিখে ?’

‘ঐ রকমই—’

‘কোন সনে ?’

‘সন-ফন অত জানিনে।’

‘তবে কেন করছো ?’

‘থাম তুই।’

‘কতগুলো লোককে ডেকে, একটা মিথ্যে জন্মদিনের অভ্যুহাতে অনেকগুলো উপহার নেওয়াই কি তাহলে তোমার উদ্দেশ্য ?’

খুব কঠিন কথা। আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো মিসেস দত্তমল্লিকের। মেয়ে তাঁর যত নামই করুক, বয়েস তার যতই বাড়ুক, ঠিক আগের মতোই শাস্ত আছে সে, ভীৰু নেই কিন্তু শিথিল, অগ্নমনস্ক, যা যা করেন তাতে কথা কাটে না, প্রতিবাদ করে না। সে-অভ্যাস তার নেই। আজকের এই প্রতিকূলতার ছোট্টো একটু কণাই বৃহৎ ব’লে মনে হ’লো তাঁর। কাঁবিয়ে উঠে কী বলতে গিয়েও গলা তাঁর থেমে গেলো, এতো বড়ো, এতো বিখ্যাত মেয়েকে আর আগের মতো দাবিয়ে রাখতে তিনি যেন সাহস পেলেন না সহসা। বললেন, ‘এ-সব ব’লে তুমি আমাকে অপমান করতে চাইছো, না ? দশমাস পেটে ধ’রে জন্ম দিয়েছি কিনা, তারই এই শাস্তি।’

‘জানি তুমি রাগ করবে বললে, কিন্তু এ-সব ছল-চাতুরী আমার ভালো লাগে না।’

‘ছল-চাতুরী মানে ? তুই বলতে চাইছিস কী ?’ এবার রাগ ফুটলো গলায়, ‘নিজের মেয়ের জন্মদিন করবো সেটা আবার ছল-চাতুরী কী রকম ?’

‘আমাব বয়স কত ?’

‘আমি তোঁর সঙ্গে তক্ক করতে চাই না । মেঘে-নেঘে বেলা তোঁমার
কম কাটে নি ।’

‘সেটাই তো আমি জানতে চাই ।’

‘যদি বলি ছান্ধিণ, বিশ্বেস করবি ?’

‘কেন কববো না, মা ? তুমি লুকোলেও আমাব অন্তর তো সবই জানে ।
কিন্তু তুমি বলবে সেদিন এ কথা ?’

‘কী ?’

‘আমাব ছান্ধিণ বছর বয়স ।’

‘মেয়েদের বয়স কেউ জিগোস কবে না ।’

এবারে মানসী চুপ কবলো, কিন্তু একটু পবে বললো, ‘এই মাচ মাসেই
বাবা মাৰা গিয়েছিলেন মনে আছে তোঁমাব ?’

মিসেস দত্তমল্লিকেব বিছানা থেকে কোনো সাড়া এলো না এবাব ।
মানসী একটু অপেক্ষা ক’বে বললো, ‘বাবাব বাৎসবিক কাজটা এবাব খুব
ভালো ক’বে কববো ।’

মিসেস দত্তমল্লিক চুপ । তাঁব আবো কথা মনে প’ড়ে গেছে, মনে
পড়েছে প্রিয়নাথবাবুব মৃত্যুব এক বছর আগে ঠিক এমন দিনেই নিৰ্মলও
বিদায় নিয়েছিলো তাঁদের কাছ থেকে । আব সেই বিদায়ই চিব বিদায় ।
ভাগ্যিস । সেই একটা কারখানাব ছোঁড়া, তাকে অবলম্বন ক’বে বেঁচে
থাকতে গেলেই হ’য়েছিলো আব কি । নিজেকে তাবিস করলেন । বিয়েটা
বারে-বাবেই ঠেকিয়ে বেখেছিলাম ব’লে তাই না আজ এখানে এসে
পৌছোতে পাবলাম । কে জানে বোকা মেয়েটাব আঁবার সে-কথা মনে
প’ড়ে যাচ্ছে না তো ?

. তিন

যাচ্ছে না ? যা একদিন এই মানসী দত্তমল্লিকের সাবা বুকের পাজৰ খসিয়ে
দিযেছিলো, ছুমড়ে-মুচড়ে একাকাব ক'রে দিযেছিলো দিন আৰু ৰাত্ৰিৰ
ব্যবধান, কালো ক'রে দিগেছিলো সূৰ্যেৰ আলো, তা কি এতো সহজেই
ভুলে যাবাব ? মুছে যাবাব ? অৰণশক্তি নামক পদাৰ্থটো কি তবে এতোই
তবল ? না কি এ শুধু স্পেট পেনসিলেৰ একটা দাগ মাত্ৰ ?

দক্ষিণেৰ হাওঘাভবা মস্ত ঘৰেৰ মস্ত জানালায় এক আকাশভবা তাৰা
আব মুঠো মুঠো নবম চাঁদেৰ আলোয় তাকিয়ে ছাৰিৰ বহুৰেৰ মানসীৰ
কেবল আজ আঠাবো বহুৰেৰ টনিকে মনে প'ড়ে যাচ্ছে বাৰে-বাৰে ।
যে টুনি একথানা দবমাব বেডাঘেৰা টিনেৰ ঘৰে শেষাল ডাকা-বাতে
মলিন শয্যায় শুয়ে একজন মানুহক ভাবতে ভাবতে ঘূমেৰ গভীৰে
তলিয়ে যেতো, ঘূৰু ডাকা দুপুৰেৰ অসহ গবমে ঘামতে-ঘামতে কমালে ফুল
তুলতো, সঙ্কায় পাখিৰ ডাক শেষ হ'তে না হ'তেই, বাঙ্কিত মানুহটিৰ
আশায় উগুখ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো পথেৰ দিকে ।

সকাল থেকে তো শুধু কাজ আৰু কাজ । দশটাব সময় আছে বাবাকে
মাথা ধোয়ানো, খাবাব এনে দেওয়া, বাতাস কৰা, মালিশ কৰা, বিছানা
ঠিক কৰা—ককণ চোখে তাকিয়ে থাকতেন তিনি মেয়েৰ মুখেৰ দিকে,
আব শুধু সেই তাকিয়ে থাকা দিযেই যে কত কথা বলতেন, কত বেদনা
ধবাতেন তা জানতো টুনি । তাই চোখ নামিয়ে নিতো সে, চোখে চোখ
পডলে যদি তাৰ কান্না দেখ'ত পান তিনি । আব তাৰপৰ দুপুৰে—কানা
ঊঁচু বডো খালয় ভাত বেডে নিয়ে মা আব মেয়েৰ খেতে বসা, কখনো
পুইযেৰ চকুডি, কখনো কলমি-শাকেৰ ঝোল, কখনো-সখনো গ্ৰাটামাছ,
পুটিমাছ । মাছেৰ অভাবে মা-ৰ কষ্ট হ'তো, টুনি কিন্তু নিৰ্বিকাব । সুন্দৰ

হয়েছে খোসারিব ঘন ডাল, সর্ষেবাটাব পুঁই কিংবা লঙ্কাবাটা দিয়ে কলমি-
নতাব ঝোল। তাদাতাডি খেয়ে নিতে পারলেই হ'লো, তারপর তো
ছুপুৰ আছে। সকালেব পব যে-ছুপুৰ, আব বিকেনের পর সে-সন্ধ্যা—
এটাই তো জীবনের সব চেয়ে বড়ো কথা, বড়ো পাওনা। সেখানে খাওয়া-
পরা নিয়ে খুঁতখুঁত কবাব কতটুকু মূল্য? কিন্তু টুনিব সেই ভাবা আর তার
মা-র ভাবা, দুটো তো এক ছিলো না। পৃথিবীর আর কে-ই বা ভেবেছে
সে-কথা? তাব আনন্দ যে কী গভীর তা কি আব-কেউ জেনেছে? খেয়ে
উঠে মা মাহুব বিছিয়ে, বালিশে চুল মেলে দিয়ে শুতেন। তাঁব হাতের কাছে
পাখাটি বেখে একটি মস্ত পান সেজে দিয়ে, ঘবেব দবজাটি ভেজিয়ে এসে
পুকুরঘাটে দাঁডাতো টুনি। খেজুব গাছেব গোল-গোল গুঁড়ি পাতা,
ধাপে-ধাপে সিঁড়ি, জামকল আব হিজলের ছায়ায় আচ্ছন্ন। তাকিয়ে
থাকতে-থাকতে তার নিবিষ্টতা চমকে দিয়ে একটি ঢেউ উঠতো জলে। টুপ
ক'রে একটি ছোট্টো ঢিল ডুব দিতো তাব তলায়, তারপর সব অন্ধকার।

ছুটি উত্তপ্ত হাতের পাতা থেকে চোখ ছাড়িয়ে নিয়ে সে ঘুবে দাঁডাতো।
বুকের ভেতবটা এতো ধকধক কবতো যেন শাড়িব উপর থেকেও তাব
ওঠাপড়া চোখে প'ড়ে যাবে।

‘কে?’

কে আবাব। রোদ্দুরে ঝলমানো অপরূপ স্নন্দব একখানা হাসিমুখ।
চোখের ভাবি-হ'য়ে-আসা পাতাছুটি না-তুলেই তো সে-কথা টুনি বুঝতে
পেরেছে। দেখতে পেয়েছে তাব ঘামে ভেজা শার্ট, খোলা-বোতাম উন্মুক্ত
বুকের তকণ লাগণ্য।

নির্মল কমাল বেব ক'রে হাওয়া খেতে-খেতে বলেছে, ‘জল। শিগগিব
একগ্লাশ ঠাণ্ডা জল দাও।’

‘ঈশ। এই বোদ্দুবে’ টুনি ছুটে গিয়ে মস্ত একগ্লাশ ঠাণ্ডা জল নিয়ে

এসেছে ; নিয়ে এসেছে ময়লা ছেঁড়া উত্তনে হাওয়া দেবার ঝুলি-মলিন তালপাখা। কিন্তু তার দরকার কী ? ঝিরিঝিরি হাওয়া দিয়েছে জামরুল পাতা থেকে, হাওয়ার ঝাপটা ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গেছে পুকুর-পাড়ের সব আবর্জনা, জল তিরতির ক'রে কেঁপেছে শিহরিত আবেগে, তারপব মুখের দিকে ভালো ক'বে তাকাতে-না-তাকতেই শেষ, পলক ফেলতে-না-ফেলতেই বিদায়।

‘এবার ঘাই ?’

‘এখুনি ?’

কবজির ঘড়িতে চোখ রেখেছে নির্মল।— ‘ঈশ্বরের উপর ছুটো পাখা দিয়ে দিলে ভগবানের এমন কী ক্ষতি ছিলো বলো তো ?’

‘তার চেয়ে খাবার ছুটিটা আর-একটু বেশি ক'রে নিলে ভালো হয় না ?’

‘তার চেয়ে চাকরি না-ক'রে মাইনে পেলে আরো ভালো হয় না ?’

‘ঠাট্টা কী ? কী তাত রোদ্দুরের ! এর মধ্যে যাওয়া যায় ?’

জলন্ত পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে টুনির নিজের শরীর গরম হ'য়ে উঠতো, নিজেকে সে কল্পনা করতো ছায়াহীন খেতেব উপর দিয়ে, মাথাব উপর মধ্যাহ্নসূর্যের আগুনের তলায় সাইকেল চালাচ্ছে, প্রায় কান্না পেয়ে যেতো।— ‘এই রোদে আর তুমি এসো না।’

‘তাই তো ভাবছি।’ নির্মলের চোখে-মুখে বিজ্ঞতার ঘন রেখা।

‘কী ভাবছো ?’

‘কথাটা ব'লেই ফেলি কাকিমাকে।’

‘কী কথা ?’ উৎসুক চোখে তাকিয়েই বুকে ফেলেছে টুনি, কান গরম হ'য়ে উঠেছে, গাল গরম হ'য়ে উঠেছে, বুকের রক্ত ঘন স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে।

নির্মল হেসেছে তার দিকে তাকিয়ে, ‘কিন্তু তার আগে তো টুনি পাখির মতটা জানা দরকার।’

‘ধেং!’

‘কোয়াটার পেয়েছি, সুন্দর লাল ইটের ছোটো বাড়ি আর সেই বাড়িতে— বলো না?’

দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে টুনি চুপ।

‘বলো না, লক্ষ্মীটি।’

টুনির চোখ মাটিতে স্থির।

‘বলো।’ নির্মলের গাঢ় গলা যেন ছুপূরের রোদকেও নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। প্রজাপতির রঙিন পাখার মতো থরথর করেছে মুহূর্তগুলো। থরথর করেছে টুনি। টুনির দিন আর রাত ভরে উঠেছে সেইসব থরোথরো মুহূর্তের সোনায়ে আলোয়।

সে-সব দিন কি ভোলবার? ভোলা যায়? কালের প্রলেপ শুধু পলস্তারাই ফেলতে পারে, উচ্ছেদ করবে এমন শক্তি তার কোথায়? আর কাকে উচ্ছেদ করবে? যার কথা ভেবে আজও মায়ের চরম চুড়ায় পৌছেও সে ছাব্বিশ বছরের কৌমার্য তাকে?

নির্মলের পর এই সুদীর্ঘ আট-দশ বছরের ব্যবধানে কি এমন কোনো মাহুষের সান্নিধ্যে সে আসে নি যাকে তার ভালো লেগেছে, যাকে দেখলে আলো ফুটেছে চোখে, যার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কখনো কোনো চকিত মুহূর্তে বুকও কেঁপে উঠেছে জোরে? হুমজুর কথাই তো মনে করতে পারে। অনেক দূর হেঁটেছিলো সে, মানসী তাকে অনেক দূর নিয়ে এসেছিলো আমন্ত্রণ জানিয়ে, তারপর হঠাৎ কবে কোন রাজে ঠিক

এমনি ক'রেই টুনি এসে দাঁড়ালো তাব সব মাধুরী নিয়ে, সব দুঃখ বেদনা, সুখ আব আনন্দ নিয়ে। মানসী ছুইচোখ ভ'বে তাকে দেখলো, দেখলো ~~ভাণ~~ ইলটলে বিন্দু-বিন্দু অশ্রুব শিশির, তাবপব হৃৎপিণ্ডটা যেন থেমে গেলো কখন। হৃদযেব দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে উপলব্ধি কবলো, টুনির কাছে আজকেব এই মানসী মৃত, জড়, অচেতন পদার্থ। টুনি তাকে এমন সর্বস্বান্ত ক'বে নেখেছে যে আজও সেই ক্ষতি মানসী সামলে উঠতে পাবে নি। স্মরণ সব গুনলো চুপ ক'বে, তাবপব চ'লে গেলো নিঃশব্দে।

মন-থাবাপ হ'য়ে গিয়েছিলো বৈকি। খুব থাবাপ লেগেছিলো। কিন্তু তাই ব'লে ঠকাতে তো পাবে না।

অভাব। অভাব। অভাব। মলিন মুখে মা হাত পেতেই আছেন। তাঁব ঐ এক ভঙ্গি, ঐ এক স্বর, অভাবের বিলাপ ছাড়া আর-কোনো কথা নেই তাঁব মুখে। কোনো আবেদন নেই। আজ তাঁর চাল নেই, কাল তাঁর ডাল। পরশু কাপড় নেই, তাব পবেব দিন প্রিয়নাথবাবুর একটি ওবুধ না-আনলেই নর, কৃত যে তালিকা—অন্ত আছে কোনো? পাঁচটা টাকা দিতে পারো? দুশটা দিতে পাবো? পনেবোটা দিতে পারো? চাহিদা না-হ'লে আজকে, ক'রে অমুক পাওনা দাব আসবে, তাকে যে না-দিলেই নয়, না জাব। তমুক করবে! তাব জগুও কটা টাকা চাই—এই ক'রে-ক'রে মাথায্যাকে মা যেন একেবারে টেনে নামিয়ে দিলেন, সামান্য কয়েকটা মাস ~~ক'বে~~ ক'বে আই. এ. টা পর্যন্ত পাশ কবতে দিলেন না। অত বড়ো সংসাবের অত চাহিদা যাব মাথায্য দিনবাত কবাত চালাচ্ছে তাঁর কি আব চাকুরে না-হ'লে চলে। দেখতে-দেখতে বাইশ বছরেব যুবক বেয়াল্লিশ বছরেব প্রৌঢ়েব দায়িত্বে উদ্ভাস্ত হ'য়ে উঠলো। তব শাস্তি নেই।

প্রিয়নাথবাবু অস্থির হ'য়ে বললেন, 'না, না, আর না। আর ওর কাছে কিছু বোলো না।' অবশ্য, পশু, দুঃখী প্রিয়নাথের স্ত্রী গলা ননীবালায় গর্জনে থেমে গেলো, 'তাহ'লে আর কী! হাতে গিয়ে নিজেকে বিজ্রি বানি।

বাবাব মুখে অশেষ যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে মুহূর্তে, ঝালপাতার পাখাটা হাতে নিয়ে হাওয়া করেছেন জোবে-জোবে, অসহায়ের সহায় ভগবান নামক অত্যন্ত জরুবি একটি কল্পনাকে ঘন-ঘন স্বয়ং করেছেন মনে-মনে, তাবপর নিঃসাড়ে চোখ বুজে প'ড়ে থেকেছেন মরার মতো। টুনি এসে আস্তে-আস্তে হাত বেখেছে কপালে, বাপ আর মেঘের দুই জোড়া ব্যথিত চোখ মিলিত হ'য়ে যেন হালকা হ'য়ে গেছে সব দুঃখ। আচমকা টুনি ব'লে উঠেছে, 'বাবা, তোমাব ডান পা-টা তো কই এখন আর বেশি সরু দেখাচ্ছে না।'

'আ্যা,' যেন স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে উঠেছেন প্রিয়নাথবাবু, 'ঠিক বলছিস?'

'হ্যাঁ বাবা! আমাব ক'দিন ধ'বেই মনে হচ্ছিলো, আজ পষ্ট বুঝতে পারছি।'

'তা হবে।' গলায় যেন সাগরের ঢেউ, 'কলকাতা থেকে এবার নিঃশেষ-মালিশটা এনেছে, তার দাম তো বড়ো সোজা নয়।'

'আমাব মনে হয় কী জানো?'

'কী রে?'

'আমাবা যদি একবাব কলকাতা যেতে পারতাম, যদি একজন বড়ে ডাক্তার দেখাতে পারতাম--' টুনির গলা ভেঙে এসেছে, বুকের ভেতরট একেবারে ব্যথা ক'রে উঠেছে, বাবার আরো-সরু-হ'য়ে-আসা পা-টার দিকে তাকিয়ে নিচু হ'য়ে সেই পায়ে সে মাথা বেখেছে, বাপকে সাঙ্ঘন দিতে গিয়ে অজস্র কান্নার আবেগে নিজেকে ভেঙে পড়েছে আকুল হ'য়ে

শেষে প্রিয়নাথকেই মেয়েকে শাস্ত করতে হয়েছে হাসিব আডালে কান্না লুকিয়ে ।

—
কেন ? কেন অত শাস্তি পেয়ে গেলেন তাব বাবা ? রাধানগর হাই স্কুলের অতি শাস্ত, অতি সজ্জন, অতিশয় ভালোমানুষ প্রিয়নাথ মাফাব ? কী পাপ কবেছিলেন তিনি ? কী অপরাধে ঈশ্বর তাঁকে এতো বড়ো সাজা দিলেন ? আজকেও মানসী তার কোনো ব্যাখ্যা পেলো না মনে-মনে ।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো সে । অসময়ে স্নান ক'বে চুলগুলো ভেজা, কমেন ভার লাগছে শরীবটা । রেকর্ডিং আছে এক সপ্তাহ পরে, কনট্রাক্ট কবেছে বস্ত্রের বিশিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, শিগগির যেতে হবে সেখানে, তার জন্তেও অন্তত সাবধান থাকা উচিত ছিলো । স্নান করাটা ঠিক হয় নি । মাথা ধ'বে উঠেছে । গলা ভেঙে গেলেই তো সব গেলে । উঠে নীল আলোটা জ্বলে টেবিলের দেওয়াল থেকে একটা অ্যানাসিন বের ক'বে কুঁজো থেকে জল গডিয়ে খেয়ে নিলো । মাথার উপর ঘূর্ণমান পাখার স্পীডটাও কমিয়ে দিলো এক মোচড়ে ।

আজকে নির্মলকে ভাবতে গিয়ে প্রিয়নাথবাবুকেই বেশি ক'রে মনে পড়লো তার । ঘুম এলো না, কান্না এলো । জানালার কাছে উঠে এসে আধভেজা চুলে বিলি কাটতে-কাটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাববে , মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায় ?

থাকলে তো আজও তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন । এই বাড়ি তাঁব পায়ে ধুলোতে পুণ্যস্থান হ'তো, এই সব ঘরে তিনি হেঁটে বেড়াতেন । মানসী তাঁকে হাটবাব উপযুক্ত চিকিৎসাই কবাতো পারতো এখন । মা হাটলেন না ? এই তো কয়েক বছর আগের কথা । অনভ্যস্ত পায়ে জুতো

প'বে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গোড়ালির হাড় ভেঙে গেলো। কী এসে গেলো তাতে ? এলো সার্জন, এলো বাণেজ, ওষুধ এলো কত রকমের, ব্যবস্থা হ'লো কত-কিছু, তিন মাস মাসাজ ক'বা হ'লো লোক দিয়ে দ্বিমি ৩৮। এখন কি তার চিরুণ আছে ? সেই পায়ে আবার জুতো প'নে কত তিনি ঘুরে বেড়ান, কত তার শখ, কত আনন্দ। তখনও মানসী'র তার বাবাব কথা মনে হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো গ্রামের সবকারি হাসপাতালের বুড়ো দয়াল ডাক্তারের চিকিৎসায় প্রিয়নাথের পা জোড়া না-লাগলেও ইওবোপ-ফেবত। বত্রিশ টাকা ভিজিটেব এই ডাক্তার সেহানবিশের চিকিৎসায় থাকলে নিশ্চয়ই লাগতো। তখন নির্মলও বলেছিলো, 'চাকরিটা পাকা হ'লেই মাস্টারমশাইকে আমি কলকাতার ডাক্তার এনে দেখাবো। আব তাব জন্তু টাকাও জমাবো আমি।'

কিন্তু সে আশা আব তাব পূরণ হ'তে পারলো না। কী আশাই বা পূরণ হ'লো তাব। মানসী ঠোটেব কোণে হাসলো।

তারপ'ব চকিত হ'য়ে ও-ঘব থেকে মিসেস দত্তমল্লিকের নিটোল ঘুমের ঘন নিশ্বাসের উত্থান-পতন শুনলো। শুনতে-শুনতে তাব নিজের দীর্ঘশ্বাস ভাসলো বাতাসে। আব নির্মলের মাকেও মনে প'ড়ে গেলো হঠাৎ। ছোটোখাটো এইটুকু মানুষটি, ভালোবাসায় ভরা মন। ছেলের চেয়ে তাঁব গবজই শেষে বেশি হ'য়ে উঠেছিলো। 'ও ননীবালা,' পূজোর মধ্যে এক-দিন ডুবে শাড়ি হাতে ক'বে এলেন তিনি, 'আর তে বাপু খালি ঘবে আমাব মন টেকে না। এবাব দিয়ে দাও মেয়েটাকে।'

মা হাসলেন, 'আমাব কি অনিচ্ছা দিদি ? আপনাব ঘরে যাবে, আমাব মেয়ের কত ভাগ্য, কিন্তু ভাবছি কী, এমন শুধু হাতে-পায়ে কেমন ক'রে ওকে বিদায় দেবো। ডাক্তার বলছে শীতটা পেরুলেই আপনাব দেওর আবার ঠিক আগের মতো উঠতে-হাঁটতে পারবেন, আর ওঠা-হাঁটা

মানাই ইস্কুলে যোগ দেওয়া। ইস্কুলে গেলেই টাকাকড়িও তো একটা হুরাহা হবে।’

‘তা ঠিকই।’ ভালোমানুষ সবোজিনী একেবারে গ’লে গেছেন, ‘তা টাকাকড়িও জগু তুমি ভাবছোই বা কেন ? আমি কি কিছু চেয়েছি ?’

আপনি ‘দবী,’ মা তাঁর মন-গলাইনো কথায় চিড়ে ভিজিয়েছেন, ‘আপনি যে কিছু নেবেন না, চাইবেন না, তা তো আমি জানি। কিন্তু দিদি—’ একেবারে হাত চেপে ধরেছেন, ‘আমার তো সাধ আছে একটা।’

তা আছে বৈকি ? নির্মল চাকবিত্তে পাকা হ’য়ে তো সেটা ভালো ক’বেই মিটেছে তাঁর। তাঁর সংসার উজ্জল হ’য়ে উঠছে আন্তে-আন্তে, এতোদিনের জমাট ঘন অন্ধকার ঠেলে তিনি আলোর বেথা দেখতে পেয়েছেন। এব মধ্য গলাব হাব ছড়া ছাড়িয়ে এনেছেন মহাজনের কাছ থেকে, শাখার পাশে চ্যাপটা দু-গাছা তামাব পাতের চুড়িও গড়িয়ে নিয়েছেন। আর একখানা খষবি পাড তাঁতেব শাড়ি।

সেই শাড়িখানা প’বেই তিনি নির্মলের মৃত মাকে দেখতে গিয়েছিলেন, নতুন শাড়ি খসখসে ঝাঁচলে চোখ মুছেছিলেন, তাবপর বাড়ি এসে কেচে শুকিয়ে মাড দিয়ে তুলে বেখেছিলেন গাজ ক’বে।

আর টুনি ?

টুনিও গিয়েছিলো বৈকি। সবোজিনীও ঠাণ্ডা শাদা বৃকে প’ড়ে থাকতে দেখেছিলো নির্মলকে, দেখেছিলো নিঃসঙ্গ নিঃস্ব-হ’য়ে-যা ওয়া একটি মানুষেব কাঙাল কান্না, দেখেছিলো মৃত্যু মহিমা। সুন্দর লেগেছিলো, স্বর্গেব মতো লেগেছিলো, কেউ না-বলতেই সে চন্দন ঘ’য়ে নিজ-নিজে সাজিয়ে দিয়েছিলো সবোজিনীকে, ঝাঁচলে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়েছিলো, মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিয়েছিলো। গ্রামেব কর্তারা, গিন্নিবা বলাবলি কবেছিলেন তাই নিয়ে, হাসি-মস্করা করেছিলেন, ছোকবারা টিটকিরি

দিয়েছিলো, অসভ্য বেহায়া নির্লজ্জ—কত-কিছু বিশেষণই যে উপহার পেয়েছিলো সেদিন তাব আর অন্ত নেই। বাড়ি ফিরে ননীবালাই কি কম নির্ধাতন করলেন? কেবল প্রিয়নাথবাবু তার পিঠে হাত্তগ্গোধে ব'সে ছিলেন চুপচাপ। তাঁব বিষগ্ন গম্ভীর বেদনা-সজল মুখের দিকে তাকিয়ে টুনির সব দুঃখ গ'লে জল হ'য়ে গিয়েছিলো, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো সে।

কেন কেঁদেছিলো? সরোজিনীর মৃত্যুতে তার কী? তবে কি সে তাঁকে ভালোবেসেছিলো? না কি তিনি নির্মলের মা ব'লে? না কি নির্মলের কান্না আর তার কান্না অভিন্ন ছিলো না?

ননীবালা তাতেও রাগ করেছিলেন। আদিখ্যেতা ভালো লাগে নি তার। বলেছিলেন, 'কী ঢং! তব তো এখনো যাস নি ওখানে। গেলে তো বুঝি আর নিজের মাকেই চিনবি না।'

তাই তো ননীবালা আগে থেকেই সাবধান হয়েছিলেন। মেয়েকে নিজের অধীনে রেখে হাতে বাখছিলেন নির্মলকে, 'সবুর করুক না একটা বছর। এই তো মা মরলো, এখুনি বিয়ে কী?'

প্রিয়নাথবাবু রাগ করেছিলেন, 'তুমি বলছো কী? আরো দেরি করতে চাচ্ছে?'

'তোমরা কি হিন্দু না খৃস্টান? মেয়ের না-হয় পাখনা গজিয়েছে, পা বাড়িয়েই আছে যাবার জন্ত, সঙ্গে-সঙ্গে তোমারও কি ভীমরজ্জি ধরলে নাকি?'

'কী আশ্চর্য!' প্রিয়নাথবাবুর গলায় রাগ ফুটেছে, 'ভদ্রমহিলার কত শখ ছিলো বউ নিয়ে ঘর করবার, তা তো দিলেই না, আর এখন ওব এই শূণ্য ঘরেও তুমি ওকে একা-একা থাকতে দেবে নাকি? থাকতে পারে? মা ছাড়া ওর আর-কেউ আছে নাকি দেখবার শোনবার?'

'ও-সব গ্লেচ্ছ কাণ্ড আমি করতে পারবো না,' রাগে গজগজ করেন

ননীবালা, ‘কেন, অসুবিধেটা কী, শুনি ? বাড়িতে তো আর থাকে না। থাকে তো কাজের জায়গাতেই। কেবল বাস্তিরটুকুই যা বাড়ির সঙ্গে সবন্ধ। তা বোজ-বোজ আসবার দরকারটাই বা কী ? খাওয়া দাওয়াব তো আর অসুবিধে নেই সেখানে।’

প্রিয়নাথবাবু তবু বলেছেন, ‘তোমার যে কী ইচ্ছে তা আমি সত্যি বুঝিনে। মাইনে বেড়েছে, কোয়ার্টার পেয়েছে, বিয়ে ক’বে এখন বউ না-নিষে গেলে চলে ?’

ননীবালাব চোখের দৃষ্টি জলে উঠেছে এবাব। এক ধমকে তিনি চুপ কবিষে দিযেছেন স্বামীকে, ‘যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না তো। পারদেনা গুলো শোধ হ’লো না, দুটো পয়সা জমলো না হাতে, এখুনি বিয়ে। হবে বাপু. ও কি তোমার ছেলে যে বিয়ে পবেও তোমার এখানে তোমাব দায় নিয়েই প’ড়ে থাকবে? সে দাবিত্ত কি ওর আছে যে চিবদিন বসিষে খাওয়াবে তোমাকে ? সে-কপালটুকুও সঙ্গে আনো নি তুমি। ও হ’লো মেয়ে। বিয়ে দিলেই পব। তখন এই পেটের মেয়েই আলাদা ভাতে শত্রু হ’যে দাঁড়াবে।’

এই কথা।

স্বদ্ধ হ’যে গেছেন প্রিয়নাথবাবু। স্ত্রীব সঙ্গে বোধহয় আব কথা বলতে ইচ্ছে কবে নি তাঁব। একেবাবে চুপ হ’যে গেছেন, ঝবঝব ক’রে ঘাম নেমেছে সাবা গাযে। তিনি পঙ্কু, উপার্জনহীন, উপাযহীন। কী বলবেন তিনি ? কে শুনবে তাঁর কথা ? জোব ক’বে কিছু কবার মতো মনবে শক্তি তাঁব দেহের শক্তিব সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

একদিন নির্গল বললো, ‘টুনি শোনো।’

‘কী ?’

‘তোমাকে একটা গ্রামোফোন কিনে দেবো আমি।’

‘গ্রামোফোন ।’

‘হ্যাঁ। অনেক বেকড থাকবে, তাই থেকে তুমি গানগুলো তুলে নেবে।’

‘না, না ।’

‘না না কী । একে ওকে খোশামোদ কবাব চাইতে মের ভালো।’

‘না, গ্রামোফোন তোমাকে কিনতে হবে না।’

‘তোমাকে আর সর্দারি কবতে হবে না।’

‘আমি শিখবো না গান।’

‘তা তো ঠিকই। কেবল বাসন মাজবে, না।’

‘মন্দ কী ?’

‘না মন্দ আব কী। “পবের কাবণে স্বার্থ দিবা বলি”—’ বড়ো-বড়ো কালো চোখে নির্মল হেসেছে।

টুনি ভ্রুকুটি করেছে, ‘পব আবার কে । বাবা ? মা । তুমি ?’

‘নিজে ছাড়া সব পর। প্রথমে তুমি নিজে, তাবপব তোমার গান, তাবপর বাবা-মা। অবিশি—’ চোখ ভাসিয়ে মাথা নেড়েছে এখানে, ‘সব চেয়ে আগে আমি, এই নির্মল নামক ভাগ্যবান যুবকটি।’

‘কেন ?’

‘বা বে, আমিই তো তোমার আত্মা, মন, প্রাণ সব।’

লাল হ’য়ে উঠেছে টুনি, ‘কী অসভ্য।’ যাবার জন্ত সে পা বাড়িয়েছে।

‘শোনো, শোনো।’ তৎক্ষণাৎ আঁচল টেনে ধরেছে নির্মল।

‘কী ?’

‘কাকিমা তো কিছুতেই ওস্তাদ বাগতে দেবেন না।’

‘তোমার সত্যি মাথা-পাবাপ হয়েছে।’

‘তা তো হয়েছে। টুনি, আমি আব পাবছি না একা থাকতে।’

টুনিই কি পারছে ? কিন্তু কী কববে সে / তাব চোখে জল এসে-
গছে, জবাব দেয় নি, শুধু দাঁড়িয়ে থেকেছে চুপচাপ ।

‘মা যে নেই এ-কথাটা একদণ্ডের জগুও ভুলতে পারছি না আমি ।’

টুনি চুপ ।

‘তুমি এলে আমি সব ভুলে যেতুম । জানো, রাত্তিবে ঐ একা বাড়িটায়
আমাব ছু চোখ আর বন্ধ হ’তে চায় না । কী যে আজীবাজে মনে হয় ।
ভয় কবে, আর বুঝি আমি তোমাকে পেলাম না ।’

‘চুপ করো ।’ অস্থির হ’য়ে উঠেছে টুনি ।

নির্মল চুপ করেছে । তাকিয়ে থেকেছে দূবের দিকে ।

‘কিন্তু গ্রামোফোন তুমি এনো না ।’ টুনি অন্তমনস্ক করেছে চোখে চোখ
বঁধে ।

নির্মল বলেছে, ‘কেন ?’

‘কেন মানে ? একটা গ্রামোফোন কেনা বুঝি সহজ ? কেন কিনবে ?
টাকা কই ?’

‘মা রেখে গেছেন ।’

‘মা ?’

‘তাঁর ক্যাশ-বাক্সে ছিলো ।’

‘থাকুক ।’ টুনি একেবারে পাকা গিল্লি, ‘টাকা কি ফেলে দেবার ?’

‘মোটাই না ।’

‘তবে ?’

‘তাই জ্ঞতেই তো একেবারে তোমাব গলায় গান ক’বে ধ’বে রাখতে
চাই । চিরজীবন থাকবে ।’

‘আমি কি চিরজীবন গানই গাইবো ?’

‘যার যা কাজ ।’

‘আর বুঝি কাজ নেই?’

‘আমার ছোট্টো পাখি, বনের পাখি, টুনি পক্ষীর আর আবার কী কাজ?’ টুনির লম্বা চুলের একটা গোছা টেনে এনে হাতে জড়িয়েছে সে। ‘তুমি কি ভেবেছো আমার কাছে গিয়েও রাখবে? মসলা করবে আর বাসন মাজবে? আমি এখন থেকেই একটা মেয়েকে ঠিক ক’রে রেখেছি, সব ক’রে দেবে সে।’

টুনি চোখ তুলে তাকিয়ে থেকেছে, কথা বলে নি।

তারপর সত্যি নির্মল একটা গ্রামোফোন কিনে এনে হাজির করলে। একদিন। আঠারোখানা রেকর্ড স্বদ্ধ। আর মা সঙ্গে-সঙ্গে জ’লে উঠলেন তেলে-বেগুনে। যতক্ষণ নির্মল রইলো গুম হ’য়ে রইলেন, আর সে যেতেই ফেটে পড়লেন বোমার মতো, ‘এ-সব কী? যা খুশি তা করনেই হ’লো?’

প্রিয়নাথবাবু বললেন, ‘এর আবার একটা যা-খুশি তা কী? ভালোই তো করেছে। কী সুন্দর গানগুলো। আর গান মাত্রের স্বথে-দুঃথে!’

‘টাকা কি গঙ্গার জলে ভেসে আসে যে খোলামকুচির মতো খরচ করলেও ফুরাবে না?’

‘কী আশ্চর্য!’ প্রিয়নাথবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বীর কথার জবাব না-দিয়ে পারেন না, ‘ওর টাকায় ও যা-খুশি তাই করবে, তোমার কী?’

‘আমার কী মানে? এই সংসারের পিণ্ডি তৈরি হবে কোথা থেকে? একটা মড়া-পোড়া গ্রামোফোন, কতকগুলো ইস্কুরূপ বন্টুর স্তূপ, কার শ্রাদ্ধে লাগবে শুনি? কী হবে ওই আপদ দিয়ে?’

‘সে তুমি বুঝবে না। বোঝবার মতো মন ভগবান দেন নি তোমাকে।’

‘তা তো দেনই নি। যত দিয়েছেন তোমাকে আর তোমার মেয়েকে।’

সাধে কি বলি, মেয়ে মেয়েই। মেয়েব মতো শত্রু পৃথিবীতে আব কেউ না।
ওই হাঁদাকান্ত মেয়ে যদি একটু বুঝেই হবে, বাপ-মায়েব দরদই বুঝবে
তা'লে কি এভাবে জলে যেতে দেয় টাকাগুলো ? ও কী না পারে ইচ্ছে
কবলে ? নির্মল ওব কোন কথা না-শোনে ? সংসাবেব জন্ম মায়া থাকলে
টাকাগুলো ও বাঁচাতে পাবতো না ?’

সাবাটা দিন মা একেবারে মাথা ফাটালেন। টুনি নিঃশব্দে কাজ
কবতে-কবতে সব শুনলো, সেই রাত্রে ঘুমতে পারলো না সে। আর তার
জ্বব মিটতে-না-মিটতেই এলো এক হারমনিয়ম। ডবল রীডের মস্ত
বাজনা। নির্মলের খুশি শেষ নেই, এটা দেখায়, সেটা দেখায়— টুনি কী
কববে। টুনির বারণ শুনতে তার ব'য়ে গেছে।

দাও। দাও। আরো দাও। এর পব মা যেন মরীয়া হ'য়ে উঠলেন।
য ছেলে ভপ ক'বে একটা গ্রামোফোন কিনে আনতে পারে, চক্ষের
পলকে অত বড়ো একটা হাবমনিয়ম এনে হাজির করতে পাবে, তার
হাতে যে বেশ ভালোবকম কিছু জুটেছে, শুধুমাত্র মাইনেটাই যে তার
দখল নয়, এটা অন্তহীন ক'বে তাঁব আব লুক্কতার সীমা বইলো না। এবাব
প্রিয়নাথবাব শুষে-শুষেই বাগাবাগি করলেন, ‘তুমি ভেবেছো কী ? যা
তোমাব খুশি কবলেই হ'লো ?’

তাচ্ছিল্যভরে ননীবালা জবাব দিলেন, ‘খুশিমতোই তো সারাজীবন
সব পেলাম কিনা।’

‘কী তুমি পাও নি ? দিনবাত তোমাব এতো কিসের আক্ষেপ ?
আমি কি কোনো শখ মেটাই নি তোমাব ? কোনোদিন কিছু উপার্জন
করি নি ?’

‘সে-সব ব'লে লাভ কী।’

‘লাভ এই যে নিজের অতীত ভেবে, ওদেব কথা তুমি ভাবো। নিজেকে

‘এতো ছোটো কোরো না, এতো হীন হোষো না। ওদের স্থখী হ’তে দাও, স্বাধীন হ’তে দাও। তুমি মা, সম্ভানকে স্থখী করাব দায়িত্ব আছে তোমার। এ-রকম আটকে বাঁধাব কোনো অধিকার নেই।’

ননীবালা ফিবে তাকালেন। প্রিয়নাথবাবু আধখানা উঠে ব’সে যেন ছটফট কবতে লাগলেন, ‘না, না, এ হ’তে পাবে না। এ অন্ডায়। ছোটোছুটি কবতে-কবতে ছেলেটা রোগা হ’যে গেছে। এ-সব কী ধরনেব স্বার্থপবতা? কেবল নিজেব স্ববিধেটুকুই সব। ছি। বিযে আমি দেবো, আমি নিজে বিযে দেবো, এ-মাসেই দেবো।’

এবার ননীবালা ছোটো একটি মন্তব্য ছাডলেন, ‘অসারেব তর্জনগর্জন মার।’

জলতে-জলতে যেন দপ ক’বে নিবে গেলো সব আগুন।

টুনি সেদিন মুখ খুলেছিলো মা-ব উপব। ভাবি বুকো, ভাবি নিশ্বাসে, জলভরা চোখে মা র দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, ‘বাবাকে তুমি ও-বকম বললে? বলতে পাবলে?’

‘খুব লেগেছে, না?’

‘তোমাব লাগে না কেন?’ টুনিব ব্যথিত স্বব চলছে হ’যে উঠলো, ‘তুমি বডো নিষ্ঠুর। বাবাব কষ্ট তুমি বোঝো না।’

‘তা তো ঠিকই।’ হিংস্র আবেগে ঝংকাব দিযে উঠলেন ননীবালা, ‘তুমি খুব বোঝো, আর সেই বোঝার ঠেলায কখন এ-বাডির দরজা ডিঙোবে তাই জন্তো পা বাডিয়ে আছে।’

মূর্খ, মূঢ়, ভীক টুনি। একটা কথা কি আব বলতে পারলো তারপর? কেন পাবলো না? কেন সে হ’তে দিলো এই অন্ডায়, একটা মাহুষের ওপর এই অবিচাব? কেন সে ঝাপিয়ে প’ডে বাধা দিলো না মা-র সেই অন্ডায়ে?

মানসী জানালা ছেড়ে দ্রুত পায়ে মা-র ঘর আর তার ঘরের মাঝের দরজাটায় এসে দাঁড়ালো থমকে । কী জানি কেন । তারপর আবার ফিরে এলো জানালায় । রক্ত গরম হ'য়ে উঠেছে, হাত-পা জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে কান আর মাথা । বাথকমে এসে ভেজা মাথায় আবার জলের ঝাপটা দিলো জোবে-জোবে, হাত-মুখ' আব গল। সব ভিজে গেলো, ব্লাউজটাও ভিজলো পিঠের কাছে ।

এই তো এমন দিনেই সে চ'লে গেলো তাবপর । টুনিব দু-চোখে আধাব নামিয়ে, বুকেব পাঁজব থসিয়ে ।

আব তাবপন, আজ ।

আজ ?

আজ কী ? সত্যিই সে ? নিমল ? নির্মলকেই দেখেছে ? না কি মনেব ভুল ? যদি নির্মলই হয় তবে সে নামলো না কেন ? না কি চিনতে পাবে নি মানসীকে ? খুঁজে পায় নি টুনিকে ? কেমন ক'বে পাবে ? টুনি কই ? টুনির অস্তিত্ব আব কোথায় আছে এই পৃথিবীতে ? টুনি ক'য়ে গেছে, মুছে গেছে । দুঃখেব পাথারে ভাসতে-ভাসতে কোথায় তলিয়ে গেছে টুনি ।

ভালো হয়েছিলো । খুব ভালো হয়েছিলো । অত দুঃখেও তখন মনে-মনে বলেছিলো টুনি । মা-ব দু-চোখ ভবা জলের দিকে তাকিয়ে নিজেব দুঃখ সার্থক মনে হয়েছিলো তার । নির্মল, তুমি খুব ভালো করেছিলে চ'লে গিয়ে, তুমি না-গেলে সেই সব দুঃসহ দুঃখভরা দিনের বীভৎস ছবি দেখে কেমন ক'রে মা শিহবিত হতেন ? কেমন ক'রে ভাবতেন যে, যাকে তিনি একবিন্দু শান্তি দেন নি, সে-ই ছিলো তাঁব শান্তিব আধাব ।

পবের বছর ঠিক তেমনি দিনে মাবা গেলেন প্রিযনাথবাবু । মানসীব স্পষ্ট মনে আছে সেই রাতটি । টুনিকে তিনি কাছে ডাকলেন, তাকিয়ে

বইলেন মুখের দিকে, অস্পষ্ট গলায় কী যে বললেন তখন টুনি বোঝে নি, অনেক পরে মনে হয়েছে, নির্মলের নামই করেছিলেন শেষ সময়ে। আশ্বে হাতখানা উঠিয়ে কোলের উপর রাখলেন, টুনির চোখের জলে ধুয়ে গেলো সেই হাত। ননীবালা প'ড়ে আছেন মাটিতে, অনাহারে অনিদ্রায় ধূলি-ধূসবিত ননীবালা। তাব মা। বাবা তাকে ডাকলেন না, যতক্ষণ পাবলেন ছুঁচোখ ভ'বে টুনিকেই দেখলেন, তাবপব এক সময়ে শ্বাস উঠলো তাঁব। চোখের পাতা দুটি বন্ধ ক'বে বুকের ওঠাপডায় অধীব হ'য়ে উঠলেন তিনি। টুনি হাত বুলিয়ে দিলো, মুখে মাথায় জ্বল দিলো, তিনি ঠোঁট নাডলেন বাবে-বাবে।

সন্ধ্যা থেকে টিপটিপ বৃষ্টি, বাত ঘন হ'তে হ'তে মুষলধারে ঝবতে লাগলো, ঘবে জল পডতে লাগলো টুনিদের ফুটো চালেব কোণ চুঁইয়ে, দাকণ ঝড়ের বেগে মনে হ'লো বেড়াগুলো বুঝি এখুনি উড়ে যাবে। প্রিয়নাথবাবু তাবই মধ্যে শ্বাস টানছেন আর টুনি ব'সে-ব'সে দেখছে তিল-তিল ক'বে একটা জীবনের অবসান।

শোক নয়, তাপ নয়, ভয় ডব কিছই না, অদ্ভুত একটা বোবা ব্যথা আঁব মৃত্যুব মুখোমুখি ব'সে ছবস্ত একটা কৌতূহল। কিসের কৌতূহল তা সে জানে না, তবু তাকিয়ে আছে একাগ্র হ'য়ে, কেমন ক'রে কোথা দিয়ে কে এসে এই এতোদিনকাব মানুষটিব প্রাণ ছিনিয়ে 'নেয তা দেখবার জন্ত।

তাবপব বক্তজবা কাপড প'বে, পাথবেব মতো শক্ত নিষ্ঠুর বুকেব উপর বলিষ্ঠ দুইহাত জডো ক'বে, সূর্যেব মতো ঝলসানো এক মেঘেব মৃতি এসে দাঁডালো সামনে। তার অমানুষিক আকৃতির দিকে তাকিয়ে টুনি সভয়ে ব'লে উঠলো, 'কে ? কে আপনি ? কেন এসেছেন ? কাকে চান ?'

মুহূ হাশ্বে সে বললো, ‘তোমার বাবার এইমাত্র আয়ু শেষ হ’লো’
তাকে তাই এখন বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি আমি ।’

টুনি বললো, ‘ও, তাহ’লে আপনিই দেবতা যম ? কিন্তু আপনি কেন
এই ঝড়ে জলে কষ্ট ক’রে এলেন, আপনার দূতেরাই তো আসতে
পারতো ।’

এ-কথায় যম খুশি হ’য়ে সহাশ্বে বললো, ‘তোমার বাবা যে পরম
ধার্মিক, সেজন্তে আমি নিজেই এলাম ।’ এই বলামাত্রই বেঁচে থাকার
সমস্ত চেষ্টা থেকে মুহূর্তে বিরত হলেন প্রিয়নাথবাবু । আর তিনি শ্বাস
টানলেন না । টুনি দেখলো তাঁর দেহ থেকে তাঁরই বৃড়ো-নথের সমান
একজন মানুষকে টেনে বা’র ক’রে নিয়ে এলেন যম, তারপর কোথায়
মিলিয়ে গেলেন ।

চোপ মুছে ধডমড ক’বে উঠে বসলো টুনি । তন্দ্রা ভেঙে উপলব্ধি
কবলো এতোক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলো ব’সে । আর বাবা ? বাবা কেমন
আছেন ? কী আশ্চর্য ! এতোক্ষণ তাঁর বুকেব উপরই সে ঘুমোচ্ছিলো
মাথা বেখে । ‘বাবা । বাবা গো !’ প্রিয়নাথবাবুর নিশ্বাসহীন মুখের দিকে
তাকিয়ে হাহাকার ক’রে কেঁদে উঠলো সে ।

সকাল হ’তে-হ’তে ঝড় থামলো, বৃষ্টি থামলো, কান্না থামলো, আকাশ
জ্যোতির্ময় হ’য়ে দেখা দিলো ।

আজ প্রায় চার মাস নির্মলের কোনো চিঠি নেই, টাকা নেই, খবর-
বার্তা কিছু নেই । টায়েটুয়ে খেয়ে-না-খেয়ে কোনোরকমে দিন চলছিলো
খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে । এখন একেবারে শূণ্যের অন্ধে ঠেকেছে । মৃতদেহও যে
সংকাব হবে এমন একটি পয়সা পর্যন্ত হাতে নেই তাদের । ননীবালা

চোখের জল মুছে ছুটলেন প্রতিবেশীদের ঘরে, টুনি ব'সে রইলো মড়া ছুঁয়ে। কিন্তু কে আর শুনবে ননীবালার কথা? এতোদিন না ননীবালা বড়ো ধরাকে সরা জ্ঞান করেছেন, এখন আবার আমাদের কিসের দরকার?

গ্রামের লোক শব্দ হ'য়ে উঠেছে স্তব্ধ বুরো। ভাবী জামাই নিয়ে বেলেগ্নাগিরির শোধ তুলবে না এবার? ভেবেছিলো বুঝি এক মাঘেই শীত যাবে, না? বাঘেব সঙ্গে লড়াই ক'বে জঙ্গলে বাস আর কুমিরের সঙ্গে লড়াই ক'বে জলে বাস আব ললিতবাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে রাধানগরে বাস, এ তিনই সমান অসম্ভব।

মুখে চুনকালি মেখে ফিরে এলেন ননীবালা। কেউ এলো না মড়া পোডাতে। কেন আসবে? অপদার্থ একটা! ঠ্যাং ভাঙা স্কলমাস্টার, এক পয়সার যার মরোদ নেই, সে কিনা শুয়ে-শুয়েই কালো বেড়ালের মতো বিলী মেয়েটাকে দেখিয়ে তুক ক'রে ফেললো অমন একটা উপযুক্ত, গ্রামের সেরা ছেলেকে? আব তারা সব গোলাপি মেয়ে নিয়ে রূপোর তোড়া গলায় বেঁধে গলদর্ঘ হ'য়ে গেলেন বিয়ে দিতে? ললিতবাবুব চিরদিনের রোখ এই নির্মল, তাকে পষন্ত হঠ খাইয়ে দিলো ওরা?

বেশ। এখন বন্ধুক তার ফল। মেয়ের বিয়ে না-দিয়েই পায়ের উপর পা তুলে জামাইয়ের রোজগাবে তো দিব্যি চলছিলো। মাসে-মাসে মনি-অর্ডারে সই চলছিলো চমৎকার। গেলো কোথায় সব? তখন তো কই আমাদের কথা মনে ছিলো না, এখন এসেছো কেন? জামাই-ই আসুক। উদ্ধার করুক কাজ।

আন্তে-আন্তে নবম রোদ ছড়িয়ে পড়লো উঠোনে, চালের ফাঁকে, ঘরের মেঝেতে। ভেজা মাটি শুকিয়ে গেলো, ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতল হ'লো তপ্ত ধরণী। চারদিকের গাছপালা স্নিগ্ধ সবুজে মনোহর

হ'য়ে উঠলো। বাবার মৃতদেহ ছেড়ে একবার নাচবে এসে দাঁড়ালো টনি, আবার ঘবে ফিরে গেলো।

ভাঙা তক্তাপোশে লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছেন প্রিয়নাথ, চোখ দুটি বোজা। শান্ত, সমাহিত। এতোদিনেব সব গ্লানি নিঃশেষে মুছে গেছে জীবন থেকে। গলা থেকে পা পর্যন্ত টুনি চাদর চাপা দিয়েছে একটা, মাথাব বালিশটা ঠিক ক'রে দিয়েছে, হাত দুটি টান-টান হ'য়ে প'ড়ে আছে দু পাশে। মগেব দিকে তাকিয়ে আবার চেউয়েব মতো কান্না গডিয়ে এলো টুনিব। হাত রাখলো কপালে। ঠাণ্ডা। হিমেব মতো ঠাণ্ডা। টান-হ'য়ে থাকা একটা হাত নুলে পড়েছিলো খাট থেকে, সেটা তুলে দিতে গিয়ে যেন ছিটকে ন'রে এলো। কী শব্দ! মবলে মানুষ কি এই বকম শব্দ হ'য়ে যায়? না কি এতোক্ষণ প'ড়ে আছে ব'লেই এ বকম হ'য়ে উঠছে।

আর টিকতে পাবলো না টুনি। দৌড়ে বেবিযে এলো, উঠোনে নামলো, উঠোন পেবিযে খোলা চুল হাতে জডাতে-জডাতে প্রতিবেশীদের সকলের দবজায় গিয়ে পা জডিয়ে ধবলো, 'দয়া করন। দয়া করন। বাবাকে আপনাবা সংকাব ক'বে দিন। তাব তো কোনো অপবাধ নেই। তিনি তো কোনোদিন আপনাদেব কোনো ক্ষতি কবেন নি। আমাদেব যে শাস্তি হ'ব দিন, কিন্তু মৃত মানুষটাকে দয়া করন আপনাবা।'

সব মুখ ফিবিযে চুপ।

বেলা দুই প্রহবে যখন সহস্র পিপড়ের দল প্রায় ছেয়ে ফেলেছে প্রিয়নাথকে, নীল মাছিবা যুবে বেড়াচ্ছে ইতস্তত, কোথা থেকে ছুটতে-ছুটতে, ঘামতে-ঘামতে স্ত্রীলা-পিসি এসে হাজির। সর্বঘণ্টে তিনি নাবাষণ। গ্লুদেব গুঁড়ো। সব সময়ে সকলের বিপদেই তিনি আছেন বুক পেতে। অথচ তাঁর কোনো সামাজিক পবিচয় নেই, অতীত ইতিহাস তাব কলঙ্কিত। সাত বছর বয়সেই বিধবা হ'য়ে বাপেব ঘবে বাস করছিলেন।

রূপেব জোলুসে মধুব মোহে প্রজাপন্নির মতো সব ছেলেছোকরার দল ইটপাটকেল ছুঁড়তো তাঁর শোবার ঘরের টিনের চালে, একবার ঘরের বেড়া কেটে কোন মহামাণ্ড্য মাতব্বর নাকি ঢুকেও ছিলেন গভীর রাত্তিরে। ঝোলানো রামদা নিয়ে এমন তাড়া করেছিলেন এই স্থশীলা-পিসি যে তখন আর বাছাধন পালাতে পথ পান না। সেই থেকে আর-কেউ বড়ো এগুতো না কাছে। বুঝেছিলো যে মানুষটির রূপই শুধু জলন্ত নয়, গুণেও সে জ্বালিয়ে ছাড়ে।

হঠাৎ এই মানুষই একদিন হুয়ে পড়লো, দুর্বল হৃদয় নিয়ে ছটকট করলো আপন মনে। বলা নেই, কওয়া নেই কাশি চ'লে গেলো হঠাৎ। ঘবে-ঘরে কমিটি ব'সে গেলো কেচ্ছাব, যত নোংরা কথার ছড়াছড়ি চলতে লাগলো মুখে-মুখে, যত কুশ্রীতাব ঘোঁট। একঘবে হলেন স্থশীলার বাবা, স্থশীলার মা কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেললেন। তাবপর একদিন মাথা মুড়িয়ে গলায় তুলসীর মালা দিয়ে আগুনের মতো স্থশীলা আগুনের মতোই গনগনিয়ে এসে দাঁড়ালো। কোমরে আঁচল জড়িয়ে, চোখে স্বর্ষ হেনে উঠোনে দাঁড়িয়ে একুশ বছরবেদ মেয়ে চিংকার ক'রে ডাকলো, 'আয়, কে আসবি আয়। কোন সতী মায়ের সতী পুত আছিস এ-গাঁয়ে, একবার আয়, আমি দেখে নিই তোদের। উল্লকের ঝাড় সব, শুয়োরের পাল। সব ঘরের খবর আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। কাব বুকের পাটা আছে তাব প্রতিবাদ করবি আয়।'

ব্যস। সব ঠাণ্ডা। সব চূপ।

আপদে-বিপদে, স্থখে-দুঃখে, সন্ততায় মমতায় সকলের কাছেই স্থশীলা-পিসি সমান। তাঁর কাছে ছোটো নেই, বড়ো নেই, ধনী নেই, দুঃখী নেই, যেন দেবতার মতো বরাভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি গ্রামে। বড়ো হ'য়ে গেলেন এই করতে-করতে। গ্রাম থেকে একটু দূরে এক বিয়েবাড়ির

রায়্যাব জন্ত ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে, এইমাত্র ফিরে সব শুনে ছুটে এসেছেন তাড়াতাড়ি।

এসেই তিনি একলা একশো হ'য়ে দাঁড়ালেন বুক পেতে। পুরুষের মতো বলিষ্ঠ হাতে ধরাধরি ক'রে উঠোনে নিয়ে এলেন প্রিয়নাথের মৃতদেহ। চারপাশে কোঁতুহলী জনতাকে এক দাবডায় কাঁপিয়ে দিয়ে মড়া ছুয়ে মেঘ-ছঁড়া। রোদেব আলোয় ভরা উজ্জল নীল আকাশেব দিকে তাকিয়ে বৃকের উপর ছুটি নরম হাত যুক্ত ক'রে উচু গলায় চিংকার কবলেন, 'হে গোবিন্দ ! হে কৃষ্ণ ! হে আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ! আকাশের চন্দ্র সূর্য গ্রহ তাবা, তেত্রিশকোটি দেবতা ! তোমরা সব শাস্ত্রী। আজ যাঁরা এই মড়া সংক্ৰামণ কবলো না, বিপদে এগিয়ে এলো না। এই রকম সময়েও শেয়াল-কুকুরের চেয়ে অধম ব্যবহার করলো, তাদের তোমরা দেখো।' মটমট ক'বে স্থশীলা-পিসি দুই হাতের দশ আঙুল ফোটালেন। তারপর আবার হাত জোড় ক'রে বললেন, 'মরবে, মরবে। সবাই মরবে একদিন। টাকার গবমে আজ যতই চক্ষু গরম করুক সেখানে সবাই সমান। হে মুকুন্দ মুরারী, তখন যেন এর উপযুক্ত শাস্তি হয়।'।

টুনি তাকিয়ে আছে মুগ্ধ চোখে, দেখছে, শুনেছে। মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশেব তলায় যুক্তকর মূদ্রিতচোখ স্থশীলা-পিসিকে মনে হচ্ছে দেবীর মতো, মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতো। যিনি সব আপদে সব বিপদে সকল মানুষের শাস্তি।

আর, আশ্চর্য ! দেখতে-দেখতে পিলপিল ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সব কর্তার দল, এগিয়ে এলো গুটিগুটি। নাকের ডগায় চশমা রেখে ঘোলাটে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো তারা, 'এ-সব কী ব্যাভার তোমার স্থশীলা ? মড়া ছুঁয়ে অপরাহ্ন বেলায় এ-সব শাপমুগ্ধি ? কী ! তুমি ভেবেছো কী ?'

স্থশীলা-পিসি যেন দেখলেনই না তাদের, ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন,

‘ওরে আয়, আয়, টুনি আয়, মা কই তোর ? চল তিনজনে ধরাধরি ক’রে হবিধনি দিয়ে তোদেব পুকুরঘাটে নিয়ে যাই। তুলসীর ঝোপ আছে সেখানে। প্রিয়নাথ নিজেই তো নারায়ণ, নারায়ণেই মিশে থাকুক। আর কাঠকুটো যা লাগে আমি টোনা ডোমকে দিয়ে এখনি জোগাড় করিয়ে আনছি। আব সেইসঙ্গে অনাথঠাকুরকেও নিয়ে আসবো’খন, আবাব তো নিষম-কানুন আছে কিছু। দেখিস, আমি যা ওষামাত্রই যেন শকুনি গৃধিনীগুলো এসে মড়া না ছোঁষ। চালা-কাঠ নিয়ে ব’সে থাক।’

বাবাব মাথাব কাছে নিচু হলেন স্ত্রীলা-পিসি, ‘প্রিয়নাথ, তুমি আমার ভাইয়ের বাদা, গ্রামের অনেকগুলো পশু-পক্ষীৰ মধ্যে একটা মানুষ, চলো, তোমাব শেষ কাজ আজ আমিই উদ্ধাব কবি।’

দুই চোখ ছাপিয়ে জল এলো টুনিব। শোক নয়, তাপ নয়, একটা অপূৰ্ব পবিত্র দুঃখের অন্তৰ্ভূতিতেই যেন গ’লে গেলো সে। জলন্ত তাপে শীতল চন্দনের মতো স্ত্রীলা-পিসিকে সেদিন জড়িয়ে ধ’বে ঠাণ্ডা হয়েছিলো টুনি। ভালোবাসাব আবেগে কাঁপছিলো বকেব ভেতবটা। বাবাব মৃত্যুব অত বড়ো দুঃখটাও সহনীয়, বমণীয় হ’য়ে উঠেছিলো সেই মুহূর্তে।

. . চাব

সব শেষ হ’য়ে গেলো। হাতেব শাখা ভেঙে, সিঁথিব ফাঁকেব কতকালেব সিঁদুরবেখাটি ঘ’ষে-ঘ’ষে তুলে দিয়ে থান প’বে দরে এলেন ননীবালা। টুনি তেমনি ব’সে বইলো মাথায় হাত দিয়ে পুকুরধাবে। টলটলে জলেব দিকে তাকিয়ে ডুবতে ইচ্ছে করলো তাব।

কিন্তু সময় তো কাটলো তব। টুনিও মরলো না, টুনিৰ মা-ও মবলো না। সেই শত্ৰু বাড়িব ভাঙা ভিটে আকড়ে ধ’রে দিনরে পব দিন

খেয়ে, না-খেয়ে, অর্ধাশনে থেকে তবু তারা বেঁচে বইলো। নির্মলের আশ' কোনো খবর পাওয়া গেলো না, ভাবনায চিন্তায় ভয়ে ভুগে কত আলোড়ন উঠলো বুকেব ভেতর, মনে হ'লো বুঝি ফেটে যাবে, আশ্চর্য, তবু তবু ম'বে গেলো না টুনিরা।

ননীবালা কপাল কুটলেন। কত চিঠি লিখলেন। কত কান্না, কত বাগ, কত অভিমান। চূপ। টুনিব বাত ভেসে গেলো, দিন ভেসে গেলো, চোখের জলের ঝাপসা আলোয় জগৎ-সংসার মিথ্যে হ'য়ে গেলো, তবু নিমল চূপ। 'কেন ? কী হ'লো ? তোমার কী হ'লো ? তুমি কেমন আছো ? শুণু সেইটুকু, সেইটুকু আমাকে জানতে দাও। তুমি আছো তো ' না - কি—'

একটা সুদীর্ঘ হাহাকাবে বুক চেপে ধরে মাটিতে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে যায় টুনি, প'ড়ে থাকে গিয়ে বনতুলসীব ঝোপে, স্তম্ভিতের মতো শ্বশানেব দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা কেটে যায়। এমন যে মুখবা ননীবালা, সে-ও একটা কথা বলতে সাহস পায় না মেয়েকে। সম্ভরণে চলে, ফেবে, ঘটিবাটি বন্ধক দেয়। অতি কষ্টেব ছাড়িয়ে-আনা-গলাব হারটা বিক্রি হ'য়ে যায় অর্বেক দামে। তামার পাতের চুড়িটাও কি আর থাকে ? যায়। সব যায়। কেবলমাত্র প্রাণ ছুটি ছাড়া। ননীবালা সময়ে-অসময়ে কেঁদে ওঠেন গলা ছেড়ে, 'হায়, হায়। এ আমি কী করলাম। কা কবলাম।' টুনি মা-র সেই ক্রন্দনরত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ঠাণ্ডা চোখে। এই বুক-ভাঙা অতৃপ্ততাপেব কান্না দেখতে ভীষণ ভালো লাগে তা'ব।

তারপর কোনো এক দারুণ দুযোগের রাতে, মেঘের গর্জনে, মুষলধাব বৃষ্টিতে, বিদ্যুৎচমকে সারা পৃথিবী যখন ভেসে যাচ্ছিলো, টুনিদের ভাঙা চাল দিয়ে অঝোবে জল পড়ছিলো, খসে-আসা-বেডাব ফাঁকে-ফাঁকে

ঝড়ের দাপট ক্রমাগত হুমকি ছাড়ছিলো উন্নত বিক্রমে, তখন 'ছেঁড়া মাছুবে, ছেঁড়া বালিশে, শতছিন্ন মলিন বসনে চুপচাপ ভিজ়ে সারাটি রাত সাবা ঘবময় একটু শুকনো আশ্রযেব জন্ম, এ কোণ থেকে ঐ কোণ, ছুটোছুটি কবতে-কবতে ক্লান্ত টুনি একসমযে স্থির হ'যে বসলো। বললো, 'মা, আর না। চলো এবাব চ'লে যাই আমবা।'

ননীবালা কেঁদে উঠলেন, 'কোথায় যাবি ? কে আছে আমাদের ?'

কে না ছিলো। একজনই তো সব জন হ'যে ঘিবে ছিলো জীবন। দু-হাতে বৃষ্টিব ছাট সামলে নিয়ে সহজ গলায় টুনি বললো, 'কলকাতা যাবো। তোমাব কোনো আত্মীয় নেই ? চেনা নেই ?'

'থাকলেই বা এমন কে আছে যাব বাড়ি গিয়ে আমবা উঠতে পাবি ? তাছাড়া বোমা পড়ছে, যুদ্ধ লেগেছে।'

'যুদ্ধ' টুনি ভেজা মুখে কেমন একবকম হাসলো। একটু চুপ ক'বে থেকে বললো, 'তোমার এক মামা ছিলেন না কালিঘাটে ?'

'মামা ?'

'একবাব আমাদের এখানে এসেছিলেন বেড়াতে ? বাবা ভালো ছিলেন তখন।'

কপালে করাঘাত হানলেন ননীবালা, 'হায় বে কপাল। তারা কি আজ চিনবে আমাদের। স্মৃথিব দিনে এমন মামা-মাসি অনেক থাকে।'

'মা।'

'ঐ।'

'সেখানেই চলো।'

'পাগল !'

'ঠিকানা জানো ?'

'তা জানবো না কেন ? সে তো আমাব মুখস্থ। কালিঘাটে সেবার

পৌষকালি উৎসব হ'লো, ববেনমামা নিজে এসে কত গরজ ক'রে নিয়ে 'গেলেন। তোব বাবা পুকুর থেকে দশ সেব ওজনেব এক বিবাট কইমাছ ধৰিয়ে দিলেন, তালপাটালি নিলাম পাঁচ সেব, সে কত বুম-ধাডাঙ্কা—'

‘তবে আব কী। কলকাতায় আমবা সেখানে গিয়েই উঠবো।’

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, ‘না, সঁই হয় না বরেন মিত্তিব আমাব নম্পর্কেব মামা নয়। গ্রাম স্তবাদে— কেবল ডাকাডাকি।’

‘তা হোক।’ টুনি অস্থির বেগে ন’ডে-চ’ডে বসলো, ‘আব আমি এখানে থাকতে পারছি না মা।’

ননীবালা বিহ্বলেব মতো তাকিয়ে বললেন, ‘উপায় কী? সেখানেও তো এই দুঃখই। কী খাবে, কী পববে।’

‘দুঃখ কি কেবল খাওয়া-পবাবই। তাব চেয়ে অনেক, অনেক বেশি দুঃখ এখানে, এ বাড়ি আমাকে দিনবাত চিবিয়ে থাক্ছে। না মা, না, এখানে আব নয়। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুববো কলকাতা গিয়ে, লোকেব বাড়িতে বাসন মাজবো। হয়তো বা কোনো একদিন তাব সঙ্গে—’ চুপ কবলো টুনি।

ননীবালাও চকিতে একবাব মেযেব মুখে চোখ বুলিয়ে চুপ ক’বে বইলেন। নির্মলেব শতস্মৃতি-জড়ানো এই গ্রাম, এই বাড়ি, এই বাড়ির আনাচ-কানাচ খে তাঁব মেযেব কাছে কত অসহ্য তা তিনি ঠিক অতটা বুঝে উঠতে না-পারলেও কিছু বুঝলেন।

সব শুনে স্মীলা-পিসি বললেন, ‘কেন যাবি? গাঁ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে? অমন একটা না-জানা না-চেনা শহরে এমন ছট ক’বে কেউ যায়? আর তাঁর মধ্যে সেখানে তো শুনিছ সৈন্তদেব ছাউনি পড়েছে, আকছাব সেট গোবা পণ্টনগুলো বেইজ্জত করছে মেযেদেব।’

ননীবালা ক্লাস্ত গলায় বললেন, ‘এখানেই বা কী ইজ্জতে আছি
ঠাকুরঝি ? মান নেই, সম্মান নেই, সমাজ নেই, খিদেয় ধুঁকে মরলেও
খাবার নেই । আর মাথার চালখানা তো দেখছো ।’

সুশীলা ব্যথিত গলায় বললেন, ‘তবু তোরা যাসনে । আমি বলছি
যাসনে । গেলে শেষে পস্তাবি । থাক না আর কটা দিন কষ্ট স’য়ে ।
জাখ না কী হয় ।’

‘কোনো আশা নেই ।’ ননীবালা কপাল চাপড়ালেন, ‘এতো বডে:
মেয়ে গলায়, দু-দিন পবে তো সেই অপরাধেই কর্তারা আমাদের তাড়িয়ে
দেবে গ্রাম থেকে ।’

‘ঈশ্ দিলেই হ’লো । কেন, মাথার উপর কি ভগবান নেই নাকি ?
তিনি দেখছেন না ?’

‘আর তিনি !’

তেলহীন রুক্ষ চুলে একটা থামেব হেলানে এলিয়ে-ব’সে-থাকা টুনির
একটু হাসি ফুটলো এ-কথা শুনে । তিনি তো সত্যিই দেখছেন । তা যদি
না-ই দেখতেন তবে আব এই শাস্তি কিসেব ? ননীবালার কি আজ মনে
হচ্ছে না সে-কথাটা ?

সুশীলা-পিসি তাকে টেনে নিলেন কাছে, ‘আয়, চুল বেঁধে দিই । এমন
সুন্দর তোরা চুল, সব যে উঠে যাবে অযত্নে । তখন নির্মল এসে বলবে
কী ?’

হঠাৎ ননীবালা ঠাঠা কপাল ঠুকতে লাগলেন বারান্দার থামে,
‘ঠাকুরঝি, আমাব দোষেই এই হ’লো ।’

‘তবে শোনো বলি,’ সুশীলা-পিসি ফিসফিস করলেন, ‘আমি জানি
নির্মল তোমাদের ঠিকই চিঠিপত্র লেখে, কিন্তু তোমরা পাও না ।’

‘অ্যা ?’

‘এই যে গ্রামের কতকগুলো নরক আছে না, যেগুলোকে যমও নিষে
ষেতে ভয় পায সেগুলোই সব শলা-পবামর্শ ক’বে ডাক আটকাচ্ছে । গাপ
কবছে চিঠিপত্র । টাকাকড়ি ।’

‘তুমি ঠিক জানো ঠাকুরঝি ?’

‘জানবো না কেন ? খুব জানি । তবে হাতে নাতে কি আব ধরা
যায় ?’

‘কে, কে সেই পাষণ্ড, আমি একবার যাবো তাব কাছে, আমি দেখে
নেবো তাকে ’ ননীবালাব চোখ আগুনের মতো জ্বললো, নাকের বাঁশি
ফুলে-ফুলে উঠলো ।

সুশীলা পিসি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবলেন, ‘অসম্ভব ।’

‘কেন অসম্ভব ? এতো বড়ো অন্ডায় কববে, তাব কি কোনো
প্রতিবিধান নেই ?’

‘কিছুই নেই সহ্য করা ছাড়া । তোদেব হাতে কি কোনো প্রমাণ
আছে ? পিণ্ডন ব্যাটা ওদেব মঠোয়, আব ঐ হাবামজাদা বামসদয়টা,
সেটা কি একটা সোজা ভেড়া ? ওদেব ভাষে যেন একেবারে কাঁপে ।
আমি বলি, তুই ব্যাটা একটা পোণ্ডমাস্টাব, তুই ই যদি জেনেও না-জানি
ভাব দিস, দেখেও না দেখি ভাবে চোখ বুজে থাকিস, তবে যা না, গলায
কলসি বেঁধে ডুবে মব গিয়ে । নযতো লাল-পাড শাড়ি প’বে হাতে চুড়ি
দিয়ে ঘুবে বেড়া ।’

‘তাব চেযে বড়ো কোনো জাযগা নেই ঠাকুরঝি, যেখানে নালিশ
কবলে এব সাজা হয় ?’

‘তা কি আব না আছে বোন । কিন্তু পবামর্শ দেবে কে ? ছুটোছুটি
কববে কে ? ছুটো মেযেমানুষ তোরা, এতোগুলো লোকেব বিরুদ্ধে এই
গায়ে ব’সে কী কবতে পারিস ?’

‘তবু— তবুও তুমি আমাদের থাকতে বলো পিসি।’ টুনি আকুল
আবেগে জড়িয়ে ধবলো স্ত্রীলা পিসিকে।

পিঠে হাত বলিয়ে স্ত্রীলা হাসলেন, ‘তবু বলি মা, তবু বলি। মিথ্যা।
একদিন প্রকাশিত হবেই, একদিন সে নিজেই আসবে। বুঝবে সব।’

মনীবালা বললেন, ‘কিন্তু নির্মলই বা কেমন, ঠাকুবাবি ? এই যে ফেলে
গেছে, একবার তো তাব আসা উচিত।’

‘আসবে।’

‘আব আসবে। যুদ্ধে গেলে মানুষ মানুষ থাকে না। মায়া মমতা ভুলে
যায়। কিন্তু আমবাও তো কত চিঠি লিখি তা তো সে পায় ?’

‘তোমাদের চিঠিও যায় না ওব কাছে। ডাকবাক্স থেকেই নষ্ট হ’য়ে
যায়। মাথা নাড়লেন স্ত্রীলা পিসি, ‘অনাদি কী বলে জানো ? টুনিব
নামে নাকি যত জঘন্ট জঘন্ট কথা লিখে পাঠাচ্ছে ওবা। টুনি কাব সঙ্গে
ভাব করেছে, কাব সঙ্গে পালিয়ে গেছে, আবাব কাকে বিয়ে কবেছে।
এই সব আব কী। কী আব বলবো, এমন একটা নবককুণ্ড গ্রাম আব
কোনোখান নেহ।’

সুস্তিতেব মতো ব’সে বইলো টুনি আব টুনিব মা। আর কোনো
কথা ফুটলো না মুখে।

হায বে নির্মল। তুমি কি জানো তাবপব কেমন ক’বে একদিন মা
আব মেয়ে সন্ধ্যাব অন্ধকাবে গা ঢেকে, গ্রামের আল বেয়ে, ঢাল বেয়ে,
ঝোপঝাড় বনঝাড় ডিঙিয়ে, লোকচক্ষুব আড়ালে আড়ালে পাঁচ মাইল
বাস্তা ডিঙিয়ে স্টেশনে এসেছিলো। গাড়ির সময় জানে না তাবা, কোন
গাড়ি কোথায় যায় তাও কি তাবা জানে ? চাদাব মুখ ঢেকে টিকিট
কিনে প্রত্যেক মহতের ভয়ে প্রত্যেক মহতে ম’বে গিয়ে— দাঁড়িয়ে

দাডিয়ে কেবল অনন্তকাল অপেক্ষা। নীবব স্টেশনের কোনো-একটি নিভৃত কোণে লুকিয়ে থাকতে-থাকতে অপেক্ষাটা অনন্তকালই মনে হয়েছিলো। কত সন্দিগ্ধ চক্ষু তখন পীড়িত কবেছিলো দু জন অসহায় মানুষ্যেব দেহকে তাও আজ স্পষ্ট মনে পড়ে। সঙ্গে পুরুষ নেই এটা কি সেই গ্রামের পক্ষে একটা কম কথা। কিন্তু না, কেউ জিগ্যেস কবে নি কিছু, কোনো চেনা মুখ সেদিন ছিলো না সেই স্টেশনে।

ঘন রাতে যখন হাওড়া স্টেশনে এসে নামলাম, অনাহাবে, অনিদ্রায়, ভয়ে, দুঃখে, লজ্জায় কী মনে হ'লো তখন আমাদের? কলকাতা শহরেব আমবা কী চিনি? কী জানি? গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে এসেছে। দু-জন দু জনেব হাত ধ'নে কাঁপা-কাঁপা পায়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বাহবে এলাম। টুপি পরা সব বহুশ্রম্য ভয় পাওয়ানো আলো, এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটোনো জনতা। মা অস্ফুটে ডাকলেন, 'টুনি।'

টুনি অস্ফুটে জবাব দিলো, 'মা।'

তাবপর আবাব চুপ।

শাদা পোশাক পরা, কালো ব্যাণ্ডেব টুপি মাথায কোনো সন্দেহ বেল-কর্মচারী যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালেন। হঠাৎ বা অনেকক্ষণ থেকেই নক্ষ্য কবছিলেন। তাকিয়ে থেকে জিগ্যেস কবলেন, 'সঙ্গে আব-কেউ নই? কোনো পুরুষ?'

মা ঘোমটা টেনে বললেন, 'না।'

'কোথায় যাবেন?'

'কালিঘাট।'

'কত নম্বব?'

'একচল্লিশের বি, ববেন মিত্তিবের বাড়ি। আপনি কি চেনেন সে-বাড়িটা?'' মা-ব গলা ব্যাকুল শোনালো।

বেল-কর্মচারীটির মনে যদি বা তাদের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের কাণ ঘটে থাকে তাহ'লে মা ব সেই আনাডি ব্যাকুল প্রশ্নেই হযতো কেটে গেলো । মুহূ হেসে নবম গলায় বললেন, 'না মা, সে-বাডি আব আমি কি ক'বে চিনবো ।'

‘তবে কেমন ক'বে যাবো ব'লে দিতে পাবেন ?’

‘এখান থেকে পাঁচ নম্বব বাসে চডলেই আপনি কালিঘাটে গিয়ে নামতে পাববেন । কণ্ডাক্টবকে ব'লে দিলে সেই নামিষে দেবে ঠি ব জাযগায়, তাবপর নম্বব মিলিয়ে নেবেন । কিন্তু এখন এই বাত বাবোটাং তো আপনি যেতে পাববেন না ।’

মা আতঙ্কিত হ'য়ে বললেন, ‘কেন ?’

‘আপনাবা কি জানেন না বাত দশটার পবে আজকাল সব বন্ধ হ'য়ে যায় । কেউ বাস্তায় বেণোয না । জাপানিবা যে বেধুন এসে গেছে । এই তো পরশু বোমা পডলো ।’

মা চুপ ।

‘আপনাবা কোথা থেকে আসছেন ?’

‘রাধানগব ।’

‘সঙ্গে তো বিশেষ কিছু নেই দেখছি ।’

‘না, বাবা ।’

‘নগদ টাকাকডি বা গযনা-পত্র ?’

আমাদের আবাব টাকাকডি আব গযনা-পত্র । সম্বলের মধ্যে তে সেই হাবমনিয়ম আব গ্রামোফোন বিক্রি ব অবশিষ্ট বাহান্নটি টাকা ।

তাও তুমি । তোমাবই টাকা । নির্গল । তুমি ছাড়া আর আমাদ ক' ছিলো তখন ? মন, প্রাণ, অস্তিত্ব সবই তো তুমি । তোমাতেই জড়ানো সেই তুমি দেখলে না, জানলে না, কোনোদিন ধাবণাও করতে পারবে ন

তোমাব সেই টুনিকে, সেই অনাদৃত লাক্ষিত প্রিয়নাথের ততোধিক নির্ধাতিত মেয়ে রাধানগবেব সেই সঙ্ক্যামণি দত্তমল্লিককে জগৎ থেকে এছে ফেলে আজকের দিনের এই মানসী দত্তে পৌছে দিতে আমাকে কত দীঘ রাত্রি পাব হ'তে হয়েছিলো। দু'গেব কী মকভূমির উপব দিয়ে হাটতে-হাটতে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে আকর্ষ জলের পিপাসাব পবে এই জলের স্পর্শ।

মা মুখ তুলে বললেন, 'আমবা বডো গবিব। আমাদের সঙ্গে সে-সব কিছুই নেই।'

'ঠিক আছে। তাহ'লে আপনাবা এক কাজ কবন। আমি ফার্ট' ক্রাশ ওয়েটি'-কমটা খুঁলে দিই আপনাদের, বাস্ত্রিটো সেখানেই থাকুন। তারপর কাল সকালে যেখানে যাবাব যাবেন।'

বিশ্বাসে ভব ক'বে গুটিগুটি এগুলাম তাঁর সঙ্গে। তিনি শুধু ঘরে পৌছে দিয়েই কর্তব্য শেষ করলেন না। একটা কুলিকে ডেকে পাহারায় রাখলেন, খাবার আনিষে দিলেন, তারপর বললেন, 'তবে আমি যাই?'

মা দুই চোখে ক্লতজ্ঞতা নিয়ে শুধু তাকিয়ে বইলেন। হযতো বা বিশ্বাস। মানুষ মানুষের শত্রু, এটাই তো বহুদিনেব অভিজ্ঞতা তাঁর।

কিন্তু সূর্য উঠলেই তো আব সকাল হয় না? টুনিদেবও সকাল হ'লো না। বাসে চ'ড়ে কালিঘাটে নেমে, বাস্ত্রাব প্রত্যেকটি বাড়ির নঙ্গর দেখতে-দেখতে, বাস্ত্রাব প্রত্যেকটি মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে-করতে ভীত-চকিত ছুটি মানুষ হয়রান হ'য়ে ববেন-মামাব দরজায় এসে কড়া নাড়লো, দরজা খুলে দিয়ে প্রথমে মামার বডো মেয়ে ছুটি অবাক হ'লো, তারপর মানসী নিজে, আর তারপর আপিশ থেকে ফিরে মামা। মেয়ে ছুটির অবাক হওয়ার সঙ্গে তাদের মা বাবার অবাক হওয়ার অবিশি কোনো সম্বন্ধ ছিলো না। মেয়ে ছুটি কখনো ঠাখে নি তাদের, তাছাড়া তাদেরই সমবয়সী

যে-মেয়েটি মুখ নিচু ক'বে দাঁড়িয়ে ছিলো দবজা ধ'বে, তাব বেশভূষা দেখেও হয়তো অবাক হ'য়ে থাকবে। কেননা সেই অতি জীর্ণ, অতি দুঃখী টুনিব সঙ্গে এদেব মিল কোথায় ?

কিন্তু মামা মামী অবাক হলেন তাদের অবিস্মৃতকাবিতায়। কত কালের মধ্যে দেখা নেই, শোনা নেই, সত্যি বলতে যাদের সঙ্গে কোনো ছিটেফোঁটাও সম্পর্ক নেই, তাবা যে এমন বেয়াকুবের মতো খেতে পবতে এখানে এসে উঠতে পারে এ যেন তাঁবা ভাবতেই পাবলেন না। শুধু থ হ'য়ে বইলেন। দোষই বা কী। একে তো কলকাতা শহবে নিজেবা থাকাই দায়, দু-খানা ঘবের ফ্ল্যাটের মধ্যে ঠাসাঠাসি গুতোগুঁতি, তাব উপবে এই সেদিন গুচ্ছেব ক্ষতি ক'বে বোমাব ভষে কলকাতা ছেড়ে গ্রামে গিয়ে আট মাস থেকে কত কাণ্ড ক'বে আবাব কলকাতা এসেছে আর তার উপবে এই ?

ননীবালা একেবাবে হাত জড়িয়ে ধবলেন মামীব। 'কযেকটা দিন, মামী, কযেকটা দিন থাকতে দাও আমাদেব। তাব বদলে যা করতে বলবে তাই ক'বো।'

মামা চাষে চুমুক দিয়ে বললেন, 'না, না, এসেছো যখন তখন থাকবেই তো, কিন্তু কথাটা হচ্ছে গিয়ে, মানে প্রিয়নাথ এমন অনাথ ক'বে থুয়ে মবলো কেন ?'

তাই তো। কেন মবলো তার কৈফিয়ৎ কে দেবে।

কিন্তু তাদের নিয়ে তখন খুব কি অস্ববিধে হয়েছিলো মামা মামীর ? এখন ভাবলো মানসী। ঠাকুব ছিলো না বাম্মাব, ননীবালার সাহায্যে সে অভাব তাদের খুব ভালো ক'রেই পূরণ হয়েছিলো। নাত সন্তানের জননী ববেন-মামাব স্ত্রী বাঁচলেন আগুনের উত্তাপ থেকে। আর টুনি ? সে-ই

কি কোনোদিন একদণ্ড বসতে পেবেছে সেখানে ? বোমাব সময়ে ঝিয়েরা একজনও ছিলো না সেই শহবে । তবে ? আব যে-বাড়িতে একুশ থেকে এক বছরের পর্যন্ত বাচ্চার ভিড, তাদের নাওয়াতে হয় নি ? খাওয়াতে হয় নি ? কাঁথা-কাপড় কাচতে হয় নি ? ঘুম পাড়াতে হয় নি ? পড়াতে হয় নি অ আ, ক খ ? বডোদেব বাশি রাশি কাপড়-জামাব সূপ বাথরুমে, মামীব শুচিবাঘুব দোষ, কেবল মোছে। আব ঝাডো । কিন্তু লোক কই । এই তো টুনি । এতোগুলো লোকেব সেলাই-কোঁড়াই তা-ই বা করবে কে টুনি ছাড়া ? সে-বাড়ির বডো মেয়েবা তো সকালে পড়ে, দুপুরে স্কুলে থাকে, বিকেলে বেড়াতে যায়, আব সন্ধ্যায় গানের মান্দাব আসে সপ্তাহে তিনদিন ক’রে । তাদের সময় কই ?

আবাব গান । এখানেও গান ।

টুনি অস্থির বোধ কবে আব ননীবালা স্তব্ধ হ’য়ে তাকিয়ে থাকেন যখন গান শেখে মেয়েরা । রান্না করতে-কবতে খুস্তি হাতে অগ্নমনস্ক হ’য়ে যান । কী তাঁব মনে পড়ে কে জানে । হঠাৎ একদিন বললেন, ‘মেয়েদের গান শেখাও কেন মামী ? মেয়েমানুষ, গান দিয়ে হবে কী ?’

মামী হেসে আকুল, ‘শোনো কথা, গান কি একটা মোজা জিনিস আজকাল ? জানো এই গান দিয়ে কত মেয়ে আজকাল কত বোজগার কবছে ? আব কী নাম, কী গাতিব ।’

টুনি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে মা-ব দিকে । বুকেটা কি ধক ক’বে উঠলো মা-ব ? ভাবে মনে-মনে । মা যে এই নিয়ে এ-কথাটা ছ-বার শুনলেন সে-কথা কি মনে পড়লো তাঁব ?

মেয়ে দুটির একটি বললো, ‘আমাব সব চেয়ে বডো অ্যামবিশন কী জানো, টুনি ?’

বডো-বডো চোখে তাকিয়ে টুনি বলে, ‘কী ?’

‘সিনেমায প্লে ব্যাক কবা । কখনো তো ছাপো নি, তাতে যে গান হয়, আজকাল তো সব প্লে ব্যাকই করে ।’

‘প্লে-ব্যাক ?’

‘অর্থাৎ আগে ছিলো যে পাট কবতো তাকেই গান গাইতে হ’তো, এখন কিন্তু তা নয় । সে মুখ নাড়ে, আব অগ্ন মেয়ে পেছন থেকে গেয়ে যায় ।’

‘তা-ই নাকি ?’

‘হ্যাঁ । একদিন তোমাকে দেখিয়ে আনবো তাহ’লেই বঝাবে । যদি ঈশ্বর আমাদের জিগ্যেস কবেন তুমি কী বব চাও, আমি বলবো – স্তম্ভ চাই না, শান্তি চাই না, ঢাকাকড়ি কিছু চাই না বাপু, একবার যেন কোনো সিনেমায প্লে ব্যাক করতে পারি ।’

টুনি হাঁ ক’বে চেয়ে চেয়ে শোনে ।

‘তা ই তো এতো খাটি এব পেছনে । এই যে আমাদের মাগাব মশাইকে দেখছে, ইনি তো নিয়মিত গ্রামোফোনে গান দেন, বেডিঙতে গান কবেন—’

‘৭ ।’

‘ফুটকিব কিছু হবে না, কিন্তু মাগাবমশাই বলেছেন, আমি চেষ্টা কবলে খুব শিগগিব বেডিঙ আর্টিস্ট হ’তে পাববো ।’

‘৮ ।’

‘তখন আব পায় কে ? যেমন নাম, তেমন ঢাকা ।’

‘ঢাকা ও দেয় ।’

‘দেয় না ?’

‘কী ক’বে জানবে যে তুমি গাইতে পাবো ।’

‘কী ক’বে আবার ? আমি যাবো, অভিশন দেবো—’

‘অডিশন ?

‘বৌকচন্দ্র, এ-ও বোঝো না ?’ হেসে গ’লে যায় মেয়েটি । ‘তুমি যদি ওদেব লেখো যে আমি গান কববো ওখানে, অমনি ওবা তোমাকে গডিশান ডাকবে অর্থাৎ পরীক্ষা নিয়ে দেখবে তুমি তাই যোগ্য কিনা । যদি যোগ্য হও তখন গানের তালিকা দেবে ।’

‘ও ।’

এস পবে মেয়েটি তাব নতুন শেখা গানের কলি ভাজতে ভাজতে স’লে গেলো আচল ঘুবিয়ে, ভাবতে বসলো টুনি । হাতেব কাজ হাতে বইলো, বাচ্চাবা উদ্দাম স্তখে তছনছ কবতে লাগলো ঘববাডি, খাবাব জায়গা দিতে হুল হ’নে গেলো, বকুনি খেলো সঙ্কলব তব সে ভাবতে লাগলো ।

সেই ভাবনা কি সেই মেয়েটির একবেলা ছবেলাতেই ফুবিয়ে গেলো । একদিন দু দিনেই ফুবিয়ে গেলো । হাঁটতে, চলতে, ঘব ঝাটি দিতে, কাপড পাচতে, বাচ্চাদেব নো রা ঘাটতে, ক্লান্তিতে, অপমানে, অসম্মানে ভাঙতে-ভাঙতে তিনটি মাস ধ’বে এই ভাবনা ভাবলে সে ।

তাবপব একদিন এসে মান্দাবমশায়ব মুখোমুখি দাডালো, ‘একটা কথা ।’

মান্দাবমশায় অবাক, ‘কী কথা, মা ।’

তিনি তখন গান শিগিয়ে বাইবে ফুটপাতে এসে দাডিয়েছেন । টনিবে তিনি দেখেছেন, নানা ভাবেই দেখেছেন, মেয়েবা যখন গান শিপতে বসবে তখন শতবর্ষি বিছোতে দেখেছেন, হাবমনিষম বেব ক’রে এনে দিতে দেখেছেন বাবা তবলা ঠিকঠাক বাপতে দেখেছেন দবকাব হ’লে গান গাইতে-গাইতে মেয়েবা যখন হাঁক দিয়েছে ‘এই টুনি কামেকটা শব্দ দিয়ে যাও তো ।’ কি না, ‘আদা দিয়ে বেশ কডা এক কাপ চা ক’বে

‘আনো তো’— হুকুমমতো সেই সবই মেয়েটিকে নত মুখে তালিম কবতে দেখেছেন। অথবা তাদের দু-বছরের ভাই তিলু যখন ছুটে গিয়ে হুমডি খেয়ে পড়েছে হাবমনিয়মের উপর, সব রীডের উপর হাঁটু চেপে বেলো টেনেছে আর একটা ঝুচাপা কাতর আর্তনাদ উঠেছে হাবমনিয়মে (সেই শব্দটার সঙ্গে টুনি তখন কোথায় যেন নিজের মিল পেয়েছে মনে-মনে), তখনও মাস্টারমশায় ধমক খেতে দেখেছেন টুনিকে, ‘করিস কী সারাক্ষণ, ছেলেটাকেও সামলাতে পাবিস না?’ ভেতর থেকে ওদের মা চৈঁচিয়ে উঠেছেন এই ব’লে, ‘আব ভাইয়ের পিঠে চড় মারতে-মাবতে মেয়েবা বলেছে, ‘কী কবো তুমি? হাঁ ক’বে দাড়িয়ে আছো? দেখতে পাও না?’ নিয়ে যেতে পারো না ওকে এখান থেকে?’

শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ ক’রে হাত-পা-ছোঁড়া বাচ্চা ছেলেকে তুলে আনতে বীতিমতো পবিশ্রম হয়েছে টুনিব। সেই সবই দেখেছেন মাস্টারমশায়। আজকে হঠাৎ এমন ক’রে রাস্তায় বেবিয়ে এসে সে যদি একটা জরুরি কথা বলতে চায় তাঁব সঙ্গে তাহ’লে তিনি তো অবাকই হবেন।

নিঃশব্দ নতমুখে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে থেকে টুনি বললো, ‘আপনি তো কত ছেলেমেয়েকে গান শেখান, আমাদের বি একটা কাজ দিতে পারেন না?’

‘তোমাকে! তোমাকে আমি কী কাজ দেবো?’

‘গান শেখানোর। এই যাবা ছোটো, যারা প্রথম শিখছে।’

‘তুমি গান জানো?’

‘অল্প-অল্প—’

‘শিখেছিলে কখনো?’

‘দেশে থাকতে একটু-একটু—’

‘এখানে তো! অল্প-অল্প, একটু-একটুতে কিছু হয় না মা, যাচিয়ে, বাজিয়ে, সব দেখে শুনে নেয় ফে।’

মাস্টারমশায়ের কথা বড়ো মিষ্টি লেগেছিলো টুনির। ভারি নরম। যেন তার মধ্যে আশা আছে, আশ্বাস আছে। মাহস পেয়ে বললো, ‘আর আপনার কাছেও তো শিখছি তিন মাস ধ’রে।’

‘আমার কাছে?’

‘ওদের শেখান, আমি তো শুনি?’

‘তাইতেই কি শেখা হয়? এ বড়ো কঠিন কাজ।’

টুনি চুপ ক’রে রইলো। কে জানে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাস্টার-মশায়ের হুংখ হ’লো কিনা। আশুে বললেন, ‘আচ্ছা, এক কাজ করে। তুমি। আমার মেয়েকে শেখাও, মাইনে দেবো।’

‘আপনার মেয়েকে?’ বুকটা কেঁপে ওঠে টুনির। ‘আমি আপনার মেয়েকে শেখাবো?’

‘সে খুব ছোটো, হাতে খড়ি দিয়ে দাও, শেষে একটু স্বপ্ন এলে তখন আমি ধরবো। কেমন?’

• প্রায় পঞ্চাশ-প্রৌঢ় গায়ক তাব মাথায হাত ধোয়ালেন। রুতজ্জতায় চোখে জল এলো টুনির।

সেই তো জীবনের শুরু। সেই মাস্টারমশায়। সেই বামেন্দু ভট্টাচার্য। তারপবে যেদিন এলেন তিনি, মেয়েদের গান-টান শিখিয়ে বললেন, ‘কই, সেই মেয়েটি কোথায় তোমাদের? ডাকো দেখি।’

‘কাকে। টুনিকে?’

পায়ে-পায়ে, ভয়ে-ভয়ে টুনি নিজেই ঘরে এসে দাঁড়ালো। মাস্টার-মশায় সম্মুখে বললেন, ‘এসো মা, এসো। একটা গান শুনবো তোমার আজ।’

মেয়ে দুটি বিনা ভূমিকায হেসে উঠলো, ‘ও মা, টুনি গাইবে কী। ও গান জানবে কোথা থেকে।’

‘আহ। জানতেও তো পাবে?’ কাঁচা-পাকা মাথাটি আন্দোলিত হ’লে মাষ্টাবেব, ‘দেগি না।’

টুনি বসলো। পিঠেব শিবদাঁড়া ভিজে গেলো ঘামে, ঘামলো কপাল, হাতেব তেলো। কিন্তু দাঁড়াতে হ’লে এব চেয়ে সাহস চাই, শক্তি চাই। আস্তে টেনে নিলো হাবমনিয়মটি।

মেয়েবা হাসছে মুখ টিপে। মাষ্টাবমশায় লক্ষ্য ক’বে গম্ভীর হলেন। ততোক্ক্ষেণে ভিড জমেছে ঘরে। ছোটো ছেলেমেয়েবা এসে ঠেলাঠেলি, ঠেসাঠেসি কবছে, তাদের মা মোটা শরীরে হাপাচ্ছেন, এককোণে বাগ্না ফেলে ননীবালা ও ময়লা কাপড় দবজাব আড়ালে ঢেকে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মনে-মনে টুনি তাব দেবতাকে ডাকলো, যে-দেবতা তাকে চিবদিন সাহস জুগিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে, খবচ জুগিয়েছে, সকলেব সব চোখ-বাঙানি অবহেলা ক’বে হাবমনিয়ম কিনে দিয়েছে, এনে দিয়েছে আঠাবো-খানা বেকড স্নুদ্র, গ্রামোফোন। হঠাৎ মা ব দিকে তাকালো সে, ককণ, বিধব, ছুঃস্থ বিধবা। ববেন মিত্তিবেব বাধুনি। আব আশ্চয। মা-ব চোখে তো সে সেই আলো দেখলো। যে আলো নিম্নলব। কোনো গাইষেকে ডেকে এনে সে যখন টুনিব গান শোনাতে, গান শেখাতে অল্পবোধ জানাতে, গাইতে ব’সে টুনি তখন তাকাতো নির্মলেব মুখেব দিকে। ঠিক, ঠিক, এই ভাষা, এই আশা, এই আলো জ’লে থাকতো তখন তাব বডো-বডো চোখ দুটিতে।

মুহূর্তে ভয ভাবন। লজ্জা ছুঃখ সব ভুলে টুনি গেয়ে উঠলো গান। পাখিব গান। বনের গান। বন্দনাব গান। যে-গান অলৌকিক, যে-গানের স্পর্শে ছুঃখ পবিত্র হয়, স্তম্ভ ভেঙ্গে ওঠে, শাস্তি অবগাহন কবায। সেদিন টুনি

হযতো বা কযেক মুহূর্তেব জ্ঞাত ঈশ্বৰকেও নামিবে নিষে এসেছিলো তান গানেব কান্নায । নিৰ্মল । তুমিও কি সেই মুহূর্তে টুনিব কথা ভেবেছিলে ? টুনি তো সেই গানেব ক'ন্না দিযে তোমাকেই ডেকেছিলো, তোমাকেই খুজেছিলো । যত কান্না পাষণ হ'যে চাপা ছিলো বকেব মধো, সব তো সে ঝৰিযে দিযেছিলো সেদিন । তার ভালো লেগেছিলো । ভাষণ । ভাষণ ভালো । শুবু কি ভালো ? গান গাইতে পেযে সে যে সেদিন ঝেচেছিলো । একটাৰ পব একটা, একটাৰ পব একটা । এই তিন মাসেব মাস, বমশাযেব গান ও বাদ দিলো না সে ।

তাবপব থামলো ।

পাৰ্থিব জগতে কিবে এসে টুনি হাবমনিয়মেব উপর ভেঙে পডলো মাথা বেখে ।

আব তাবপব ?

তাবপর তো এই ।

বামেন্দু ভট্টাচাৰ্য । ভাবতবিখ্যাত প্ৰোফেসর আলম খাঁব যিনি প্ৰিয়তম শিষ্য । ষাঁৰ জুডি ঠুংবি গায়ক বিবল । খেবালেব আটঘাট ষাঁৰ নখদৰ্পণে । আধুনিক গানেব জন্মদাতা ব'লে সবাই থাকে পুজো করে মনে-মনে । সেই তিনিই তাবপব মনে প্ৰাণে গ্ৰহণ কবলেন তাকে । তাঁৰ সব টেলে দিলেন এই আঠাবো বছৰেব মেযেটিব গলায । টুনি পাখি হ'যে উডলো, বাঁশি হ'যে বাজলো, তানপুৰোব চাৰটে তাব তার গলায পোষা মযনা হ'যে ধরা দিলো । নিৰ্মলেব ভবিষ্যতেব স্বপ্ন টুনি বাধানগবেব সন্ধ্যামণি দত্তমল্লিক নাম বদলে মাৰা বা লাৰ কিন্নবীকণ্ঠী মানসী দও হ'লো ।

তৃতীয় খণ্ড

• এক

বাত ভাবি হ'য়ে উঠছে, আস্তে আস্তে লেকেব জলে অস্ত গেলো চাঁদ, ঘব অন্ধকাব হ'য়ে উঠলো, দিগন্ত-জোড়া কালো আকাশে সোনাব বুটি হ'য়ে ফুটে উঠলো অজস্র তাবা। শেষ ফাস্তনেব এক বলক বাতাস মনমব ক'বে পাতা বাবাব ব'য়ে গেলো হাহাকাবেব মতো। দবে চিকচিক ক'বে কৈপে উঠলো লেকেব জল, লাইটপোমোব আলোগুলো শিহবিত হ'লো জলের তলায।

ক'টা বাজলো ? ভোব হ'য়ে এলো নাকি / পাগিবা তবে ডানা বাপটাছে কেন ? মানসী জানালা ছোড এসে দেবালেব স্নইচবোর্ডে হাত বাগলো, আলো জ'লে উঠলো দপ ক'বে। পবিত্র স্মজ্জিত ঘব। ধবধবে বিছানাব উপব ফবাসি নেডেব মশাবি। দুধেব ফেনাব মতো ফুলে-ফুলে উঠছে বাতাসে, দুটো একটা মশা কালো বিন্দুর মতো লেপটে আছে বস্তুেব আশায়। মানসী দুই হাতেব স ঘষে পিষে ফেললো তাদেব। আলপিনেব মাথায় এক ফোঁটা লাল কালিব মতো একটুখানি বস্তু লেপটে গেলো হাতেব চেটোতে। পাংলা মশাবি ডেউ হ'য়ে গাঁড়িষে-গাঁড়িষে স্থিব বইলো খানিকক্ষণেব জগু।

বাধানগবেও মশা ছিলো। সন্ধ্যাব আধাব ঘনিষে এলেই ভনন্‌ভন ক'রে পাক থেখে লাথ লাথ মশা উঠে আসতো পুকুরঘাট থেকে, নাকে মুখে বসতো। সন্ধ্যাপ্রদীপ জেলে দবজা জানালা বন্ধ ক'রে ধূপেব ধোঁয়ায় ঘব অন্ধকাব ক'বে দিতো টুনি। অতিষ্ঠ হ'য়ে প্রিগনাথবাবু বলতেন, 'দম বন্ধ হ'য়ে গেলো যে, তাব চেবে তুই আমাকে মশারিটা কেলে দে,

জ্ঞানলাটা খোলা থাক ।’ চাবদিকে চাবটে পেৰেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা তুলে-
বাখা মশাবিটা টুনি পাখাব বাতাস দিয়ে-দিয়ে ফেলে দিতো, লাভ
হ’তো না কিছু । চৌখুপি চাবগানাব শতচ্ছিন্ন মশাৰিব তলায় শুয়ে
প্ৰিয়নাথবাবু মশাব কামডেও অতিষ্ঠ হতেন, গবমেও সেক্স হতেন । টুনি
কখনো-কখনো লণ্ঠন নিযে ভেতৰে ঢুকে মশা মাৰতো, কখনো বা বিৰক্ত
হ’য়ে তুলে দিয়ে বলতো, ‘তাব চেয়ে আমি তোমাকে বাতাস কৰি বাবা,
গবমও লাগবে না, মশা ও কামডাবে না ।’

শুণ কি মশাৰি ? প্ৰিয়নাথবাবুব পিঠেব তলায় একটা আন্ত
তোশক ও ছিলো না শেষেৰ দিকে, তুলোপুলো দলা বেঁধে গিয়েছিলো,
উপবেৰ কাপডটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বেবিযে আসছিলো সেগুলো । ভাৱই
উপবে একথানা পুৰোনো শাড়ি চু ভাজ ক’ৰে পেতে সাপাদিন শুয়ে
থাকতেন ।

নিজেব বিছানাৰ আবামে গা ঢেলে দিতে গিয়েও উঠে বসলো মানসী,
বসলো এসে চেৰাবে । কনাব-শেল্ফে স্পিণ্ডাৰ মতো টিকটিক কৰছে
দামি টাইমপীসটি, তাব কালো কালো ডানা ছুটিব দিকে তাকালো । সুন্দৰ
জিনিসটি । মাগ্টাৰমশায় দিগেছিলেন । কালিঘাটেব বাডি ছেড়ে তেৰো
ঢাকা ভাড়া, সরকার গলিব এক অন্ধকূপে, এক অন্ধকাৰ ঘৰেব বাসিন্দা
হ’য়ে মাকে নিযে যখন মানসী স্বাধীন হ’লো, তখন । নতুন সংসাৰ
পাতবাৰ জন্তু যেমন নতুন হাঁডিকুডিৰ দবকাব হযেছিলো, নতুন জীবেব
প্ৰথম পদক্ষেপেৰ জন্তু তেমনি এই ঘডিটি । মাগ্টাৰমশায় বলেছিলেন,
‘সাপাদিন যত খুশি বাঁধো বাডো, খাও, বেডাও, কিন্তু সকাল-সন্ধায
এটিৰ দিকে তাকিয়ে বসতে হবে তোমাকে । সেখানে ফাঁকি দিলে
চলবে না ।’

নতুন বাডিতে আনবাব দিন তিনিেক পৰে ছোটো একটি অস্ত্ৰাণও

হয়েছিলো। ভাড়া-করা তক্তপোশে শাদা চাদর পেতে, ঘটিতে জল ভ'রে ফুল সাজিয়ে মাঝখানে রেখে, ধূপ প্রদীপ জালিয়ে ঘরের মধ্যে একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছিলো। মাস্টারমশায় সেদিন ডোর বেঁধে দিলেন তার হাতে। মানসী মাস্টারমশায়ের শিষ্টাঙ্গ গ্রহণ কবলো, 'গুরু গ্রহণ করলেন তাকে। ঈশ্বর সাক্ষী ক'বে প্রতিজ্ঞা কবলো এই গুরুর প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকবে সে, আগুন ছুয়ে বললো, গুরুর দান এই গান তার প্রাণ হবে, মন হবে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব-কিছু সে সমর্পণ করবে এই গানের পায়ে। গুরু বরণ ক'বে মাস্টারমশায়কে প্রণাম কবলো, মাস্টারমশায় স্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন। আব তখনি তিনি এই ঘড়িটি বের করলেন পকেট থেকে।

হারমনিয়ম ছিলো না, বাঁয়া-তবলা ও না। হারমনিয়ম একটা মাস্টার মশায়-ই জোগাড় ক'রে আনলেন কোথা থেকে, আর বাঁয়া-তবলাব বদলে রইলো এই ঘড়ি। একটু অদ্ভুত ঘড়ি। এই ঘড়িটাই শব্দ ক'রে তাল দিতো গানের সঙ্গে-সঙ্গে। একটা যন্ত্র ঘুরিয়ে দিলে প্রত্যেকটি টিকটিক আওয়াজ রীতিমতো জোবে তবলার বোলার মতো টকটক ক'রে উঠতো। আব সেই শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক লয়ে গান শিখতো টুনি। তারপর অবিশি সব যন্ত্রই একদিন কিনতে পারলো। চারশো টাকা দামের ডবল বীডেল নতুন ধরনের নরম স্বর হারমনিয়ম, তামার বাঁয়া-তবলা, দস্তার হাতুড়ি, তানপুরো, দরজি ডাকিয়ে নাটিনের জামা হ'লো সকলের, আরো কত প্রাচুর্য। কিন্তু মাস্টারমশায় বললেন, 'সারাদিন তুই তবলচি কোথায় পাবি বেওয়াজ কবতে? তোব এই কলের তবলচিই সব চেয়ে নিরাপদ। এর মতো লয়দার বীটও আর তুই কিছুতে পাবিনে। এটা আমার গুরুদেব আমাকে দিয়েছিলেন, আমি তোকে দিলাম। যন্ত্র ক'রে রাখিস।'

তা সত্যি । সময়ে-অসময়ে সব সময়ের সঙ্গী তো তাব এই ঘড়িটিই । এই ঘড়ি না হ'লে তাব চলে না । গেল বছর শীতকালে যখন মাস্টার-মশায় মাঝে গেলেন, তখনও মানসী এই ঘড়ি হাতে নিয়ে তাঁর শিয়বে বসতো, তিনি গুনগুন কবতেন। এই ঘড়ি টকটক করতো, মানসী তুলে নিতো নতুন স্বব । শেষের দিকে মাস্টারমশায় গলা দিয়ে পারতেন না, হাতে বাতাতেন, নোটেসন লিখে দিতেন, তখনও কত স্বব ছিলো তার বুকের মধ্যে, দেবার মতো কত সম্পদ ছিলো । মাস্টারমশায় ছটফট কবতেন, মানসী চোখ ভরা বেদনা নিয়ে তাকিয়ে ব'সে থাকতো । একটি সবুজ আলো জ্বলতো শিয়রে, নিরুমা হ'য়ে মাস্টারমশায় প'ড়ে থাকতেন বিছানায়, আস্তে-আস্তে গান করতো সে, মাস্টারমশায় শুনতেন । ঐটুকুতেই তাঁব যেন অনেক যন্ত্রণাব অবসান হ'তো ।

তাবপর একদিন মাঝে গেলেন । নিঃশব্দে । নিঃশাড়ে । সারা গহর ভেঙে পড়লো । কত ছাত্র, কত ছাত্রী । কত ভক্তের দল । কত ফুল আব কত মালা । মাস্টারমশায়কে কে না ভালোবাসতো ? তাঁর সান্নিধ্যে এসে কে না মুগ্ধ হয়েছে ? কে না পেয়েছে ? একেবাবে কল্পনার চবিত্র । দু-হাতে উপার্জন করেছেন, খরচ করেছেন দশভুজ হ'য়ে । হাত পেতে কেউ ফিরে যায় নি, এমন মানুষ ছিলেন তিনি ।

কিন্তু কী আশ্চর্য ! যে-গলায় তাঁব স্বরের মল্লিকিনী ব'য়ে যেতো, সে-গলায় তাঁর ক্যানসার হয়েছিলো । পুরো ছ'টি মাস এই গলার ঘায়ে ভুগে সর্বস্বান্ত হ'য়ে শেষে তিনি গেলেন । সেই সময়ে মানসীর দিন-রাত ছিলো না, আহা-নিদ্রা ছিলো না, যেন সুখ-দুঃখেরই বোধ ছিলো না কোনো । মাস্টারমশায়ের যোগ্য স্ত্রী, মাস্টারমশায়ের সব কাজের অহুরাগিনী, সমভাগিনী, ক্লান্ত অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকতেন তার আশায় । তার উপর নির্ভর ক'রে আশা পেতেন তিনি, শাস্তি পেতেন ।

মানসী কাবো দিকে তাকাতো না, কোনো কিছু ভাবতো না, শুধু এই চিন্তাই তাকে অতৃষ্ণণ আচ্ছন্ন ক'বে রাখতো, কেমন ক'বে ভালো হবেন মাস্টারমশায়। কী কবলে অন্তত আরো কয়েকটা দিন তাঁকে ধ'রে বাখা য়ায এই পৃথিবীতে।

বিবস্ত্র হলেন ননীবালা। বিবস্ত্র তিনি অনেকদিন আগেই হয়ে-ছিলেন। এইবার তাব প্রকাশ আবস্ত হ'লো। প্রথম দিন মেয়েকে আডে-ঠারে বললেন, দ্বিতীয় দিন শুনিযে-শুনিযে আপন মনেই গজগজ কবলেন, তৃতীয় দিন ঝাংকাব দিলেন, 'লোকে বলতেই বলে উদবি বাঁদবি যক্ষ্মা, তিন হ'লে নেই বক্ষ্মা। যমের অসাধ্য যে বোগ, তাব জগ্ন এতো ঘট'পটাব কোনো অর্থ হয়? এ কেবল খোদাব উপব খোদকাবি। আব ডাক্তাবগুলোও তেমনি। যেন জঙ্গলেব নেকড়ে। ওং পেতেই আছে অছিল ক'বে টাকা খাবাব জগ্ন। কথায় আছে, বাঘে ছু লে এক ঘা, আব উকিলে ছু লে আঠাবো ঘা, এখন দেখছি কলকাতাব এই ডাক্তাবগুলো বাঘকেও ফেল ফেলেছে, উকিলকেও ফেল ফেলেছে। ছিনে জৌকেব বাবা। বস্ত্রশোষা বাছুড। কেন বে বাপু, মিথ্যে আশা দিস। জানিসই তো বাঁচবে না, ঢং ক'বে স্যুটবুট লটকে, গলায নল ঝুলিযে স্তোক দিস কেন? সোজাসুজি বলতে পাবিস না, কবাবাব কিছু নেই?'

এক নিশ্বাসে এতো কথা ব'লে গেছেন ননীবালা, মানসী'ব কানে এক বর্ণও পৌছোয নি। সে-সবে কান দেবাব সময় তাব ছিলো না। এক ডাক্তাব ছেড়ে সে তখন অগ্ন ডাক্তাব ধরেছে, এক পদ্ধতি ছেড়ে অগ্ন পদ্ধতি'ব শবণ নিয়েছে। ডীপ্ এক্স-বে কবাবাব পবামর্শ চলেছে মাথায-মাথায। যা লাগে, যত লাগে। এতো বডো একটা প্রাণেব জগ্ন কী না ভাবতে পারে মানসী? কী না কবতে পারে?

এর পবে ননীবালা রীতিমতো বিদ্রোহ আবস্ত কবলেন, মেয়েব

মাথা মুখি দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কেন, ভুই-ই কি একা গান শিখেছি নাকি ? যে তোরই এতো মাথাব্যথা ? আর কেউ নেই ? আব কেউ করতে পারে না ?’

‘সবাই কবে মা—’ ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়েছে মানসী, ‘যে যা পারছে স-ই তাই করছে ।’

‘তোব উপরেও আবো কারো কবাব দবকাব হয় নাকি ? তুই তো কোই একশো দেখছি । আব এ-ও তো কম তাজ্জবের কথা নয় বাপু, নিজের টাকা এক পয়সা খবচ করবে না, পরেব টাকায় দবদ নেই । ঢাকার তো আব অভাব নেই লোকটাব ? অশ্বেরটা এমন নিচ্ছেই বা , কমন ক’বে ? কাঁড়ি-কাঁড়ি বোজগাব কবেছে জীবন ভ’রে— ’

বেফবার জ্ঞা প্রস্তুত হ’তে-হ’তে খেমে গেছে মানসী, ফিরে তাকিয়েছে, এক মুহূর্ত চুপ ক’বে থেকে বলেছে, ‘মাস্টারমশায়ের কিছু নই ।’

‘নেই তো গেলো কোথায় ? তার মানে উড়িয়েছে ।’

‘না উডোলে আমাদেব মতো দুঃস্থদেব খাওয়াপরার ভাবনা চুকতো কিসে ?’

‘কী !’ ফোঁস ক’রে উঠেছেন ননীবালা, ‘ও-একম বলবিনে টুনি, গবিব থাকতে পারি, তাই ব’লে ভিস্কু ছিলাম না । লোকের কাছ থেকে এমন হাত পেতে নিই নি কোনোদিন ।’

‘নাও নি বুঝি ?’ উদাস ভঙ্গিতে ঠোঁটেব কোণে একটু হেসে পায়ে জতো গলিয়েছে মানসী । ‘আর মেয়ের রকম সকম দেখে ননীবালা খাপাদমস্তক জ’লে উঠেছেন, ‘না, নিই নি । কক্ষনো নিই নি ।’

‘তাহ’লে ভুলে গেছো । যাক গে, দরজাটা বন্ধ ক’রে দাও । আমার দ্রিতে দেরি হবে ।’

ননীবালা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসেছেন মুখের সামনে, ‘ভেবো না তোমার এই ঠেস দিয়ে কথা বলার অর্থ আমি বুঝি না। কিন্তু তবু আমি এ-কথা বলবোই যে দিয়েছে সে সাধ ক’রে দিয়েছে, দিয়ে কিছু পেয়েছে ব’লেই দিয়েছে।’

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে মানসী, অনেক কথা তার বেরিয়ে আসতে চেয়েছে বুক ঠেলে, অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু তক্ষুনি সামলে নিয়েছে নিজেকে। কী লাভ ?

‘আর তুমিও এমন কিছু একটা নবাবজাদি নও—’ ননীবালা শেষ করেছেন কথা, ‘তোমারও কিছু অফুরন্ত ভাণ্ডার নেই যে জলের মতো দু-হাতে যেমন খুশি ঢালতে পারো, ফেলতে পারো।’

‘একে কি তুমি ঢালা বলো ? ফেলা বলো ?’

‘হ্যাঁ, বলি। একশোবার বলি। তারপর তোমার কিছু হ’লে কেউ কানাকড়ি দিয়েও জিগ্যেস করবে না।’

‘হয়তো করবে। হয়তো আমার জন্তুও কেউ ঢালবে, ফেলবে এ-ভাবেই চলে।’

ননীবালা রুখে উঠেছেন, ‘ভারি স্বাধীন হয়েছিস, না ? মাকে আর গ্রাহ্যই নেই। টিটকিরি দিয়ে কথা ! গলা বেচে ছুটো টাকা রোজগার করিস ব’লেই বুঝি ভাবিস, মস্ত দিগগজ হয়েছিস ? আমার আর বলবার কিছু থাকতে পারে না ?’

এবার মার মুখের উপর শীতল চোখে তাকিয়েছে মানসী। মেজাজ তার ঠাণ্ডা ; বরফের মতো গলায় জ্বাব দিয়েছে, ‘বলবার কথা তো সবই তোমার। আমার তো কোনোদিন কিছু ছিলো না, তোমার কথামতোই সারাজীবন চ’লে এসেছি, এখনো চলছি। তবু কি তোমার সাধ মেটে না ?’

‘যদি তা-ই বলিস তাহ’লে আমার এ-কথাটাও তোকে রাখতে হবে।’

‘কী ?’

‘নিত্য তিরিশ দিন ঐ ঘা-কোপের খরচ আর তুমি জোগাতে পারবে না। আর সারাদিন অমন মাগামাগি ঘেঁষাঘেঁষিও করতে পারবে না।’

‘এই তোমার কথা ?’

‘হ্যাঁ। এই আমার কথা।’

এর পরে আর মানসী এক মুহূর্ত দেরি করে নি, একবার তাকায় নি, সিঁড়ি বেয়ে তরতর ক’রে নেমে এসেছে নিচে, রাস্তার পোলা হাওয়ায়, আকাশের তলায় এসে মা-র হ’য়ে মনে-মনে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছে, চলতে-চলতে হঠাৎ নির্মলের মুখখানা ভেসে উঠেছে চোখে, অবিশ্রি নিমেষের জগুই।

.... দুই

গাধানগর থেকে কলকাতা আসবার প্রায় ন-দশ মাস পরে, যখন টুনি টুনিই ছিলো, যখন মাস্টারমশায় অল্প দুটি মেয়ের সঙ্গে তাকেও গানের দময় ডাকতেন, শেখাতে-শেখাতে একাগ্র হ’য়ে উঠতেন, আর সেই কারণেই কালিঘাটের বরেন-মামার বাড়িতে বাস করা অসহ্য হ’য়ে উঠেছে, হঠাৎ একদিন বিকেলে রাস্তায় দেখা হ’য়ে গেলো স্ত্রীলা-পিসির সঙ্গে।

একপান ঘর খুঁজতে বেরিয়েছিলো তারা। সে আর ননীবালা। এখানে গান শেখা অসম্ভব। মেয়ে দুটি হিংসেয় জ্বলে গিয়ে যে-সব বিদ্রী কুশী ভাষা প্রয়োগ করতো, শুনতে-শুনতে কাটা কইয়ের মতো বকের ভেতরটা যেন দাপাতে থাকতো টুনির। মাস্টারমশায়ের পক্ষপাতিত্বে

মামা-মামী আশুন হ'য়ে উঠেছেন, আর তার তাপ বড়ো কম নয়। ম মেয়ে সারাদিন চোর হ'য়ে আছে, চকিত হ'য়ে আছে। মন জোগাবা' জগ্ন সারাক্ষণ ঘুরছে চরকির মতো, হাতের কাজ কেড়ে নিচ্ছে, গোছানো ঘর আবার গুছিয়ে দিচ্ছে, কথা বলছে গোশামোদ ক'রে, যদি সম্ভাহে' এই তিনটে দিনে, তিনটি ঘণ্টার জগ্ন তাঁরা ক্ষমা করেন টুনিকে। মেয়েদের গান শেখবার সময় একটুখানি বসতে দেন দয়া ক'রে।

অসম্ভব। যে-মেয়ে আশ্রিত, অবনত, তার সঙ্গে একাসনে ব'সে গান শিখবে মামার মেয়েরা, তাদের অসম্মান হয় না? অপমান হয় না? অভিজাত্যে আঘাত লাগে না? তাই নিয়ে তাঁরা প্রকাশ্য ভাবেই রাগ-রাগি আরম্ভ করলেন, কোনো আড়াল-আবডাল ভদ্রতা বা সৌজন্যে ধার ধারলেন না। মাস্টারমশায় বললেন, 'তাতে কী হয়েছে, সম্মানবয়সী তিনটি মেয়ে, দু-জন তো শেপেই, বন্ধক না আর একজন, ক্ষতি কী? আর তার জগ্ন আমি তো কিছু বেশি চাইছি না।'

তা না-ই বা চাইলেন, কিন্তু মামা তো তাঁর নিজের মেয়েদের জগ্নই মাসের শেষে অতগুলো টাকা মাস্টারের হাতে তুলে দিচ্ছেন? এতে কি সেটার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে? দুই মেয়ের জগ্ন যেটা দেন, সেখানে যদি আর একজন এসে ভাগ বসায়, ফাঁকতালে তার কাজটি হাসিল হ'তে পারে বটে, কিন্তু অল্প দু-জনের নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়।

এ-কথারও প্রতিবাদ করলেন মাস্টারমশায়, হেসে বললেন, 'মেয়েটি তো শুনেই শিখে ফেলে, কাছে ব'সে থাকলেই কি অল্পদের ক্ষতি হ'তে পারে? কখনো সম্ভব? গান-বাজনা ব্যাপারটাই তো বহু লোকের গায় একজন, ঘিরে বসে দশজন। ওর যখন এ-বিষয়ে প্রতিভা আছে, সেটাকে অবশ্যই—'

এইখানেই বাড়িস্থ দু-সকলের ব্যথা, টুনির সম্পর্কে মাস্টারমশায়ের

এই উক্তিই টুনির সর্বনাশ। শেষে মাস্টারমশায় বললেন, ‘বেশ! আপনারা যদি তা-ই মনে করেন তাহলে ওদের সঙ্গে আর শেখাবো না। সপ্তাহে আরো একদিন আমি আসবো, তার জন্তে আমাকে আলাদা মাইনে দিতে হবে না, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে ওর জন্ত সময় চাইবো খানিকটা, অন্তত ঘণ্টা খানেকের জন্ত ওকে আপনারা কাজ থেকে ছুটি দেবেন।’

অপ্রসন্ন মুখে বরেন-মামা বললেন, ‘ওর জন্ত আপনারই বা এতো গরজ কিসের?’

মাস্টারমশায় বললেন, ‘গরজ ওর গলা। আপনারা তো অনেকবার বলেছি গানের শক্তি ওর অসামান্য। ঈশ্বরের দয়া পেয়েছে ও।’

‘ইঃ। কী গলা!’ ঠাট্টায় বেঁকে গেছেন মামা, ‘দস্তুরমতো কর্কশ। এ-গলাকে আপনি ভালো বলেন?’

‘আমার এই কারবার। কার ভেতরে কী রত্ন লুকোনো আছে তা আমরা পলকমাত্র শুনেই বুঝে ফেলি। আপনাকে আমি বলছি, যত্ন নিলে ওর তুল্য গাইয়ে বাংলা দেশে বিরল হবে।’

এবার মামীমা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার পাশে, ‘দেখুন মাস্টারবাবু, মনে আপনার ঘুণ ধরেছে, ছুন-লবণ জ্ঞান করতে পারছেন না। তাই কান শুনে ধান শোনেন, কাকের ডাকে কোকিল দেখেন। কিন্তু সে-কথা যাক, আপনাকে বলাই ভালো, মেয়েদের জন্ত আর আমরা আপনাকে রাখবো না।’

অসম্মানে লাল হ’য়ে উঠেছেন মাস্টারমশায়। থমকে গেছেন অনেকক্ষণের জন্ত। শুধু তো অসম্মানই নয়, হাজার হোক, পঞ্চাশটা টাকা মাইনে; এই তো তাঁর পেশা। এই ক’রেই তিনি খান। সাধারণত অগ্রাঙ্ক গাইয়েদের আয়ের যে-সব পছা তা তিনি নানারকম অল্পস্বতাবশত গ্রহণ করতে পারেন নি। সারাটা বর্ষা হাঁপানিতে ভুগতেন, গলার ব্যবহার

একেবারে বন্ধ রাখতে হ'তো সেই সময়ে, আর ভালো হবার পরেও গলা মেরে উঠতে আরো অনেকটা সময় নিতো। একটুও ভাঙা নয় এ-রকম মাজা-ঘষা গলা বছরের মধ্যে দু-মাস থাকতো কিনা সন্দেহ। অল্পবয়সে অবিশিষ্ট এ-রকম ছিলো না, সংসারক্ষেত্রে নেমে, যখন উপার্জনের প্রয়োজন বেড়ে গেলো, বয়স বাড়লো তখনি গলা তাঁকে নানারকম কষ্ট দিতে আরম্ভ করলো। সব চেয়ে বেশি টাকা পেতেন সিনেমার প্লে-ব্যাকে, সেটা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠলো, বেডিঙর প্রোগ্রাম ও নিয়মিত নিতে পারতেন না, কত সময় গ্রামোফোন-স্টুডিওতে গিয়ে ফিবে আসতে হয়েছে হঠাৎ গলা ধ'রে যাবার দরুন। এই টিউশনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবিকা। নিজের বাড়িতেও ক্লাশ নিতেন, এসেও শেখাতেন। আর ভালো ছাত্র-ছাত্রী পেলে টাকার কথা ভুলে যেতেন।

মামীর কথায় অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'সে তো বেশ কথা, মা। আমিও ছাডবো-ছাডবোই ভাবছিলাম। আমারও মন লাগছিলো না ঠিক।'।

'তা লাগবে কেন ? বুড়ো বয়সে মাস্টারমশায়ের যে ভীমরতি ধরেছে।'। পাশের ঘরে ফিসফিস ক'বে ঠেলাঠেলি করেছে মেয়েরা।

সারা শরীরে গবম হ'য়ে উঠেছে টুনি।

মাস্টারমশায় বেবিয়ে গেলেন তখনি, একেবারে সোজা রাস্তায়। মাসেব আটাশ তারিখে, প্রায় একমাসের মাইনে তেমনি বাকি প'ড়ে রইলো। বরেন-মামারও যেমন দিতে হ'লো না ব'লে বাঁচলেন, ঐ নোংরা হাত পেতে নিতে হ'লো না ব'লে মাস্টারমশায়ও বোধহয় কম লাঘব হলেন না।

দ্রুতপায়ে টুনি এসে দাঁড়ালো কাছে, তার চোখ জলে ভ'রে উঠেছে, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে। কী বলতে চাইলো, বলতে পারলো না, শুধু

খবর ক'রে ঠোট ছুটো কেঁপে উঠলো। মুখের দিকে তাকিয়ে মাধায় হাত রেখে হাসলেন মাস্টারমশায়, 'কী বে পাগলি ? কী হ'লো ?'

'আমি— আমি—' টুনি তার অসহায় করুণ মুখ তুলে তাকালো।

মাস্টারমশায় সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললেন, 'ভেতবে যা, ক'টা দিন থাক নষ্ট ক'রে, তারপর ব্যবস্থা ক'বে দেবো।' '

'ব্যবস্থা ?'

'ব্যবস্থা মানে একটা ঘর খোঁজা আব কি।'

'ঘর !'

'আলাদা থাকবি। এখানে থাকলে ঐট ক'বেই জীবন কাটবে। অমন সন্দেহ গান অমনিই ক'বে যাবে।'

'আমাদের যে কিছুই সম্বল নেই।'

'সম্বল নেই, হবে। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই চিঠি লিখে খবর জানাবো তোকে।'

'মাস্টারমশায় !' হাত চেপে ধরেছে টুনি। মাস্টারমশায়ের হাত নয়, তার বাবাব হাত, প্রিয়নাথবাবুব হাত। মাস্টারমশায়কে ছুঁয়ে সে প্রিয়নাথবাবুর স্পর্শ অনুভব করেছে। আশ্চর্য ! সেইসঙ্গে নির্মলকেও যেন অনুভব করেছে বুকের মধ্যে, মনে হয়েছে সে আছে। আছে। এমনি ক'রেই ছড়িয়ে আছে আশ্রয়-আশ্রয়।

ননীবালা কেমন ক'বে জানবেন তার সেই সব অনুভূতিময় মুহূর্তের কথা। কেমন ক'রে বুঝবেন মাস্টারমশায়ের মধ্যে সে কী পেয়েছিলো, কী দেখেছিলো। মাস্টারমশায়ের জীবনের কত দুল্য তার কাছে। টুনি কঁদে ফেলেছিলো সেদিন।

ব্যস্ত হ'য়ে মাস্টারমশায় বললেন, 'তাহ'লে ঐই কথা রইলো। একটা গুস্তা ঘরটির কোথাও খুঁজে বের করি, আর তোর জন্তে সত্যিই এবাব

দু-একটা টিউশনি জোগাড় কবি।' তাবপর হাসলেন, 'রাম না-জন্মাতেই বামাবণ, কী বলিস ? নিজেই শিখলিনে, আবাব শিক্ষক।' প্রশান্ত হাশ্বে টিনিব হৃদয় উদ্ভাসিত ক'বে চ'লে গেলেন তিনি, সেদিকে তাকিয়ে দুঃখের আঘাতে টিনিব হৃদয়-পড়া ভেঙে-যাওয়া নড়বড়ে মনটা হঠাৎ যেন মোড় হ'য়ে দাঁড়ালে।

প্রায় দু সপ্তাহ পবে একটা চিঠি এলো। মাগটাবমশায় লিখেছেন, ফ- তিনি দেখেছেন একটা, মন্দ নয়। একটু কষ্ট হয়তো হবে ও-বকম বাড়ি-খাকতে, কিন্তু উপায় কী ? এবটা বাচ্চা মেয়েকে গান শেখানোর কাজ ঠিক কবেছেন, তাছাড়া বেডিওতে অডিশনের ব্যবস্থা কবেছেন, তিনি নিজেই নিয়ে যাবেন নির্দিষ্ট তারিখে। আবো একটা সুখবর, সম্ভবত একটি সিনেমার গানে, কোবাসে গলা দেবাব জগ্ন শিগগিবই তাব ডাব পড়বে, পবীক্ষায় উত্ত্বোতে পাবলে বেশ কিছু উপাঙ্গনের সম্ভাবন আছে।

জকবি কথায় ঠাসা মাত্রই কবেক লাইনেব চিঠি। কিন্তু পড়নে অনেকটা সময় লাগলো টিনিব। ননীবালাও চোখে-মুখে অদম্য উত্তেজনে নিয়ে তাকিয়ে বহিলেন মেয়েব নত দৃষ্টির দিকে, তাবপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মানুষ নব, দেবতা। দেবতা। ভগবান যদি কোনোদিন মুখ তুলে তাকান, বুঝবো এ ব জগ্ৰেই তিনি দয়া কবেছেন। গোবিন্দ। গোবিন্দ তিনগাব কপালে যুক্তকব ঠেকিয়ে প্রণাম কবলেন কী জানি কা উদ্দেশে। তাবপর গলা খাটো ক'বে কানেব কাছে মুখ এনে বললেন 'কাউকে বলিস নি যেন, কাকপক্ষীটি যেন জানতে না-পাবে। এবাং লোক, বাবা। আমাব হাতে চিঠিটা দেখে থেকে কেবল বলছে, "কা- চিঠি, কান চিঠি ? আমি কি আব বলি সে-কথা ? বললাম, "গাঁয়েব এক জ্ঞাতি দেওবেব।" বলে, "কী লিখেছে, যেতে গিগেছে নাকি ?" আ

বাপু, যদি সত্যি আজ কেউ যেতে লেখ তোবা কি ছাডবি আমাদের ।
এই মাগ্গি-গণ্ডাব বাজাবে ছু-মুঠো ভাত দিষে ছুটো কি - পাৰি কোথায ।
তোদের বাবণের সন্মান লেবে কেমন ক'বে ?

তবু কিন্তু টুনি বাড়ি দেখতে যাবাব আগে ভেবেছিলো । বলেছিলো
'এটা কি ঠিক হবে মা ? শেষে যদি সব ভাব মাসটার মশায়ের ঘাড়ে
পড়ে, সে ভাবি লজ্জাব । তাব চেয়ে বব'

এতো বডো সন্মানেব হাড় ঠেলতে ঠেলতে হাড় কালি হ'য়ে উঠে,
ননীবালাব । ছিন্নবস্ত্র, জীর্ণ দেহে তিনি ঝাঝিয়ে উঠেছেন মেয়েব উপব
তোব আবাব সবটাতেই বেশি চিন্তা । মাসটার মশায় নিজে বলছেন
তিনি কি না-বঝেই বলেছেন ? আব এ ভাবে তুই গান শিখবি ক'
ক'বে ?

বিছানাব অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে এই গানের জন্তে ননীবালাব গণ্ড
দেখে আবছা হেসেছে টুনি, তাবপব ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে দীঘশ্বাসে ভ'বে
উঠেছে বুক ।

সুশীলা-পিসি একেবারে জড়িয়ে পবলেন পথের মধ্যে, 'ও মা, টুনি
তোব এই চেহাৰা হ'সেছে ' আহা, অমন স্তম্ভ মেয়েটা ।'

টুনি নিচু হ'য়ে পাশের ধুলো নিলো ত'ব । ননীবালা বললেন, 'হবে না ।
কী স্থখে আছি আমবা তা তো জানো না '

'আব তোমাবই বা কি হাল হ'য়েছে বউ । অমন বং পুড়ে একেবারে
কালি ।'

'দাসীরত্তি কবছি, ঠাকুববি ।' প্রায় গলা ভেঙে এসেছে মা
সুশীলা-পিসি মাথা নাড়লেন, 'আব ইদিকে গ্রামে কী কাণ্ড ।'

'কী, পিসিমা ?' চোখ তুলেছে টুনি ।

‘আব কী ? কত বললাম একটু ব’য়ে-স’য়ে থাক ছুটো দিন, তা তো
তোদের সহীলো না ।’

টুনিব বৃক্বে ভেতবটা খবখব ক’বে ঝেঁপে উঠলো । ননীবালা সাগ্রহে
বললেন, ‘কেন ?’

‘আব কেন ? সেই ছেলে দিবে এসে একেবারে খুনোখুনি ।’

‘অ্যা !’

‘চিঠি মিঠি না পেয়ে, যত সব উদ্ভট খবব শুনে ছুটে এসেছে পাগল
হ’য়ে ।’

‘এসেছিলো ।’

‘আসবে না ? না হয খালি মস্তক পড়ে নি কিন্তু প্রাণ মন তো তাব
এখানেই ?’

ননীবালা বিমনা হলেন । টুনি দূর থেকে এসিবে দিলো চোখ ।

‘আব তোবাই বা কী বে ? বললি না, বইলি না, হট ক’বে চ’লে
এলি চুপে চুপে ?’

‘তুমি তো তখন ছিলে না ঠাকুবাবি । সাতগাঁয়ে গিয়েছিলে ।’

‘আহা, আমি কি চিবতবে গিয়েছিলাম ? আমাব কেবা পযন্ত অন্তত
তোমবা অপেক্ষা করতে পাবতে ।’

‘কী অবস্থা হয়েছিলো আমাদের – সে তো তুমি জাখো নি ।’

‘তা তো ঠিকই ।’

টপটপ ক’বে কয়েক কৌটা জল ঝাবে বৃক্বে কাপড চুপসে গেলো
টুনিব, কেউ লক্ষ্য কবলো না । টুনি মুছে ফেললো তাড়াতাড়ি । কিন্তু
আবাব দুই চোখ ঝাউপাতাব মতো ঝাপসা ।

অর্ধোদয়-যোগে স্থশীলা-পিসি গঙ্গাস্নানে এসেছেন তিনদিন থেকেই
চ’লে যাবেন । কী ভাগ্য যে তাবই মধ্যে কেমন দেখা হ’য়ে গেলো । তব

তো খবর পাওয়া গেলো, তবু তো টুনি জানলো সে আছে, তারই জন্তে আছে ।

ননীবালা স্তিমিত গলায় বললেন, ‘ছুটি নিয়ে এসেছিলো বুঝি ?’

‘হ্যতো তা-ই হবে ।’

‘ক’দিন ছিলো ?’

‘ক’দিন আব । আবে বাবা, তাইই মরো কা বেসাবেমি, ঙলুস্বল , এদেব বকুম-সকম দেখলে হাসবো, না কাঁদবো ভেবে পাই না ।’

‘কেন ?’

‘কেন আবাব ? ভালোবাসাবামি ঘটা ? এটানে, সে টানে। খাতিব কত ? চৌধুরী-বাডিব বসন্ত ৭ল, আমাব এখানে থাকো, বোসদের সেহ কুঁজোটা, বজ্জাতের খাড, ৫ ৩, অ বাব বলে, চিবদিন আমি তোমাকে নিজেব ছেলে জ্ঞান ক’ বজ্জি, তোমাব তো আমার এখানেই থাকা উচিত । ঘোষেব বাড়ি, দাসেব বাড়ি, ললিত বুডোটার কথা আব বলবো কী । যাব বাড়িতেই মেয়ে আছে তাব বাড়িতেই টানাটানি । অবিশি যাদেব নেই তাদেবও বডো কম গরজ নয় ।’

‘ইঠাং এতো আদব কিসেব ? আগে তো কেউ দু-চক্ষে দেখতে পাবতো না ।’

‘ও মা, বলো কী গো ? তাব যে তখন দু হাত ভতি টাক । খোলাম-কুচিব মতো ছড়াচ্ছে, ছিটোচ্ছে, ফেলে দিচ্ছে । কী পোশাক, কা চেহার । সাহেবদের মতো একেবাবে টকটক কবছে । দেখলে বাপু সত্যি ভক্তি হয় ।’

ননীবালা ডুবে যেতে-যেতে বললেন, ‘তারপব ?’

‘থানে-থানে সব কত কাপড এনেছিলো, কত সাবান, টিনে-টিনে কভ াবার, কত ফল, যুদ্ধের টাকা আর যুদ্ধেব খাবাব, তাব কি অস্ত আছে ?’

‘এনেছিলো ?’

‘আবো কত কী কে জানে, কে দেখেছে। অনাদি বলে, ও নাকি মস্ত কী একটা হ’যে মস্ত মাইনে পাচ্ছিলো। সৈন্যদের তো ও-ই কর্তা ছিলো।’

এব পবে ননীবালা একটি প্রকাণ্ড নিশ্বাস ছাড়লেন।

স্বশীলা-পিসি কপাল চাপড়ালেন, ‘যেমনি ববাত তেমনি তো হবে। নইলে অমন ছেলেকে জামাই পেয়ে তুমি হাবাও ?’

‘তাই তো। পবের বাড়ির দাসীপনা ব’বে ক’বে এই হাঁড়ির হাল না হ’লে মা মেয়ের দিনই বা কাটবে কেন, বস্তির মধ্যে সব অজাত-কুজাতের মধ্যেই বা ঘব খুঁজে বেড়াবো কেন ? ক’দিন ছিলো ?’

‘ক’দিন আব। সব মিলিয়ে বোধহয় দিন সাতেক। থাকবেই বা আব কিসের টানে বলো। তোমাদের না দেখে না-পেয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালো কেবল। শেষে একদিন সব ফেলে ছড়িয়ে কবে যেন চ’লে গেলো, জানতেও পেলুম না।’

‘চ’লে গেলো ?’ এতোক্ষণ পবে এই প্রশ্নটা কান্না হ’যে বেকলো টুনিব গলায়।

ননীবালা বললেন, ‘কোথায় গেলো ?’

‘তা কী আব ব’লে গেছে বোন ? যাবাব সময় কি সে দেখা কবেছে কাবো সঙ্গে ?’

সেই বাত্রে ভাগ্যেব এই বিডম্বনাথ, অদৃষ্টেব এই অদ্ভুত পরিহাসে আত্মহত্যা কবতে ইচ্ছে কবেছিলো টুনিব। কালিঘাটের বাড়ির সেই সক দোতলার বাবান্দা থেকে বাস্তায় লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিলো। দাবাবাত জেগে থাকতে-থাকতে অন্ধকাবে চিংকার ক’রে উঠতে ইচ্ছে

যেছিলো। ননীবালা পাশাপাশি শুয়ে অনেক পবে হাহাকার করে বলেছিলেন, ‘তুই-ই অপয়া। তোব কপালে কিছুই জোড়া লাগে না।’

হয়তো। চোখের জলে বালিশ ভাসিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিলো টুনি। এটায় কোনো জানালা ছিলো না, ওদেব কাপড ছাডবাৎ ঘর। ট্রান্স বাক্সে সামো দেখালগুলোব দিকে তাকিগৈ-তাকিয়াই বেটে গেলো সেই রাতটা।

শুধু সেই বাতই নয়, অমন নিঘম আরো অনেক বাত কাটালো টুনি, আগুনের মতো জলন্ত আবো অনেক দিন। শেষে কবে একদিন নবে গেলো সেই তাপ জ্বালা জুড়োলো, বাড়ি বদলে কালিঘাটেরই অগ্নি কানো পাডায়, কোনো বস্তির ছোট্টো একটি ঘবে এসে গানকে পেলো স। গানের মধ্যে ডুবিয়ে দিলো নিজেকে। দিনে বাত্রে একমন, একচিত্ত হ’য়ে শুধু গান আব গান। গভীর স্তব পুরস্ক হ’য়ে এলো, তারপর শালের ভীষণ প্রলেপে নির্মল নামক তরুণ যুবকটি কী জানি কখন পাবিয়ে গেলো মনের অহবহ ছবি থেকে। কড়া প’ড়ে গেলো সেখানে। আব তারপর আবার ভবে উঠলো সব। বস্তি ছেড়ে পাকাঘর, পাকা-ঘর ছেড়ে ফ্ল্যাট বাড়ি, কালিঘাট ছেড়ে বডো বাস্তা, বডো বাস্তা ছেড়ে একেব ধান। টুনি ধাপে-ধাপে উঠলো না, লাফ দিয়ে উঠলো। কোবাসে লা দিতে গিয়ে নজবে প’ড়ে গেলো মিউজিক ডিবেক্টরের, তিনি গুণী লাক, কানের পর্দা দুবস্ত, এ-আর্টিস্টকে তিনি ছাডতে পাবেন না। একই সঙ্গে আবো একখানা ছবিতে এক। গাইবাব স্মরণ দিলেন তাকে, নামে ফেটে গেলো শহর।

বামেন্দু ভট্টাচার্য খুশি হ’য়ে মাথা নাডলেন ঘন-ঘন, তালিম দিতে দিতে বলে উঠলেন, ‘কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।’ ননীবালা মুঠো ভরে টাকা তুললেন বাক্সে, আড়ালে বসে ছুঁলেন, ছানলেন, গুণলেন, সতুষ্ট নয়নে

তাকিয়ে বইলেন পাঁচখানা একশো টাকাব নোটের দিকে। দেখতে দেখতে পাঁচখানা নোট দশখানা হ'লো, দশখানা কুড়িতে পৌঁছলে কুড়িখানা চল্লিশে—ঝড়ের বেগে এই আট বছরের মধ্যে রাধানগরের প্রিয়নাথ মাস্টারের মেয়ে, ছিন্নবস্ত্র টুনি, সন্ধ্যামণি নাম বদলে মানস' দত্তমল্লিক হ'য়ে যা'লো দেশের মুখ উজ্জ্বল কবলো।

সঙ্গে-সঙ্গে ননীবালা খালি গায়ে শেমিজ তুললেন, শেমিজের উপর ব্লাউজ ধবলেন, পায়ে দেবাব জুতো কিনলেন। আবো পবে মিল ছোড় তাতের ধুতি, স্ফুটি ছেড়ে সিন্কেব ব্লাউজ, চামড়া ছেড়ে স্ফুয়েডেব জুতো' শূণ্য গলাটা ভ'রে নিলেন মোটা ঘন গোট-হাবে, হাতেও সরু অথচ বেশি সোনার ছু-গাছি জলতবঙ্গ চুড়ি গড়িয়ে নিলেন। বিধবা মানুষ্য আব কী সাধই বা মিটোতে পাবেন। লেকের ধারের আড়াই শো টাকাব প্রশস্ত স্ল্যাটে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচলেন। মেয়েব বোজগাবের বড়ে অংশটা একদম লুকিয়ে ফেলে তাব নিজস্ব পুঁবোনো একটি স্টিল ট্রান্স লিনেনের ঢাকনা পবিষে এনে বাখলেন খাটের তলায়। খাটের পায়াব সঙ্গে লোহাব মোটা শেকলে তাল দি'য়ে আটকে দিলেন, টুনি লক্ষ্য ক'বেও উপেক্ষা কবলো।

মেয়ে মেয়েই। কোনদিন তাব কী মজি হবে, কাকে না কাকে বিয়ে ক'বে মাকে ফেলে উধাও হবে, ঠিক আছে কিছু? সময় থাকতে তাই গুছিয়ে নেওয়া ভালো। নিশ্চয়ই এই সব ভেবেই এই সাবধানত ননীবালাব, নঝেছিলো টুনি। অবিশিষ্ট শেষ পর্যন্ত কপালে যে তাঁর বাজাপ শাস্তি হওয়া লেখা আছে তা কি তিনি কল্পনা কবতে পেরেছিলেন? হয়তো অতদূর যায় নি তাঁর ভাবনা। অবিশিষ্ট এ-পর্যন্ত যা হ'লো কোনটাই বা তিনি ভাবতে পেরেছিলেন। টুনিই কি পেরেছিলো? টুনির মন

ডালও যে কচিপাতার কলবোলে ভ'বে উঠবে, কুঁড়ি দেখা দেবে, ফুল ফুটবে—

ফুল ফুটবে ? না না, ফুল নয় । ফুল আব ফুটবে না । ফুল তো কবেই না'বে গেছে জীবন থেকে । কিন্তু ফুল ছাড়া একে আব কী বলে মানসী ? সকাল হ'লেই সে আসবে । সোমেশ্বর বাগচি । তোমাব ভাবী স্বামী । তোমাব বিয়েব ফুল কি তবু ফুটলো না ?

তাই তো উচিত । তুমি তো কবেই ভুলে গিয়েছো তাকে । তোমাব পুরানো জীবনের আব কী অবশিষ্ট আছে এখানে ? কাল যদি হঠাৎ তাকে তুমি না দেখতে, (সত্যিই কি সে ?) তবে আজ সে কোথায় থাকতো ? একবারও কি ভাবতে তাব কথা ? শেষ কবে ভেবেছো তাই কি তোমাব মনে আছে ? ও সব আব থাক । আর তুমি তাকে ভেবে নিজেকে উদ্ভাস্ত কোবো না । সে নেই, সে মুছে গেছে, ধুয়ে গেছে, তুমি নতুন ক'বে নতুন জীবনে বেঁচে ওঠো, সেটাই তোমার একমাত্র প্রার্থনা হোক ।

ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায় । সকালের কচি বং দুপুরের ছোঁয়াব প্রায় কড়া হ'য়ে উঠেছে । বোদের কমলা রং শিকেব ফাঁকে লম্বা-লম্বা দেখা টেনেছে । গাটেল কামিশে, বিছানাব বালিশে, মানসীব পায়েব উপবকাব ধূসর-রং বেশমি চাদরে তাব আলো । গয়লার হুখ দোষা শেষ, লেকেব প্রাতঃস্নানকারীরাও ফিরে গেছে যে যাব ঘরে, এখন রাস্তাটা আবাব নিরুন্ম ।

‘কী রে, উঠবিনে ?’ চৌকাঠে পা বেখে পর্দা সরিয়ে মুখ বের করলেন ননীবালা ।

মানসী চারদিকে তাকালো, বালিশেব রোদ থেকে সরিয়ে নিলো নাখাটা । গলাটা ঘেমে উঠেছে ।

‘ব্যাপারটা কী বল দেখি?’ ননীবালা ঘবে ঢুকলেন, ‘বাস্তিরে ঘুমুস নি নাকি, সকাল পর্যন্ত অত বড়ো একশো পাওয়ারেব আলোটা জ্বলছিলো?’

‘আলো জ্বলছিলো?’

‘খানিক আগে আমি এসে নিবিষে দিলাম। কেন? বাত জেগে কী কবছিলি?’

আডমোডা ভাঙলো মানসী। মূহু হেসে মা-ব মুখেব দিকে তাকিয়ে বললো, ‘বাধানগবেব কথা মনে পডছিলো, ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি—’

‘বাধানগর!’ চোটেব কোণে যেন বিদ্বেষ জমা হ’লো ননীবালাব, ‘কেন?’ চোখ টান করলেন তিনি, ‘হঠাৎ আবাব বাধানগবের কথা কেন?’

‘মনে পড়ে না? কতকাল সেখানে ছিলাম, কত স্মৃথ, কত দুঃখ—’

‘স্মৃথও? ঈশ্বর ককন আর যেন কোনোদিন অমন স্মৃথেব আব অমন দেশেব মূখ দেখতে না হয়।’

মানসীব মাথা টিপটিপ কবছে, ভাব লাগছে শরীবটা, আলস্তে মাথামাথি। দু-হাত উপরে তুলে বাঁকিয়ে চুরিয়ে এলোমেলো হাই তুললো সে। বিছানা থেকে নেমে, ড্রেসিং টেবিলেব দেবাজ থেকে টুথব্রাশ বেব ক’বে তাব মাথায় পেস্ট লাগাতে-লাগাতে বললো, ‘সেখানে কি তোমাং সবই দুঃখেব স্মৃতি? কোনোদিনেব কোনো স্মৃথ কি তোমাং মনে পডেছ না?’

‘জয়ন্ত। নরককুণ্ড। লোকেবা বলে স্বপ্তবেব ভিটে, স্বামীর ভিটে। ও-সব মেয়েমাংহুযেব চণ্ডেব কথা। আমাংব জন্মেও সেখানে ভালো লাগে নি।’

‘নতুন বিযেব পবেও না?’

মেযেব মুখেব দিকে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে বইলেন ননীবালা। দুব থেকে শোনা গানের কলিৰ মতো পাতলা ফর্সা ছিপছিপে একটি বি. এ.

পাশ যুবক স্মৃতির সমুদ্র বেয়ে যেন সহসা ভেসে এলো কাছে। লাজুক মানুষ, গুরুজনদের ভয়ে তটস্থ, আর তারই মধ্যে অবনতমুখী বুক-ঘোমটা এক তরুণীর সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে দিনে অন্তত দশবার চোখোচোখি। ননীবালার মুখে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই কেমন একটি নরম স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে পড়লো। চূপ ক'বে থেকে বললেন, 'যত সব নাজে চিন্তা। নে, চল, চা খাবি। ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।'

পশ্চিমের বারান্দায় এলো মানসী। বারান্দাটি চৌকো, তিনদিক ঢাকা, একদিকে সবুজ-রং চিকের ব্যবস্থা। তার একপাশে রান্নাঘর, ওপাশে বসবার ঘর। এটি মানসীর খাবার ঘর। মাঝখানে মেহগনি-রং নতুন-কেনা আয়না-পালিশ নতুন খাবার টেবিল, চারদিকে চারখানা চেয়ার। কোণে সাইডবোর্ডে কাচের বাসন সাজানো। এ-বাড়িতে এসেই এই সব ব্যবস্থা হয়েছে, তার আগে পর্যন্তও ননীবালা ননীবালার ধারণা মতোই ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতেন, মানসী মনোযোগ দিতো না। কিন্তু এখন অর্থ, সামর্থ্য, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, বন্ধুতা, সব-কিছুর সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োজন বেড়েছে, মনের গতিও বদলে গেছে বৈকি।

এ-সব সাহেব-সাহেব খেলাতে মনে-মনে খুশিই হয়েছিলেন ননীবালা। মেয়ের সঙ্গে কত জায়গায় যান, কত কিছু দেখেন, ফিরে এসে নিজের বাড়ির হালচাল আর ভালো লাগে না তাঁর। কিন্তু অমনোযোগী মেয়ের কাছে কিছু বলতে কোথায় যেন আটকায়, হয়তো বা লজ্জাও করে। এ-বাড়িটাতে আগে কোনো-এক হাকিম বাস ক'রে গেছেন সাত বছর। তিনিই যাবার সময় ফ্ল্যাটটি দিয়ে গেছেন মানসীকে। মানসীর গানের ভক্ত। নয়তো এমন বাড়ি আজকাল পাঁচশো টাকা ভাড়া দিলেও কি লোকে পায়? বাড়িটিতে এসেই মানসীর মন বদলে গেলো, কুচি বদলে

গেলো। শেষ রেকর্ডের ছুরন্ত বিক্রির একটা মোটা অংশই সে ফস ক'রে খরচ ক'রে ফেললো। এই বাড়ি সাজানোতে, আর বাড়ি সাজিয়েই ছুটো কনট্রাক্ট পেয়ে গেলো মস্ত।

এই টেবিলে খেতে প্রথম দিকে একটু-একটু আপত্তি তুলেছিলেন ননীবালা, বিধবা মানুষ কেমন ক'রে এ-সব স্লেচ্ছ ব্যাপারে মত দেন। কিন্তু তাই নিয়ে বেশি সাধতে হয় নি মানসীকে, একদিন শুধু বলেছিলো, 'কলকাতায় ও-সব কেউ মানে না।'

'সে তো ঠিকই। সে তো ঠিকই।' অমনি ননীবালা প্রতিধ্বনি ক'রে উঠলেন। 'যখন যে-রকম, যে-দেশে যে রকম সে-রকম না-চললেই লোকে গের্গো বলে।'

মানসী মুখ নিচু ক'রে যাচ্ছেন ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে-মাখতে বললো, 'সে তো ঠিকই।'

অতএব তিনিও তাঁব নিরিমিষ খালাটি নিয়ে টেবিলে বসলেন। আগে একজন পরিচারিকাতেই তাদের মা-মেয়ের সংসারের কাজ অকাতরে চ'লে যেতো, এখানে এসে মানসী আরো একজন মহিলা রাখলো। ঝাড়পৌচ করবার জন্ত, একটা ছোট্টো ছোকরা রইলো ফুট-ফরমাশের জন্ত। ননীবালাব বয়স হয়েছে, আরাম দরকার, আর মানসীর কাছে প্রত্যাহ কত ধরনের লোক আসে, স্বচ্ছন্দ লোকজন হাতের কাছে না-থাকলে অস্ববিধে হয়।

পরিচারিকা ফিটফাট কাপড়ে, বাকবকে পেয়ালায় মা-মেয়ের চ পরিবেশন করলো। ননীবালা টোস্ট মাখন আর দুধের হালুয়া খান। মানসীর একটা হাফবয়েলড্ ডিম। খিদে তার ভারি কম। পোষা বেড়ালট লাফ দিয়ে উঠে এলো কোলে, ল্যাজ ছুলিয়ে ম্যাও-ম্যাও করতে লাগলে মুখের দিকে তাকিয়ে। নন্দর মা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে দুধ দিয়ে

ঢাকলো, ‘আয়, আর নালিশ করতে হবে না।’ মানসী হাত বুলিয়ে দিলো নবম পিঠে।

‘আমি সোমেশ্বরকে গোঁটা নয়কের সময় আসতে বলেছি।’ চামচে দিয়ে চা নাড়তে-নাড়তে ননীবালা বললেন।

মানসী একবার তাকালো, জবাব দিলো না।

‘একদিনের মধ্যে সব তো ক’রে উঠতে হবে? ব্যাঙ্ক থেকে টাকাকড়ি তুলতে হয় কিছু, কী বলিস?’

‘আমি আব কী বলবো।’

‘তোরা এবাবকাব ছবির গানের চুক্তির সব টাকাটাই তো জমা আছে, না?’

‘সে তো তুমিই ভালো জানো।’

‘কী জানি বাপু, টাকাকড়ির কথা অত আমার মনে থাকে না। পাটিটা আমাদের লেনেই করবো ভেবেছি, খরচা একটু বেশি পড়বে অবিশিষ্ট। সোমেশ্বর আবার আন-এক তাল তুলেছে—’ সন্মুখে ননীবালা হাসলেন।

মানসী তাকিয়ে থেকে বললো, ‘খরচাটা উনি দেবেন, না?’

‘তবে তোকেও বলেছে? ঐ ঝগ, আমার কাছে সায় না-পেয়ে আবার তোকে গিয়ে ধরেছে। তা, তুই কী বললি?’

‘আমি?’ গলার স্বর গঙ্ঘীর হ’লো মানসীর, ‘আমি বললাম এ-সব আমার ভালো লাগে না।’

‘কী ভালো লাগে না?’ হাতের হালুয়া মুখে উঠতে-উঠতে থেমে গেলো ননীবালার।

‘যা তুমি আরম্ভ করেছো— কিছু ব’লে ফেলেছো নাকি?’

ননীবালা গোঁজ হলেন, ‘জানতাম না এ-বাড়িতে আমাকে তোমার হুকুমের অপেক্ষায় থাকতে হবে।’

‘হকুমের কথা নয়, সমস্ত মিলিয়ে ব্যাপারটাই অত্যন্ত বিশী লাগছে আমার।’

‘আমি যা-ই করি তাই তো তোর বিশী লাগে।’

মানসী আর জবাব দিলো না। অস্থির হ’য়ে নন্দর মা বললো, ‘তরু রেখে, খেয়ে নাও তো তোমরা।’

‘আমি আর খাবো না।’ চেয়ার ঠেলে মানসী উঠে দাঁড়ালো।

‘ও মা, সে কী গো, চায়েও তো ভালো ক’রে চুমুক দিলে না।’

‘গা গুলোচ্ছে।’

‘ওদিকে কাল রাত্তিবেও বসলে আর উঠলে। শরীব খারাপ হয়েছে নাকি?’

‘নে নে, আদিখ্যেতা না-দেখিয়ে তুই যা তোর কাজে। বেলা আটটা বাজতে চললো, এখানো ঘর ক’খানা পুঁছে উঠতে পারলিনে।’ ননীবালা এক ধমকে সরিয়ে দিলেন নন্দর মাকে। উঠে এসে হাতের উণ্টো পিঠটা তিনি মেয়ের বুকের কাছে ছোঁয়ালেন, ‘ও মা, গা দেখি ছাঁকছাঁক, চোখমুখ ছলছলে। আবার জর-টব বাধালি নাকি?’

‘না, জর হবে কেন।’

‘গলায় মাফলারটা জড়া দেখি।’ গলার জগ্গেই ননীবালার সব চেয়ে বেশি ভয়, ‘এ-সব ঋতু-পরিবর্তনের দিনে আজ ঠাণ্ডা, কাল গরম, মাঝখানে থাকতে হয়।’

একটু হাসলো মানসী, ‘একটা অস্থ-বিস্থ হ’লে নেহাৎ মন্দ কী? কয়েকটা দিন চুপচাপ শুতে পারি।’

‘অমন অলঙ্ঘনে কথা মুখেও এনো না বাপু। সবাইকে ডেকেছি, শেষে কি—’

ননীবালার কথার শেষটুকু না-শুনেই মানসী ঘরের চৌকাঠ পেরুলো,

নিজের ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়লো হাত-পা ছড়িয়ে। সত্যিই শরীরটা আজ ভালো লাগছে না তার।

সোমেশ্বর এলো একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ন'টাতেই। খাঁ-খাঁ রোদে ছেয়ে গেছে চারদিক, আপিশের ভিড* লেগেছে রাস্তায়। মানসীদের আসমানি ম্যানশনেও তারই ব্যস্ততা। একতলা, দোতলা, তেতলার গুথোমুগি সব বর্মা টিকের লম্বা-লম্বা দরজার পাল্লাগুলো খুলে যাচ্ছে ফটাফট, চিকচিক ক'বে উঠছে ব্রাসো-মাজ। পেতলের নেমপ্লেটগুলো, পোর্ট-ফোলিও হাতে ছোটোসাহেব, বড়োসাহেব, মেজোসাহেবরা সব বেরুচ্ছেন একে-একে। দু-একটি চেনা মুখকে অভিবাদন জানিয়ে, অচেনাকে পাশ কাটিয়ে, সোমেশ্বর এসে টোকা দিলো দরজায়।

খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন ননীবালা, 'এসো, তোমার অপেক্ষাই করছিলাম। মেয়ে তো আবার জ্বর ক'রে বসেছে।'

'জ্বর! কই, কাল তো ছিলো না।' সোমেশ্বরের চেহারায় রীতিমতো উদ্বেগ ফুটলো।

'তেমন কিছু নয়।' ননীবালা মৃদু হেসে সান্ত্বনা দিলেন, 'ব্যস্ততার কিছু নেই। কাল আবার বাড়িতে একটা ব্যাপার, তাই—' একটু গলা গাটো ক'রে, 'রেজিস্টারির বিষয়টা কি কিছু স্থির করলে?'

'ঈ্যা। ঠিক ক'রেই আসছি। তাই ভাবছিলাম আবার অস্থখ-বিস্থখ—'

'আটকাবে না। তুমি যাও না ওর ঘরে।' ননীবালা একেবারে গদগদ হলেন।

'শুয়ে আছে বুঝি?'

'আর বলো কেন, সকালে চা খেলো না, কাল রাত্রিরেও নামে মাত্র

বসলো— এসো ।’ এঘব ওঘব ডিঙিয়ে সোমেশ্বরকে মেয়ের ঘরের দরজায় পৌছে দিলেন তিনি ।

একটু ইতস্তত কবলো সোমেশ্বর, না-ব’লে না ক’বে পদার ও-পিঠে একজনের শোবার ঘবে চট ক’বে ঢুকে পড়তে হয়তো তাব শোভনতায় আটকাচ্ছিলো । এক পা থমকে বললো, ‘বব’ একটা খবর দিলে হয় না ।’

‘ও মা, খবর আবাব কী । তুমি যাবে তাও খবর দিয়ে ।’

সোমেশ্বর এবাব মুহূ হেসে ছটফটিয়ে ঢুকে পড়লো ঘবে । ‘কই কী হ’লো আবাব ।’

মানসীব অনিত্রাক্রান্ত চোখে একটু তন্দ্রা নেমেছিলো, কপালের উপর থেকে হাত সবিঘে বডো-বডো ক’বে তাকালো ।

‘শেষে একটা অস্ত্রখ বাধালে তো ? কী কাণ্ড । ডক্টর পাকডাশিকে খবর দিই একটা ।’

মানসী এবাব উঠে বসলো, অবাক হ’য়ে বললো ‘আপনি । এ ঘরে ?’

ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ কবলেও সহজভাবে হাসলো সোমেশ্বর, ‘কী কববো, বলো ? তোমাব অস্ত্রখ আব আমি শান্ত হ’য়ে বাইবের মাগুঘেব মতো বাইবেব ঘবে অপেক্ষায় থাকবো, তা পারবো না ।’

মানসী পায়ের উপর বেডকভারটা টেনে দিয়ে বললো, ‘বসুন ।’

খুশি হ’লো সোমেশ্বর । সামনেব চেযাবটা টেনে নিয়ে ব’সে ঘবেব চাবদিকে তাকালো । এ-ঘর সে নতুন দেখছে । মোটা শরীবে এ-ভাবে এই মেঘেলি অপরিচয় চেযাবটিতে বসতে তাব বীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো । হালকা কচুবিফুল-ব’ এইমাত্র-ভেঙে-প’রে-আসা বেয়নেব পাংলুনে ক্রীজ পড়লো । দেহেব স্ফীতিতে ফাটো-ফাটো কবতে লাগলো ওপবেব পা দুটো, নাইলনের স্বচ্ছ শাট ভিজে উঠলো ঘামে । বৃকের বোতামটা খুলে দিতে-দিতে বললো, ‘কখন থেকে হ’লো ?’

‘কী ?’

‘জ্বর ।’

‘কই, জ্বর না তো ।’

‘তোমার মা বললেন যে ।’

‘তিনিই বোধহয় আপনাকে এ ঘবে পাঁঠিয়ে দিয়েছেন ?’

‘তোমার ঘবে আমি আসবো তাব জন্ত কি আব কারো পারমিশন লাগে ?’ হা হা ক’নে হাসলো সোমেশ্বর । তাবপব বললো, ‘ঠিকই ধবেছে ।। উনিই বললেন, “দ্বীব কাছে তাব স্বামী যাবে, এজন্তে আবার অত কৰ্মালিটির কী দরকাব ?” কেন, বাগ কবলে নাকি ?’

‘চলুন , বসবাব ঘবে যাই ।’

‘না, না, বেশ নিচ্ছিলে, তাই না ও । মাথা টাখা ধবে নি তো ?’

‘সামান্জ ।’

‘মাথা ধবেছে ?’ সোমেশ্বর ব’সে-ব’সেই চেযাবটা ঘমটে এগিয়ে নিয়ে এলো সামনে, ‘শোও তো, শুয়ে পড়ো তো ।’

‘কেন ?’

‘এখনি আমি সাবিয়ে দিচ্ছি ।’

‘আপনিই সাববে ।’ খোলা চুল হাতে জডালো মানসী, ‘আপনার বোধহয় এখানে বসতে অস্ববিধে হচ্ছে ।’

‘মোটোও না, নট অ্যাটল । বরং এই নিবিবিলি নির্জন ঘরটিতে, জানালা-বন্ধ পর্দা-ফেলা ঠাণ্ডা অন্ধকারে শুধু তুমি আব আমি— ত্যাখে মণি, এখানে এসে থেকেই আমার কী মনে হচ্ছে জানো ?’

মানসী পায়ের ধাক্কায বেডকভারটা সবিযে নেমে দাঁড়িয়ে বললো, ‘চলুন ।’

‘কোথায় ?’ সব উচ্ছ্বাস এক নিমেষে যেন থমকে দিলো মানসী ।

‘বসবার ঘরে ।’

‘কেন ? এখানে তো বেশ । আমার সত্যি কোনো কষ্ট হচ্ছে না
বসতে ।’

‘আমার হচ্ছে ।’

‘আঁ,’ অপ্রতিভ হ’লো সোমেশ্বর, ‘আমার জ্ঞে ?’

‘না না, তা কেন ?’ মানসী ভদ্রভাবে হাসলো, ‘বিছানায় থাকলেই
ভানি অস্থখ অস্থখ মনে হয় কিনা ।’

‘ও, সোমেশ্বরব আশ্বস্ত হ’লো, ‘তাহ’লে চলো । কিন্তু একটা কথা ।’

‘বলুন ।’ পর্দা সবিয়ে ঘরের বাইবে পা দিলো মানসী ।

সোমেশ্বর তাকে অন্তসবণ কবতে-কবতে বললো, ‘একটু বেকতে হবে
আমাব সঙ্গে ।’

‘কোথায় ?’

‘সে তুমি তখুনি জানবে ।’

‘আজ আমার বেকনো হবে না ।’

‘আজ থাক ।’ নিজে থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো মানসীর ।

সোমেশ্বর পেছন থেকে আস্তে তাব পিঠে হাত ছোঁয়ালো, ‘আজই
যে যেতে হবে ।’

‘এমন কি জরুরি কাজ ?’

‘ভীষণ জরুরি ।’ চোখ টিপে হাসলো সে, ‘কালকে আমরা যে-জীবনে
প্রবেশ কবতে যাচ্ছি, আজকেব এই যুগলযাত্রা হবে তাবই একটি বিশেষ
অংশ ।’

মানসী মুহূর্ত কয়েক চূপ ক’বে থাকলো, তাবপব বললো, ‘আমাব
ভালো লাগছে না ।’

‘কী ভালো লাগছে না?’

‘কিছুই না।’

‘কবে তোমার ভালো লাগবে বলতে পারো?’ সোমেশ্বরের গলা এলাব ভাবি শোনালো।

মানসী ব ঠোটে ছোট্টো হাসি ফুটলো, ‘লাগবেই একদিন।’

‘আসল কথা, আমার সঙ্গে কোথা ও একা বেরুতেই তোমার আপত্তি। সত্যি কিনা বলো।’

‘তাকেন। একা কি কখনো বেরুই নি আর তাছাড়া আমার আবার দু জন কে আছে?’

‘মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ কী, সবই আমি বুঝি।’ বসবার ঘণে এসে বড়ো সোফাটার উপর নিজেবে গুস্ত কবলো সোমেশ্বর, ‘শুধু এটুকুই বঝতে পারছি না তোমার বিবাগভাজন হবার মতো এই বাতটুকু নাথ্যই আমি আবার কী অপবাধ করলাম।’

মানসী ব্যস্ত হ’লো একটু, গলাব স্বর যথাসম্ভব কোমল ক’রে বললো, ‘আপনি তো দেখছেন, আমার শরীর আজ ভালো না, তাই বলচিলাম—’

‘তা অবিশি বলতে পারো, কিন্তু আমি তো তোমাকে আব এখনি যেতে বলছি না।’

‘বেশ তো, বিকেলে না-হয় যাবো।’

এবার সোমেশ্বর রাগ ভুলে একটু হাসলো, ‘আজ একটা সারপ্রাইজ দেবো তোমাকে।’

‘তা তো আপনি রোজই দিচ্ছেন।’

‘রোজের কথা জানিনে, কিন্তু এটা স্মান্দাজ করো তো।’

‘আমার বুদ্ধি ততো প্রথর নয়। আপনিই বলুন না।’ স্মানমুখে হাসলো মানসী।

বহু ক'রেও আর দেবি ববতে পারলো না সোমেশ্বর, তাড়াতাড়ি বনলো, 'কাল সকালে আমাদের বেজিষ্টি হচ্ছে ।'

'বেজিষ্টি । কাল সকালে ।'

হাসলো সোমেশ্বর, 'এ তো ববাববই ঠিক । কেবল স্থগের দিনগুলোকে আব একটু এগিয়ে আনা গেলো, এই যা ।' একটু থেমে : 'ভালোই হ'লো, কী বলো ? কাল তো এমনিতেই আয়োজন হ'ছিলো তাব সঙ্গ এই উৎসবটিও জুড়ে দেওয়া গেলো ।' সোমেশ্বরের মোটা গালে গভীর গত হ'লো হাসতে গিয়ে । পকেট থেকে পাইপ বেব ক'বে ধবতে ধবতে বনলো, 'আসলে বেডালের ভাগ্যে শিকে ছি ডেছে, বুঝলে ? বেজিষ্টাব শিশিব আচার্য কলকাতাব বাইবে যাচ্ছেন মাসখানেকেব জন্ত, কাল দিন ভালো, বেজিষ্টিটা সেবে যেতে চান আব কি । তোমাব মা জানেন । এবাব তোমাব মুখেব কথাটি খস্ক, অভাগা ধন্ত হোক ।'

মানসীব গলা অনেক দব থেকে ভেসে এলো, 'কাল ।'

'সকালে বেজিষ্টিটা হ'য়ে থাক, বিকেলে যেমন একটা নিমন্ত্রণেব ব্যাপাব ছিলো তেমনি থাক । তোমাব মা তো তোমার জন্মদিনটাকে উপলক্ষ ক'বে আসলে আমাদের বিয়ের খববটাই জানাচ্ছিলেন সকলকে । একমুখ ধোয়া ছাডলো সোমেশ্বর, 'আমি দু জন বিপোট্টারকেও খবব দিযেছি, ফোটো গ্রাফারকে বলেছি, আর—'

'কাল । কালই ?'

'আহা, কাল না হোক পবন্ত, তবন্ত কি তাব পবেব দিন, এ-মাসেব মধ্যেই তো হ'তো ? সেটা বেজিষ্টাবেব দযায কালই হ'সে গেলো বাস্তবিক শিশিবাবকে সেজন্ত অজন্ত ধন্তবাদ দেওয়া উচিত ।'

'না, না,' মানসীব বেদনা যেন আতনাদ ক'বে উঠলো ।

অবাক হ'লো সোমেশ্বর । ভুক কুঁচকে বনলো, 'কেন ?'

‘আমাকে তো বলেন নি আগে ।’

‘কী আশ্চর্য ! এ তো তুমি জানোই ।’

মানসী অবোধেব মতো বললো, ‘কী জানি ?’

কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের রেজিস্ট্রি হবে তা তুমি জানো না ?’

‘জানি ।’

‘তবে ?’

‘কিন্তু কাল ব’লে তো জানি না ।’

‘নাই বা জানলে, তাতে কী হয়েছে ?’

‘আমাব যে বন্ধে যাবার কথা আছে ।’

‘বেশ তো । বিষের পরে যাবে ।’

‘বিয়ের পরে ?’

‘ওটা আমাদের হানিমুন হবে ।’

একটু চুপ ক’রে থেকে সংসা মানসী অন্তরনে ভেঙে পড়লো, ‘আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দিন ।’

এবার জমিদারি মেজাজ চিড গেলো সোমেশ্বরের । আত্মদমন করতে থুংনি আর গলার মাঝখানকার নরম মাংসগুলো মোটা হ’য়ে ঝুলে পড়লো । অনেকক্ষণ শব্দ বের করতে পাবলো না মুখ দিয়ে । কিন্তু এই মেয়েকে পেতে হ’লে তার যে আরো থানিক ধৈর্যের প্রয়োজন, সে-কথাটাই মনে-মনে আরো অনেকবারের মতো এবারেও মনে নিতে হ’লো তাকে । বললো, ‘আরো ভাববে ? এক বছরেও ভাবনা তোমার শেষ হ’লো না ?’

অস্থির মানসী ন’ড়ে-চ’ড়ে উঠলো, ‘না, না, ভাবনা-টাবনা কিছু নয়, সব ঠিক । কেবল আর কয়েকদিন সময় দিন দয়া ক’রে ।’

সোমেশ্বর স্থির হ’য়ে ব’সে রইলো । ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত কোনে।

শব্দ বইলো না। মাথার উপরকাব ক্ল্যাটে অসময়ে কযলা ভাঙার আওয়াজটা বডো হ'য়ে কানে লাগলো, খাবার ঘব থেকে নন্দর মা র গলা স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো, রান্নাঘর থেকে নবলক্ষ্মীব হাতা-খুস্তিব ছ্যাকছ্যাক অসহ মনে হ'লো। ছোকবা চাকব ঘবেব মধ্যে দিষে বেরিষে গেলো কী আনতে। জানালাব ফাঁকে শিক গ'লে কল-টানা বোদ ডোবা কাটলো লাল-সবুজ কার্পেটের উপব। মানসীব বেডালটা পর্দার তলা দিষে ঘরেব মধ্যে এসে চুপ ক'বে দাঁড়ালো একটু, নীল চোখ তুলে তাকালো এদিক-ওদিক, তাবপর আলস্ত্রে এলানো সেই ডোবা-কাটা বোদে নবম ক'রে গা টেলে দিষে থাবা চাটতে লাগলো নিঃশব্দে।

‘ঠিক ক'বে বলতে পাবো, মানসী,’ সোমেশ্বর সেদিকে তাকিষে ভাবি গলায় বললো, ‘সত্যি তোমাব সময় কখনোই হবে কিনা।’

‘আমি— আমি তো—’

‘কোনো কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না, শুধু দয়া ক'বে বলে।—’

ননীবালা ঘবে ঢুকলেন। বেরুবাৰ জন্ত একেবারে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছেন। দামি পাডহীন গবদেব শাড়িতে, সোনালি বং মুগার ব্লাউজে, বাছবেব চামডাব শাদা জুতোতে, হাতের শাদা সিল্কেব বটুযাতে সহসা তাঁকে নিজেব মা ব'লেই চিনতে পাবলো না মানসী। মাথাব কাঁচাপাক। চুল সুন্দব ফোলানো ফাঁপানো। মুখে পাংলা পাউডাবেব প্রলেপ। নবম গলায় বললেন, ‘তাহ'লে আমি তোমাব গাডিটা নিষে বেরুই একটু।’

‘নিশ্চয়ই।’ সোমেশ্বর তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো সোফা থেকে। মানসী লক্ষ্য কবলো, মা আজকে সোমেশ্বরকে ‘তুমি’ বলছেন।

‘সময় তো নেই, যা বলা-কওয়া জোগাড-যন্ত্র এটুকু সময়ের মধ্যেই তো—’ মাথা নাডলেন ননীবালা।

‘সে তো ঠিকই। গাঙ্গীষ ছেড়ে মুহূর্তে সোমেশ্বর গদগদহাস্তে ঘাড় কাৎ করলো।

‘তাহ’লে তোমবা দু-জনে মিলে কালকে সকালের ব্যাপারটা ঠিক করে নাও।’

‘হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। আপনি তো বোধহয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবেন।’

‘আর কত। কেন, অসুবিধে হবে তোমাব?’

‘না, না, অসুবিধে কী! একে নিয়ে একটু বেরবো ভাবছিলাম, তা এব তো শরীর ভালো না—’

‘বেরুনো কি জরুরি দরকাব?’

‘এই কিছু কিনবো-টিনবো আর কি। মেয়েদের জিনিস, মেয়েরা সঙ্গে থাকলে ভালো।’

‘তা যাবে’খন। শরীর কি আর শাবাদিন খারাপ থাকবে। বিকেলে গলেই হবে। আচ্ছা, আসি—’ কাপড়ের ভাঁজে-ভাঁজে ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেলেন ননীবালা।

মানসী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। দরজার ভারি পর্দাটা একটু ন’ড়েই স্থির হ’য়ে গেলো। একটু সময় ব’য়ে যেতে দিয়ে সোমেশ্বর বললো, ‘আমার কথার জবাব দাও।’

‘কী?’

‘তুমি কি আমার সঙ্গে কোঁতুক করছে। এতোদিন ধ’রে?’

‘কোঁতুক!’

‘তবে একে কী বলে? এতোদিন সব ঠিক, হঠাৎ আজ তোমার মতি বদলালে তাকে আর এ-ছাড়া কী ভাবতে পারি।’

মানসী জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

‘কিছু বলছো না কেন ?’

‘কী বলবো ?’

‘তোমার ইচ্ছেটা কী ?’ সহসা সোমেশ্বর তাব অত বড়ো শবীবদ্দ
নিষে, ঝাঁটো স্ফুট নিষে, হাঁটু ভেঙে ব’সে পড়লো মানসীর পায়েব কাছে
‘দয়া ক’রে বলো, বলো, কী তোমাব ইচ্ছে, কী তুমি চাও ।’

বুকেব ভেতবটা কেমন কবলো মানসীর । সোমেশ্ববেব ব্যাকুলতা দেপে,
না কি নিজেবই মনেব কোনো গহন বেদনায, কে জানে । দুটি চোপ তাব
আপনা থেকেই বুজ গেলো । মনেব সঙ্গে একটা বোঝাপড়াব ঝাপটানি
চললো খানিকক্ষণ, তাবপন যন্ত্রণাব মতো অধীব গলায বললো, ‘কিছুই
চাই না, আমাব আব কিছুই নেই চাইবাব, কেবল আব একটু সময়—’

‘ক’দিন ?’

‘যে-ক’দিন পারেন ।’

‘তোমাকে তো বললাম শিশিববার চ’লে যাবেন পবশু বাত্রে । কাল
বাদ দিলেও পবশু তো বাদ দেওয়া যাবে না ।’

‘পবশু ?’

‘পবশু সকালে হোক ।’

‘পবশু সকালে ?’

‘তখনো কি আপত্তি কববে তুমি ?’

‘আপত্তি । না, আপত্তি কী ।’ মানসীব ছুটফটানি যেন হঠাৎ শাও
হ’য়ে গেলো । যেন ঝাপ দিলো জলে, ‘তবে তাই হোক । কালই হোক ।

‘কাল । বলছে তুমি ? তাহ’লে ঠিক কবিস সব ?’ উঠে বসলো সোমেশ্বর ।

দূরে দৃষ্টি ভাসিয়ে মানসী বললো, ‘যদি এই মুহূর্তে সম্ভব হ’তো তা’তও
আমার আপত্তি ছিলো না, মিস্টার বাগচি ।’

‘ঐ । তাই বলো । এতোক্ষণ তবে আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছিলো ।’

মানসী এবার একটু হাসলো।

‘ও মাই প্রেশাস্, মাই ডার্লিং,’ আবেগে অস্থির হ’য়ে সোমেশ্বর নিজের পরিপুষ্ট মোটা নরম হাতে জড়িয়ে ধরলো মানসীর দুই হাত, ‘এতোদিনে তবে আমার প্রতীক্ষার সত্যি অবসান হ’লো?’

ক্লান্ত দুর্বল ভঙ্গিতে মাথাটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে মানসী প্রায় ধুকতে-কতে বললো, ‘এই অসহ্য অবস্থা আমারও অবসান হোক।’

‘কী?’ সঙ্গে-সঙ্গে ভুরু কুঁচকোলো সোমেশ্বর।

মানসী বললো, ‘আমারও প্রতীক্ষার অবসান হ’লো।’

এর পরে-সোমেশ্বরের ভালোবাসা আর বাঁধ মানলো না। আরো আপন হ’য়ে, নিবিড় হ’য়ে সে কাছে এলো, মুখ নিচু করলো মুখের উপর। আতঙ্কিত হ’য়ে স’রে যাচ্ছিলো মানসী, কিন্তু মুহূ হেসে সোমেশ্বর তাকে জোর ক’রে টেনে নিলো, বললো, ‘অনেক দিন তো কষ্ট দিয়েছো, এখনো কি দূরেই থাকবে?’

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ফিরে এলেন ননীবালা।

ভাবী জামাইয়ের গাড়িতে চ’ড়ে কয়েকটা জরুরি দরকারের সঙ্গে-সঙ্গে মানসার দু-চারজন বড়োলোক বন্ধুর বাড়িতেও স্বখবরটা জানিয়ে এলেন। অহংকার তৃপ্ত হ’লো, শক্ররা আহত হ’লো। তবু সেই ভরা-স্বখের মধ্যেও বুকটা যেন হঠাৎ-হঠাৎ কেঁপে উঠতে লাগলো তাঁর। যতবার মানসীর আজ সকালবেলাকার মুখটা ভাবলেন ততোবার একটা ভয় ঘিরে ধরলো তাঁকে। মেয়ে তাঁর, মেয়ের মনের ছবি তাঁর নখদর্পণে। এই মুখের চেহারা তো অচেনা নয়। তিন বছর আগেও তিনি অহো-বাত্র এই চেহারাতেই দেখেছেন মানসীকে। মান, সম্মান, অর্থ, খ্যাতি, কিছুতেই যেন কিছু এসে যেতো না। একটা শুকনো, নিশ্চাঁপ, নীরস

যন্ত্র মাত্র। যখন যে যেখানে গাইতে বলছে, গাইছে, টাকা দিলে নিচ্ছে, না-দিলে তাকিয়ে দেখছে না, আজ গ্রামোফোন, কাল রেডিও, পরশু সিনেমার প্লে-ব্যাক, দিনরাত তার রিহার্সেল, দিনরাত তার হৈ-হল্লা হট্টগোল, দিনবাত ঐ একটি গলা দিয়ে সব। ছুটোছুটি করেছে, প্র্যাক্টিস করেছে, অগ্নের বাড়িতে টিউশনিতে গেছে, নিজের বাড়িতে ক্লাশ নিয়েছে, নিজে শিখেছে,— এক মুহূর্ত্ত বিবাম নেই, বিশ্রাম নেই, যেন এই-ই চেয়েছে সারাদিন, আব সারাদিনের পরে একা হওয়া মাত্রই নিবে গেছে আলো, ম'রে গেছে মানুষটা, সত্তা শোকে আচ্ছন্ন বিধবাব যন্ত্রণা নিয়ে নিখুম হ'য়ে থেকেছে।

একমাত্র মানুষ মাস্টারমশায়। শুধু মাস্টারমশায়কে দেখলেই হাসি ফুটেছে মুখে, কথা বেরিয়েছে ঠোঁট ফাঁক হ'য়ে। আদিখ্যেতার অন্ত দেখেন নি ননীবালা। সমস্ত মনপ্রাণ যেন সমর্পণ ক'রে দিয়েছে মাস্টার-মশায়ের কাছে। মাস্টারমশায়ের কথাই কথা, মাস্টারমশায়ের ইচ্ছাই ইচ্ছা। এক-এক সময় ননীবালা বীতিমতো সন্দেহই করেছেন, বীতিমতো খারাপ লেগেছে। না-হয় মাস্টারমশায়ের সাহায্য সে পেয়েইছিলো একদিন। গুণ ছিলো ব'লেই তো পেয়েছিলো? এ তো আর ছাঁটকাটের জিনিস নয় যে মাস্টারমশায় তৈরি ক'রে দিয়েছেন, এ হচ্ছে ভগবানব দান। গলা না-থাকলে তো আর মাস্টারমশায়ের চেষ্টায় এতো লোক এমন মুগ্ধ হ'তো না। গ্রামোফোনের রেকর্ডই বলো, রেডিওর গানই বলো, আর সিনেমার প্লে-ব্যাকই বলো, এ-সব থেকে যে এতো টাকা উপার্জন করেছে আব করছে, তা তো ওর নিজের যোগ্যতাতেই? তাই নিয়ে মাস্টারের সঙ্গে এতো বাড়াবাড়ি করবার কী ছিলো ভেবে পান নি তিনি। আর মরবার আগে কী ভোগান্তিটাইনা ভুগিয়ে গেলো লোকটা, কী অর্থদণ্ডই না হ'লো।

কিন্তু ব্যাধি তো সেরেছিলো এতোদিনে, দিব্যি তো হাসিখুশি হ'য়ে উঠেছিলো, রাধানগরের ছুঃখপ্লের দিনগুলো ভুলে গিয়ে গানে-গল্পে একটা স্বাভাবিক মাস্তুলের মতোই তো বাস করছিলো, কিন্তু সত্যিই কি নির্মলকে হুলতে পেরেছে টুনি ? মনের কোথায় যেন কামড় পড়লো একটু, ব্যথাব মতো চমকে উঠলো স্মৃতি । নির্মলকে মনে ক'বে আজ একটু আনমনা খেলেন ননীবালা । নিজেব স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়া ছাড়া তখন আর কোনো কাবণেই তো এই ছেলেকে ভাবেন নি, কিন্তু আজ তো কোনো স্বার্থ নেই, আজ নির্মলকে তিনি ভালোবেসেই ভাবলেন, সন্তানের মতো ক'রেই ভাবলেন । স্বভাবের সৎকীর্তা ডিঙিয়ে নির্মল আজ তাঁর হৃদয়ের দরজায় আঘাত কবলো ।

কিন্তু বাজে চিন্তা বেশিক্ষণ ধ'বে বাখতে পাবলো না তাঁকে, যে-চিন্তা আজ তিনি সাবা সকাল বহন কবেছেন মেয়ের মুখেব দিকে তাকিয়ে, গাড়িতে ঘূবতে-ঘূবতে কালকের উৎসবের আয়োজন করতে-কবতে যে-ভাবনা তাঁকে আতঙ্কিত কবেছে, সেই ভাবনাতেই জর্জবিত হলেন আবাব ।

কে জানে, মেয়েব মত হ'লো কি না, না কি বেঁকে বসলো ? না জিগ্যেস ক'বে হয়তো এতোটা অগ্রসব হওয়া উচিত হ'লো না—এখানে আহত দর্পে ঘা লাগলো ননীবালার । নিজের কথাব নিজেই জবাব দিলেন : জিগ্যেস আবাব কী ? আমি ওর মা, ওব গুরুজন, পেটে তো আমিই ধবেছিলাম, দশমাস দশদিন গর্ভযজ্ঞণা তো আমিই ভোগ করেছিলাম, আব আমারই কোনো অবিকাব থাকবে না কিছু করবাব ? না, সেটা হবে না । যতদিন বেঁচে আছি, মানতেই হবে আমার কথা, না-মানলে আমিই বা ছাড়বো কেন ? আর তাছাড়া তাঁব সপক্ষে আছে সোমেখর । সোমেখরের শক্তিকে তিনি সত্যিই তারিফ করেন । এই ক'বছরের নতুন

জীবনে, নতুন জগতের খবর কিছু তো কম পেলেন না। আরো কত লোক এলো, গেলো, দু-দিন চাবদিন এগুলো পিছোলো, তারপরেই ফুস্। কিন্তু লেগে রইলো এই সোমেশ্বরই শুধু। ননীবালা তার ভাগ্যেই রইলো, ননীবালা যা চেয়েছিলেন, যতখানি চেয়েছিলেন ঠিক ততখানি পূরণ কবাব জগতই এই সোমেশ্বরকে এতো ধৈর্য দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ঈশ্বর। সোমেশ্বর ছাড়া সোমেশ্বরের জুড়ি কি আর একটা পাত্রও আছে এই বাংলা দেশে, যাকে জামাই কবতে ননীবালা এতোখানি উদ্বোধনী হ'য়ে উঠতে পারতেন ?

ধীর মন্থর গতিতে শি ডিতে পা ফেলে ফেলে তিনি ঘরে ঢুকলেন, আর ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। সোমেশ্বর একা ব'সে আছে, একটা বইয়ের পাতা উন্টোচ্ছে ব'সে-ব'সে।

একা কেন ? একা হবাব যে-স্বযোগ তিনি দিয়ে গেলেন তা কি একজনের একা হওয়া ?

‘তুনি— মানে মানসী— মানসী কোথায় ?’

ননীবালা যে কখন ঘবে ঢুকেছেন খেয়াল করে নি সোমেশ্বর, তাড়াতাড়ি এলানো থেকে সোজা হ'য়ে বসলো, উৎসাহভাবে বললো, ‘হ'লো, কিছু কাজ কি এগুলো ?’

‘তা এগুলো, কিন্তু তুমি যে একা ব'সে রয়েছে ?’

‘ও একটু মুখ-হাত ধুতে গেছে, বলছিলো বড্ডো মাথা ঘুরছে, তাই—’

‘ও,’ আশ্বস্ত হলেন ননীবালা, ‘কথাবার্তা সব হ'লো তোমাদের ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহ'লে কালকেব মধ্যেই হ'য়ে যেতে পারবে সব ?’

‘নিশ্চয়ই।’

ননীবালা উপচে পড়লেন খুশিতে। এতোদিনে তবে সত্যি তাঁর সব

মাধ পূর্ণ হ'লো ? জাতে উঠলেন । সমাজের একেবারে উঁচুস্তরে । একেবারে বাজার ঘরে ঠাই মিললো ? আনন্দের আবেগে যেন থইথই করলেন নিজের মধ্যে, নিজের ঘরের মঙ্গল মেঝের শাদা সিমেন্টে দাঁড়িয়ে ।

এই ফাস্তুন মাসেই কী গরম পড়েছে কলকাতা শহরে । বাব্বা ! পাথার স্পীডটা শাঁ ক'রে বাড়িয়ে দিলেন । এদিকের দরজায় এসে থামকাই একটা ধমক দিলেন নন্দর মাকে, ছোকরা চাকরটাকে ডেকে অকারণে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বেডালটাকে ম্যাও-ম্যাও করতে শুনে পা দিয়ে ঠেলে ছিটকে দিলেন ও-পিঠে, জানালার মাথায় ব'সে যে-কাকটা দূরত চোখে তাকিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে-দেখতে গান ধরেছিলো, হস্-হস্ ক'রে মুহূর্তে তাড়িয়ে দিলেন তাকে, একবার রান্নাঘরে এলেন, খাবার ঘরের টেবিলের চাদরটা টান করতে লাগলেন— হাতে-পায়ে যেন বেগ নেমেছে একটা, ভেবে পাচ্ছেন না কী করবেন । শেষে অনেক পরে, অনেক চেষ্টায় শান্ত হ'য়ে এ-ঘরে এসে বসলেন । শাউড়িস্থলত সন্নেহ গান্ধীয়ে বললেন, 'তাহ'লে আজ রাত্রেই একটা ঘরোয়া পার্টি করি, দু-চারজন আত্মক, একটু থাওয়া-দাওয়া গান-বাজনা হোক, তোমার আশীর্বাদটাও সেই সঙ্গে হ'য়ে যাক ।' হাসলেন একটু, 'অবিশি তোমাকে আশীর্বাদ করতে আমার তোমার বাড়িতেই যাওয়া উচিত, কিন্তু আমার কী ততো ক্ষমতা আছে ? তোমার মতো যোগ্য জামাইকে উপযুক্তভাবে বরণ করতে যাবো, এমন শক্তি আমার নেই ।'

'কী আশ্চর্য !' বিগলিত সোমেশ্বর বিনীত হাস্তে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো, 'আমার বাড়ি আপনার বাড়িতে কি আজ আর কোনো তফাৎ আছে ? যখন খুশি যাবেন, যেমন ক'রে খুশি যাবেন । কিন্তু আমি তো জানেন, লক্ষীছাড়া গোবিন্দ । বাড়ি আমার শূন্য । একমাত্র বিবিই আমার সঙ্গী ।'

বিবি হচ্ছে সোমেশ্বরের অ্যালসেশিয়ান কুকুরের নাম । কুকুব

ননীবালার চক্ষুশূল, কিন্তু তাই ব'লে কি এই কুকুব? বিবির উপর সোমেশ্বরবাব টান তো তিনি জানেন। কতদিন নিয়ে এসেছে সঙ্গে ক'বে দেপে হাত-পা হিম হ'য়ে এসেছে, তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন তিনি, চেষ্টা কবেছেন গায়ে হাত দিতে, তাবপর বাথরুমে গিয়ে হুস্‌হুস্‌ ক'বে স্নান কবেছেন।

এ কথা শুনে একগাল হেসে বললেন, 'তোমাব বিবিকে এবাব আমিহ এনে রাখবো। আমাব মেয়ে তোমার বাড়ি যাব আর তোমাব মেয়ে আমাব বাড়ি আসবে, কী বলা?'

উচ্চকণ্ঠে হাসলো সোমেশ্বর, ননীবালাও গলা মিলোলেন।

'তাহ'লে তা-ই ঠিক কবি, কী বলা?'

যাবাব জন্তো উঠে দাঁড়িয়ে সোমেশ্বর বললো, 'এ বিষয়ে আব আমাব কী বলবাব থাকতে পাবে? আপনি ঐ ঠিক কববেন তা ই হবে। তাব আশীর্বাদতো আপনাব সাবাদিনই পাচ্ছি, তাব জন্ত আবাব আলাদা-

'তাতো পাছোই—' ননীবালাব দুই চোখে আদব ক'রে পড়লো, 'তব তো আমার একটা সাধ আছে।'

'বেশ তো।'

'তাবপর কাল সকালে যেমন বেজিষ্টি হবাব হোক, বিকেলে যাবে যেমন নিমন্ত্রণ করেছি, তা ই থাক--'

'বেশ তো।'

'আব একটা কথাও ভাবছি—'

'বলুন।'

'সেই সঙ্গে একটা ছোটোখাটো অন্তষ্ঠানও করি।

'অন্তষ্ঠান।'

'মানে, একটুখানি শালগ্রাম-শিলা সাক্ষী ক'রে, পুঙ্ক ডেকে, হিন্দুমতে

বিয়ে আর কি । বুঝতেই তো পারো, আমরা সব সেকেলে মানুষ, বিয়ে বলতে তা-ই জানি, তা-ই দেখেছি, ও-সব না-হ'লে মনটা কেবল খুঁতখুঁত করে, তৃপ্তি হয় না ।’

সোমেশ্বরের হাসি বিস্তৃত হ'লো, ‘আপনার যাতে তৃপ্তি তাই করুন, এ নিয়ে আর এতো বলাবলি কিসের ?’

‘তোমরা আজকালকার ছেলে, হয়তো সে-সব মানো না, ভালো লাগে না, কিন্তু শুভদৃষ্টি না-হ'লে, মালাবদল না-হ'লে যেন বিয়েই মনে হয় না ।’

‘না, না, ও-সব অন্তর্ধান আমার খুব ভালো লাগে । ওতে আমি বিশ্বাসও করি ।’

‘এই তো, কথার মতো কথা । তুমিই বলো তো বাবা, কনে যদি লাল শাড়ি না পরে, ঘোমটা না দেয়, স্বামীর হাতেব উপর হাত রেখে মস্ত পাঠ না করে, তাহ'লে কি একটা গাঙ্গুরী আসে বিয়েতে ?’

‘তা তো ঠিকই । কিন্তু আমি বলছিলাম যে এ-সব হিন্দু বিয়ের ব্যাপারে তো অনেক খুঁটিনাটি, ঠাকুর পুরূং লাগে, লগ্ন তারিখের দরকান হয়, আর তাছাড়া—’

‘সে-সব তুমি ভেবো না । কাল আটই ফাল্গুন বিয়ের তারিখ আছে, লগ্নও খুব সুন্দর সময়ে, একেবারে সন্ধ্যা সাতটা । তাহ'লে সেই মতেই সব করি, কী বলো ?’

‘নিশ্চয়ই । আমাদের কী করতে হবে সেটা বলুন ।’

‘তোমার দিকে তো কোনো হাঙ্গামা নেই । আত্মীয়-পরিজনেরা একটু চন্দনের কঁোটা দিয়ে তুলে দেবেন, বিয়েতে আসবেন, খাবেন-দাবেন, ফুটি করবেন—’

‘তাহ'লে ষত ঝামেলা বুঝি মেয়ের পক্ষই পোহাবে ?’

‘তা পোহাবে না ? আর ঝামেলাই বা বলছে কেন ? আপনি জিনিস পরকে উৎসর্গ করার একটা আয়োজন তো নিশ্চয়ই থাকবে ? জীবনে কি এ একটা সোজা ঘটনা ।’

‘তা তো ঠিকই ।’

‘আর তোমবাও তো বউভাত করবে । সে তুমি যত জাঁকজমক ক’রেই করো না কেন, আপাদমস্তক হিবে-জহবত দিবে মুড়ে দাও না কেন, সেটা হ’লো তোমাদেব মান সম্মানের ব্যাপার ।’ এখানে সোমেশ্বরকে একটা ইঙ্গিত দিলেন ননীবালা ।

সোমেশ্বর খুশি হ’লো । জাঁকজমকের কথাটা ভালো লাগলো তার । আর তখুনি তাব মন জাঁকজমকের তালিকা বচনায ব্যাপৃত হ’য়ে উঠলো ।

‘কিন্তু বাবা, একটা কথা—’

‘বলুন ।’

‘একটু সাহায্য করতে হবে আমাকে ।’

‘কী সাহায্য ?’

‘এ-সব ব্যাপারে জনবল চাই, তুমি যদি সেটাও ভাব নাও—’

‘সে তো অতি সহজ কথা ।’

‘আর গাড়িটাও চাই একবেলার জন্ত ।’

‘আপনি এখুনি রেখে দিন না—’

‘আর তুমি ?’

‘আমাব লাগবে কিসে ? এখন একটা ট্যাক্সি ক’বে চ’লে যাবো, আর গিয়ে পড়লে আমাব গাড়িব অভাব হবে না । আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেরই তো গাড়ি আছে । দরকাব হয় নিষে নিলেই চলবে ।’

‘তাহ’লে তো খুবই ভালো কথা । মেয়েটাকে এই যে কতবাব বলি একটা গাড়ি কেন, তা সে কানে তোলে না ! কত স্থখে মাছুষ করেছে ।

বাপ বেঁচে থাকতে তো আদবের অভাব ছিলো না। ‘না-হয় শহরে না-ই থাকতুম, গ্রামে আমরা মানে-সম্মানেই ছিলাম। সেখানে দত্তমল্লিকদের প্রতিপত্তি তো বড়ো কম ছিলো না। বংশমর্যাদায়ও খাটো নয়। ওর বাপ মারা গেলেন পরে এই গান-গান ক’রেই আমাদের কলকাতা আসা। গ্রামে কি সে-সব হয়? না কি গ্রামেব লৌকিকদের সঙ্গে কোনো শিক্ষিত লোক থাকতে পারে?’

‘তা তো ঠিকই।’

‘আর এলাম ব’লেই না তোমার মতো দেবতুল্য মানুষের হাতে আজ মেয়েটিকে তুলে দিতে পারছি।’

‘কী যে বলেন! আপনার মেয়েকে পেয়েই আমি নিজেকে ধন্য মনে কবছি।’

‘অবিশিষ্ট এ-কথাও আমি তোমাকে বলবো, মেয়ে আমার বড়ো শাদা-সিঁধে, বড়ো ভালোমানুষ, এ-বকমটি তুমি সচবাচর পাবে না।’


সোমেশ্বর শব্দ ক’রে হাসলো, ‘সে-কথা আমি জানি না? জানি ব’লেই তো হাত পেতে আছি এতোদিন ধ’রে। যাক গে, আপনি আমাকে যদি একটা ট্যান্ডি আনিবে দেন খুব ভালো হয়। গাড়িটা থাক, ওটা আপনি যেমন খুশি ব্যবহার করুন, ও তো আপনার মেয়েরই।’ সলজ্জ কুণ্ডায় সে যুবকোচিত ভঙ্গি করলো। হাতের প্যাটিনামের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সহসা ব্যস্ত-সমস্ত হ’য়ে বললো, ‘এখনি আমার যাওয়া দরকার, ওদিকেও কিছু ব্যবস্থা আছে।’

‘তুমি এক কাজ করো— ‘আপন হ’য়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন ননীবালা, ‘গাড়িটা এখন বরং তুমি নিয়েই যাও, আমি ততোক্ষণে এদিকে একটু ওড়িয়ে নিই, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলে তখন আমি অল্প কাজে বেরুবো।’

‘বেশ।’

‘আর সেই সঙ্গে তোমার দু-একজন বয়-বেয়ারা, আর সেই ছেলেরা, যে তোমার লেখাপড়ার কাজ ক’রে দেয়, তাদের যদি একটু পাঠিয়ে দাও—’

‘ঠিক আছে।’

‘কিছু মনে করছো না তো? জন বলতে তুমি ছাড়া আর  আছে আমার এখানে।’

‘আশ্চর্য। এ নিয়ে আপনি অত ভাবছেন কেন? আব কী কবতে হবে তাই বলুন।’

‘আচ্ছা, একদিনেব মধ্যে কিছু কার্ড ছাপানো কি সম্ভব?’

‘কেন নয়? ডবল চার্জ দিয়ে কবিয়ে নিলেই হবে। বিয়ের নিমন্ত্রণ তো?’

‘হ্যাঁ। একটু স্কন্দ-টন্দব ক’বে, এখনকাব ফ্যাশানে—’

‘কাল দুপুরের মধ্যে পেলে চলবে?’

‘দুপুরেব মধ্যে পেলেই চলবে। তক্ষুনি গাড়ি ক’রে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কেউ গিয়ে দিয়ে আসবে। বড়ো নেমন্ত্রণগুলো আমি আজই মুখে-মুখে সেবে আসবো। চিঠি দেওয়া বিয়েব একটা চিবাচবিত রীতি, এই আব কি।’

‘আপনাব নামেই ছাপা হবে তো?’

‘ননীবালা মিষ্টি ক’বে হাসলেন।’

সোমেশ্বর চ’লে গেলে আকাশে পাখা মুড়ে ভেসে-থাকা পাখিব মতো কতক্ষণ ঝিম ধ’রে বইলেন ননীবালা। যেন কিছু ভাববার রইলো না, করবার বইলো না, কেবল স্থখ, স্থখ, আর স্থখ।

দেখতে-দেখতে বেলা বেড়ে উঠছে, দেয়ালের বড়ো ঘড়িতে টংটং ক’রে বারোটা বাজলো। আজ ননীবালাব একাদশী, তাড়াতাড়ি স্নান

ক'রে জাড়াতাড়ি বড়ো বাটির একবাটি দুধ গরম ক'রে খেয়ে নিলেন, কলা খেলেন, মীটসেফ থেকে দু'খানা সন্দেশ বের ক'রে খেলেন, খাঁন কয়েক বিস্কুটও খেলেন সেই সঙ্গে । তারপর গোটা কয়েক কমলা ব্যাগের মধ্যে ভ'রে নিয়ে প্রস্তুত হলেন বেরবার জন্ত । আজ তিনি ভাত খান না, দুপুরে জন্মে ঘি-মাখানো পাতলা আটার রুটি তৈরি হয়েছে, লাউ-পাতার ঝোল, ছানার ডালনা, ডাল-পাতুরি, এ-সবও হয়েছে । কিন্তু এখন ব'সে সে-সব খাওয়ার সময় কই ? আর খেলেই শুতে ইচ্ছে করে, দুটো-আড়াইটের মধ্যে ফিরে এসে তখন ধীবে-ধীরে হবেন খন সে-সব ।

নবলক্ষ্মী খেয়ে যেতে বলেছিলো ব'লেই এ-সব বললেন । বললেন. 'আজ একাদশী হ'য়ে আমার বরং সুবিধেই হ'লো, বুঝলি না ? আজ তো আর খাওয়া-দাওয়াব হান্ধামা নেই, দিব্যি হালকা হ'য়ে ঘোরাঘুরি করতে পারবো ।'

নবলক্ষ্মী মুখ নিচু ক'রে মাথা নাড়লো ।

'একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো বড়ো কম কথা নয় ? আর এমন হুট ক'রে "ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে ।" অবিশি গয়নাগাঁটি সব আমি আগেই বানিয়ে রেখেছিলাম, কাপড়-চোপড়, তা-ও কিছু কম নেই । আর আমার দেবার আছেই বা কী ? আমি হলাম নেহাৎ একটা ইয়ে মানুষ, রাজ-রাজ্জীর ঘরে মেয়ে দিলে নিজের দেবার কিছু থাকে কি ? ছাথ গিয়ে, এদিক থেকে এই যে আমি এতো সোনা-দানা দিচ্ছি, ও তো সমুদ্রে শিশিরবিন্দু মাত্র । ওরা দেবে মন-মন সোনা, আর সেখানে আমি দিচ্ছি কয়েক ভরি মাত্র । অবিশি এ-কথা বলতে পারিস, আমার মতো ক'জন বাপ মা-ই বা এতো দিতে পারে, আর পারলেও প্রাণে ধ'রে দেয়, সেটা সত্যি কথা । কিন্তু কী করবো বল ? মন তো মানো না । একটা মাত্র মেয়ে, যথাসর্বস্ব দিয়েও যেন আশ মেটে না । এই তো চলেছি

বেনারসি কিনতে, তারপর জামাইয়ের জুতাও লাগবে কিছু, কত টাকা নিয়েছি জাপ—’ মস্ত ব্যাগ থেকে ননীবালা টাকার বাগুিল বার ক’বে দেখালেন, ‘এই সবই তো ঢেলে আসবো ? অথচ এও তো জানি, আমি একশো টাকা খরচ ক’রে যে-বেনারসি কিনবো, সে-বেনারসি ওদের বাড়ির বেনারসিবি কাছে একটা ছাকডার মতো দেখাবে। বুউভাতে দেবে তো ওরা। দেখবি ত্তো সবই। সান্না সোনার স্বতো দিয়ে তৈরি হবে সেই কাপড়। সূর্যের আলো পড়লে তাকানো যাবে না, গালালে না-হোক সেরটাক সোনাও কি না বেরোবে।’

সোমেশ্বরকে এলগিন রোডে পৌঁছে দিয়ে গাড়িটা আবার তখনি ফিরে এসেছে বালিগঞ্জে। ননীবালা আর দেরি করলেন না। যেতে-যেতে মেয়ের ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন একবার। শুয়ে আছে মানসী, মুখটা ওদিকে ফেরানো, এদিকে বালিশ-ছাওয়া খোলা চুল।

‘কী রে, শরীর কি খুব খারাপ লাগছে নাকি।’

জবাব শোনা গেলো না।

‘আমি বেকুচ্ছি, বুঝলি ? ফিরতে দেরি হবে অনেক, তুই খেয়ে নিস।’ ঘরপেরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় এসে গলা চড়ালেন, ‘নবলক্ষ্মী আর নন্দর মা-ও যেন খেয়ে নেয়।’ তারপর তরতরিয়ে নেমে গেলেন নিচে।

গাড়িতে আরাম ক’রে এলিয়ে ব’সে প্রথম কোনদিকে যাবেন, কী করবেন সেটাই চিন্তা করলেন। কালকে যারা আসবে, সে-নিমন্ত্রণ তো আগেই করেছেন, কিন্তু আজকের আশীর্বাদের সময়েও তো ডাকতে হবে বাছা-বাছা কয়েকজনকে ? তাদের নামগুলো আর মুখগুলোই মনে করতে তিনি চেষ্টা করলেন।

এখন, এই মুহূর্তে অবিশিষ্ট কেনাকাটার ব্যাপারটাই তাঁর কাছে প্রধান। আর সময় নেই। এই বেলাটুকুর মধ্যেই যা করবার ক'রে নিতে হবে। নিমন্ত্রণের কাজ অন্তকে দিয়ে করালেও চলতে পারে, ফোন ক'রে দিলেও হ'তে পারে, কিন্তু কেনাকাটার কাজে কাউকে দিয়ে তাঁর ভরসা নেই। ভরসা করবার যোগ্য লোকজনই কি আছে নাকি সংসারে। প্রত্যেকটা লোক আজকাল অবিশ্বাসী, ধড়িবাজ, মিথ্যে কথা বলে। আর এতো টাকার কেনাকাটা! ননীবালা শূণ্ণে ভ্রুকুটি হানলেন।

কিন্তু তবুও দু-একটা বাড়িতে আজ নিজেই যাবেন তিনি। যাওয়া দরকার। ব্যাপারটা নেহাৎ ছোটো নয়, সে-ভাবে সারবেনও না, শত্রুরা ঘিরে আছে চারদিক। সবলকে তিনি চকিত করবেন, ব্যথিত করবেন, দাগা দেবেন প্রাণে। অনেক ভেবে নিমন্ত্রণের লিফ্ট করেছেন। অনেক ভেবে আড়ম্বরের ব্যবস্থা করেছেন। টাকা খরচ হবে। তা হোক। ঘরে-ঘরে যা-ই করুন, মুঠো হাত খুলুন বা না-খুলুন কিছু এসে যায় না, আপন ঐশ্বর্য আপনি দেখে সুখ কী? পরকে দেখাতে পারলে তবে না তার মূল্য। আর দেখাবার স্ফোৰ্গ এর চেয়ে আর বেশি কবে আসবে তাঁর জীবনে? কখনোই না। প্রায় ছ'মাস যাবৎ তিনি তিল-তিল ক'রে তাঁর ভাবনাধারাকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন, ভেবে-চিন্তে তিন মাস ধ'রে বিয়ের তারিখ পাকা করবার ফন্দি এঁটেছেন, এক মাস আগে থেকে এই তারিখটিকে লক্ষ্য ক'রে বিয়ের ফর্দ তৈরি করেছেন। মানসী না জাহ্নক, তিনি জানতেন মানসীর নিয়তি মানসীকে এই লক্ষ্যেই টেনে নিয়ে আসছে সজোরে, পৌছতে যে আর বিলম্ব নেই তাও ভালো ক'রেই জানতেন। আর কাজ এগিয়ে এসেছে জেনেও তিনি চূপ ক'রে ব'সে থাকবেন ততোটা শৈথিল্য তাঁর মনে বা দেহে কোনোখানে নেই।

অবিশিষ্ট চূপ ক'রে কোনোদিন বা কখনোই তিনি ছিলেন না। থাকলে

এই সৌভাগ্য এমন ক'বে হাতে এসে ধরা দিতো না। তার জগ্গে ভাবতে হয়েছে, চেষ্টা করতে হয়েছে, সীতাহরণের জগ্গ বাবণেব যেমন সোনার হরিণ তৈবি কববাব দবকার হয়েছিলো, ঠিক তেমনি ননীবালাকেও সেই কৌশল অবলম্বন কবতে হয়েছে। বাবণ সীতাকে পেতে চান কিন্তু তাঁব ইচ্ছেটাই যেমন সব নয়, তেমনি সোমেশ্বরেব ইচ্ছেটাও তাঁব মেয়ের মনেব কাছে সব ছিলো না। সব কেন, কিছুই ছিলো না। সেখানে মাযামুগেব পাটটা ননীবালাকেই নিতে হয়েছিলো। দু-দিক থেকে দু জনকেই চলনা করতে হয়েছে তাকে। নিজেব বিচিত্র স্তচিত্র চলনাব রূপ দেখে নিজেই কতবার মুগ্ধ হয়েছেন। সোমেশ্বরেব কাছে তিনি কি তিনি থাকতেন? ননীবালার সোনার বিষই দেখেছে সে, দেখেছে আব অভিভূত হয়েছে। মানসীকে পাবাব জগ্গ না-জেনে সোমেশ্বব তাঁব পিছে-পিছেই হেঁটেছে, মানসীর কঠিন ব্যবহাবে সে যতবাব যতদূবে ছিটকে গেছে, ততোবাব ততোদূব থেকে তিনিই তাকে সাপটে নিয়ে এসেছেন।

ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে হয় দূব

নানা বঙ্গে চল মুগ মাযায় প্রচুর।

রামায়ণেব অবগ্যাকাও মনে প'ড়ে গেলো ননীবালাব। বাবণরাজাব মতো দুই চোখে অশ্রু জালিয়ে ননীবালাও আপন সাফল্যে আপনিই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে উঠলেন। চুনোপুঁটি তো নয় সোমেশ্বর, অনেক ঘাটেব জল খেয়েছে, অনেক দেখে চুল লালচে হ'য়ে এসেছে, অনেক প্রতাপ খাটিয়েছে অনেক স্ত্রীলোকের উপর, জীবন ভ'বে এটাই জেনেছে এই জগৎসংসারের সকল লোকজন তাবই অধীন, ত'রই দাস, পাবাব জগ্গই সে এসেছে, আব এরা এসেছে দেবাব জগ্গ। পেতে গেলে যে কষ্টও কবতে হয় এই বোধ সোমেশ্বরের জ্ঞানের এলাকার বাইবে। মানসীব বিমুখ মন, অনিচ্ছুক প্রেম আর সংযত ব্যবহাব প্রথম থেকেই ধাক্কা

দিয়েছে তাকে। এই ধাক্কায় জেদ বেড়েছে, ইচ্ছে বেড়েছে, ক্ষুধা বেড়েছে, আর জমিদারনন্দনের সেই সব রিপুব আগুনে ননীবালা ঘুতাহতি দিয়ে তাকে প্রজ্জলিত কবেছেন। কোন যজ্ঞের কী বিধি তা যে তাঁব এতো নখদর্পণে ছিলো, নিজেই কি জানতেন ?

জানতেন। জানতেন। সব জানতেন। প্রথম যেদিন সোমেশ্বর তাঁদের বাড়িতে এসেছিলো, টকটকে চেহারা নিয়ে রাজার ভঙ্গিতে রাজা হ'য়ে বসেছিলো সোফায় হেলান দিয়ে, মানসীব গান শুনেছিলো, মুগ্ধ আবেশে চোখ বুজেছিলো, তারিফ করেছিলো, গদগদ ভাষায় আলাপ করেছিলো, সেদিন থেকেই প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে তিনি তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু অচৈতন্য বুদ্ধি দিয়ে জেনে ফেলেছিলেন সব কথা। মুখ ফিবিয়ে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে ছিলো মানসী, কথাবার্তা জমাতে পারে নি সোমেশ্বর। তাতে কী। ননীবালা তো ছিলেন সেখানে। তাঁর মুখের স্নেহ হাসিটি তো মলিন ছিলো না, যত্নে তো কোনো ক্রটি ছিলো না, আগ্রহেও ভাটা ছিলো না। অপূত্রক বর্ষীয়সী মহিলার পুত্রস্নেহের ব্যাকুল বাসনার ভানকেও শৈশবে মাতৃহীন পুরুষ চরিতার্থ কবতে লোন্মুগ্ন হয়। ননীবালা কি জানেন না পুরুষমানুষ যত বড়োই দ্বিগ্বিজয়ী পুরুষ হোক না, গৃহে তারা শিশু, অসহায়। মায়ের ক্ষুধা তাদের চিরকালের। জীব্র মধ্যেও তারা মাকেই আবার পেতে চায়। মায়ের যত্নই খোঁজে। মায়ের পাটে কি ননীবালার একতিলও খুঁত ছিলো সেদিন ?

এসেছিলো সুপ্রিয়া চ্যাটার্জির সঙ্গে। ব্যারিস্টার এ. এন. চ্যাটার্জির মেয়ে, রামেন্দু ভট্টাচার্যের আর-একজন কুতী ছাত্রী। ননীবালা লক্ষ্য করেছিলেন সোমেশ্বরের সঙ্গে মেয়েটির বন্ধুতা বা আলাপের গতিটা ততো সরল নয়। রং ধরেছে। বুকটা কড়কড় ক'রে উঠেছিলো। সেই সঙ্গে

বিদ্যুতের মতো একটা ক্ষণিক আলোও তিনি দেখেছিলেন, আশাও পেয়েছিলেন, অতৃপ্ত সোমেশ্বরের তৃপ্তি যে সুপ্রিয়াতেও আবদ্ধ থাকবে না, সেটা তৎক্ষণাৎ ধ'বে ফেলেছিলেন তিনি। আর ধ'রে ফেলা মাত্রই মায়া-মৃগ বলমূল ক'বে উঠলো তাঁর সোনার অঙ্গ নিয়ে। আর তারপব আস্তে-আস্তে খেলিয়ে-খেলিয়ে এইখানে তো নিয়ে এলেন। মেয়েটা বোকা। কিসে ওর ভালো, কিসে ওব মন্দ বোঝে কখনো? না কি ভাবে সে-কথা? না কি এই যে ননীবালা আপ্রাণ চেষ্টায় এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন তার জন্ত কোনো কৃতজ্ঞতা আছে? কিছু নেই। নেই তো নেই। চুপচাপ থাকলেই পাবিস। নিজেকে সমর্পণ করলেই পাবিস। ভাবলেই পাবিস আমার যখন মাথা নেই, মার বুদ্ধিতেই চলি না, তা নয়। মুখেব দিকে তাকানো যাবে না। থমথম কববে মেঘ, কিন্তু ফাটবেও না, ঝরবেও না। কেবল অন্ধকার ক'রে দেবে চারদিক। একটা গুমোট চলবে কয়েক দিন। কথা বললে তাব জবাব তৈরি আছে, কিন্তু একটা অবুঝ, হাবা বোবা মেয়েব নিঃশব্দ বাগেব সঙ্গে কী অস্ত্র নিয়ে লড়াই করবেন ননীবালা। তখন মনে হয় ঠিক আগেব মতো চুলেব মুঠি ধ'রে পিঠের উপর গুমগুম কয়েকটা লাগাতে পাবলে ঠিক হয়, ঝাল মেটে মনের, কিন্তু সে-সাহস আজ আর নেই ননীবালার। মনে-মনে রাধানগরের দত্তমল্লিক গোষ্ঠীকেই দায়ী করেন, বাপেব স্বভাব পেয়েছে ব'লে একলা ঘবে মাথা খোঁড়েন।

তবু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যে ঢং ধ'বে তীবের কাছে এসেও তবী ডুবিয়ে দেয় নি মেয়ে তাব জন্তেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। নৈলে সব আকাজক্ষায় আজ তাঁর জলাঞ্জলি হ'তো। জীবনে যা-কিছু চেয়েছেন, যত কিছু পেয়েছেন, এই পাওয়াটাই কি তার মধ্যে চবম পাওয়া নয়?

সুপ্রিয়া'র সঙ্গে সোমেশ্বব সেদিন মানসীকে তার বাড়ির এক গানের

জলসায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলো। বাগচি লজে বসবে সেই আসর। অনেক গাইয়ে এসেছে বাইরে থেকে, বাংলার গায়ক-গায়িকাদেরও বাদ দিচ্ছে না সে। সোমেশ্বরের ধারণা গাঁয়ে যোগী ভিখারী না তাই, নইলে গানে আজকাল বাঙালিরাও পিছিয়ে নেই। তার মনে সেদিন একটা প্রতিযোগিতার ভাবই ছিলো। বাইরে থেকে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে লড়াইতে বসাতে চেয়েছিলো কলকাতার গাইয়েদের। মানসীকেও সে সেই সম্মান দিতে চায় ব'লেই নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলো, মানসী আর সুপ্রিয়া ঠুংরি গাইবে। সোমেশ্বর মনে করে এ-দেশের এ-দুটি মেয়ে গানের জগতে অনন্তসাধারণ।

শীতকাল। কলকাতা জমজমাট। এখানে একজিবিশন, সেখানে সার্কাস, ওখানে কুস্তি, নিউ মার্কেট সেজেগুজে ফুলবাবু। ফ্লাওয়ার শো, ডগ শো, আরো যে কতকী অস্ত নেই। তার মধ্যে প্রধান হ'লো গানের কনফারেন্স। একমাস ধ'রে চলেছে সেই গান। বড়ো-বড়ো ওস্তাদরা হাজার-হাজার টাকা মুজরো নিয়ে কত দূর-দূর দেশ থেকে বাংলা মূলুকে চ'লে এসেছে গলার কসরৎ দেখাতে, বাহবা নিতে। তারা জেনেছে কলকাতা শহরে টাকার গাছ আছে, হাত বাড়ালেই মেলে। কলকাতা শহরে ফুটি আছে, চাইলেই পাওয়া যায়, কলকাতা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। সেখানকার লোকেরা টাকা ছড়াতে তো জানেই, সমঝদারও বটে। তানৈলে হাজার-হাজার টাকার টিকিট এমন অনায়াসে বিক্রি হচ্ছে কেমন ক'রে। লোকেরা রাতের পর রাত এমন পাগল হ'য়ে গান শুনছে কেমন ক'রে, যারা টিকিট কাটতে পারছে না, তারা আছে ফুটপাতে। ব'সে আছে সারারাত, শুনছে, মোহিত হচ্ছে, অপার্থিব আনন্দের নেশায় ভুলে গেছে দেহের স্তব্ধস্থ। কাগজে ছবি উঠছে এই সব গুণগ্রাহীদের।

নবীবালাও সেই গুণগ্রাহীদের একজন হয়েছেন দু-একদিন। মেয়ের

দৌলতে বেশি দামেব সামনের আসনে ব'সে ই ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন এদেব কাণ্ডকাবখানা । বাইজিদেব দেখেছেন, ওস্তাদদেব দেখেছেন, আলো দেখেছেন, ফুল দেখেছেন, লোকে লোকারণ্য প্যাণ্ডোলে অগুনতি কালো-কালো মাথা দেখেছেন, গণ্ডগোল শুনেছেন, পনিচি মাছুষ দেখলে যারা চেনাব যোগ্য তাদের চিনে গল্প করেছেন, যাব অযোগ্য তাদের ককণার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'বে ধৃত্য কবেছেন । তাবপ ভেবেছেন কত টাকার টিকিট বিক্রি হ'লো এক বাত্রে, ক'টা লোক ফাঁদি দিয়ে ঢুকে পড়লো, ক'জন মাছুষ সসন্মান নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছে তাঁর মতো বাইবে থেকে হাসাহাসিব শব্দ এসেছে, ফুর্তিব উদ্দামতা । এসেছে পাপ ভাজাব গন্ধ, ভেতবে ঠোঙা-ঠোঙা পেঁয়াজি এসেছে । লোকেবা চাকুম চুকুম খাচ্ছে, তন্ডায় ঢুলে পড়ছে, চেবাবেব হেলানে ঘুমুচ্ছে গৌ-গৌ নাব ডাকিযে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ঢুলে ঢুলে পড়ছে, মনীবালাও ঢুলতে ঢুলতে বাবে-বাবে খুরি ভতি গরম চা আনিযে খেয়েছেন, তারপর কথ ঘুমিযে প'ড়ে এক ঘুমে বাত কাবার ।

গান তিনি শোনে ন। গান শুনতে যানও ন। আব এ-কথা তিনি জানেন, খববেব কাগজ আলো ক'বে গানেব শ্রোতাদের যে স ভিডেব ছবি বেরোয়, তাবা বেশির ভাগই তাঁব মতো শ্রোতা । তাব আসে ভিড বাডাতে, দল বেঁধে রাত জাগতে, সিগারেট টানতে, নেশ কবতে, চা পেঁয়াজি খেযে জিবে শান দিতে । ছেলেরা মেযে দেখে মেযেবা সাজগোজ দেখায় । নিত্য তিরিশদিনের নিয়মভাঙাব আনতে মেতে উঠতে আসে সব । তা মন্দই বা কী । এমন সব উত্তেজক রাত বি জীবনে রোজ আসে ? তা নৈলে গান । ঐ সব গানে শোনবার আচ্ছেট কী । তিনি তো ভেবে পান না । কেবল মাথা-কোটাছুটি আর কুকুবে ঘেউ-ঘেউ । দাঁত-মুখ থিঁচিয়ে, শবীবটাকে ভেঙেচুরে সারাটা রাত ধ'রে

লাকগুলো কলজে ফাটিয়ে কী চিংকারই না করে। পারেও। আর তাই শূন্যে মূর্ছা যান তাঁর মেয়ে। প্রত্যেক রাত্রে নিশ্চুম্ চোখে ঠায় ব'সে থাকে সেখানে, মোহের মতো তাকিয়ে থাকে, পাগলের মতো অস্থির হ'য়ে ওঠে শূন্যে-শূন্যে, ডাকলে সাড়া নেই— যেন জ্ঞান নেই কোনো।

শুধু এই গানই নয়, কোনো গানই ভালোবাসেন না ননীবালা। তাঁর শূন্যের মধ্যে এই স্বকুমার বৃত্তিটি নেই, স্বপ্নের কোনো জাহ্ন নেই তাঁর জীবনে। নেহাংই মেয়ে একটা মস্ত গাইয়ে, এই গানই তাঁর লক্ষ্মী, শ্বান দিয়েই এইখানে তিনি সমাসীন, মান-সম্মান প্রতিপত্তি এই গানের হাত ধরেই এসেছে তাঁর দরজায়, তাই বালাপালা হ'য়েও সহ্য করেন। তাই নৈলে কোনোখানে গান শোনার নিমন্ত্রণ হ'লে তিনি তৎক্ষণাৎ অরাজি। চায়ের নিমন্ত্রণে যান, কিছু দেখবার নিমন্ত্রণ হ'লে যান, ছবির মহরতে যান, এমন কি মেয়ে যখন গ্রামোফোনে গান দিতে যায় তখনও সঙ্গে-সঙ্গে দমদম চ'লে যান গাড়ি চ'ড়ে বেড়িয়ে আসবার জন্ত, কিন্তু কোনো জলসার নিমন্ত্রণে কিছুতেই যান না। তবু কনফারেন্সগুলোতে অনেক আমোদ পাচ্ছে, কিন্তু ঘরোয়া জলসাগুলোতে তো কেবল দাঁতমুখ বুজে চুপ ক'রে ব'সে চোয়াল ব্যথা করা। থেয়ে-দেয়ে আর কর্ম নেই নাকি তাঁর ?

কিন্তু সোমেশ্বর যখন বললো, 'আপনিও কিন্তু যাবেন।' স্থিতহাস্তে ষাড হেলিয়ে মুহূর্তে রাজি হলেন ননীবালা, 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। গানের শাপারে নিমন্ত্রণ না-করলেও আমি না-গিয়ে থাকতে পারি না।'

মানসী মুখ তুলে তাকিয়েছিলো, ননীবালা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'গান আমার নেশা। কে-কে গাইবে ?'

'সবাই। কলকাতার খ্যাতনামা গাইয়েরা তো নিশ্চয়ই, আর কন-কারেন্সে ঝাঁরা এসেছেন, তাঁদেরও প্রায় সবাইকেই পেয়েছি। আমি

তাবছি—’ মনের কথাটা বললো সোমেশ্বর, ‘ডালফটর সঙ্গে মাছভাতে একটা ঠোঙ্কর লাগুক। একই ঠাটের গান পাশাপাশি দু-জন গাইবে একজন বাঙালি একজন অবাঙালি। দেখবো, এক বাংলা দেশ থেকে! যত টাকা এরা প্রত্যেক বছর লুটে নিয়ে যায়, সত্যিই তার যোগ্য কিনা আমার তো মনে হয় এই যে এতো নাম আসমানী বাইয়ের, তার চেয়ে এঁরা—’ এখানে সোমেশ্বর মানসীর দিকে একবার তাকালো, ‘কিছুমান কম যান না। ববং আমি বলবো এঁদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ওদেরই কোনে তুলনা হয় না। গাঁজা-খাওয়া ফাটা গলা—এই পাখির স্বব পায়ে কোথায়।’

ননীবালা খুশি হলেন। শ্যাকামি ক’বে বললেন, ‘আমার মেয়ের গা তাহ’লে আপনাব শোনবার অযোগ্য নয়।’

‘তাহ’লে কি আব খুঁজে-খুঁজে আলাপ কবতে আসি?’

‘আপনাদের প্রশংসাব মূল্য তো জানি। গানের জগতের মাত্র আপনারা—’ এঁখানে থামলেন, শুনেছিলেন কোথাকার রাজারা যে দারুণ গানের ভক্ত, ঠিক এবাই কিনা মনে কবতে পারলেন না। সোমেশ্বর তাঁকে রক্ষা করলো সেই সংশয় থেকে, ‘তা বলতে পারেন। এ আমাদের রক্তের ধারা, পুরুষাত্মকমে আমবা গানের ভক্ত। এখন আর কিছুই হয় ন বছরে এক-আধবার এক-আধটা জলসা মাত্র, তা নৈলে আমাদের বাগটি লজ-এব গোলঘর তো বারোমাস ওস্তাদেই ঠাসা থাকতো।’

বিজ্ঞের মতো ননীবালা মাথা নাড়লেন— ‘তা আর জানি না। এখানেও মানসী মা-ব মুখে চোখ তুলেছিলো।

সোমেশ্বরের চোখে অতীতের ছায়া ভাসলো। অর্ধমনস্ক হ’য়ে বললে ‘প্রায় ছ’ ফুট গভীর ক’রে, বারো ফুট চওড়া গোল একটা পরিখা কে চারদিক ঘিরে দেওয়া হয়েছিলো সেই গোলঘরের। ইটালি থেকে মার্বে

আনিযে তীর বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, পাশে-পাশে গোলাপের ঝাড়। একটা লোহাব ঝোলানো ব্রিজের উপর দিয়ে সেই পবিধা ডিঙিয়ে গোল-ঘবে যেতেন কর্তাবাবুবা, নিচতলাটাতে বিশাল একটা হল, ঠিক মাঝখানে একহাত উঁচু প্রশস্ত বেদী, সেখানে ওস্তাদবা। বসতেন তাঁদের সাক্ষোপাঙ্ক নিয়ে, আব শ্রোতাবা নিচে গোল হ'য়ে ঘিবে বসতেন ঝার ঝাব আসনে। উপবতলাব গোল বারান্দা ঘিরে খান বাবো ঘন ছিলো, সেটা একান্ত-ভাবেই সেই গাইয়ে বাজিয়েদেব বাসস্থান।' সোমেশ্বর স্প্রিয়াব দিকে তাকালো, 'তোমাকে তো দেখালাম সেদিন, কী হ'য়ে প'ড়ে আছে দেখলে তো। ঐ পরিখায় এক সময়ে কী সুন্দব টলটলে জল ছিলো, কত পদ্ম যে টুটে থাকতো—'

চোখ বড়ো ক'বে, খুংনি গলায় ঠেকিয়ে ঢ° করলো স্প্রিয়া—'ভীষণ অগ্নায়। এ-ভাবে একটা সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দেওয়াব অধিকার কিন্তু আপনার নেই।'

সোমেশ্বর হাসলো। 'সে বামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, ও-সব মেইনটেইন করবে কে? জানো, এখনো বাড়ি পবিষ্কাব রাখবার জন্তু আমাদের পাঁচটা মালিব মাইনে দিতে হয়?'

নবীবালা হাঁ হ'য়ে শুনেছেন, টোক গিলে বললেন, 'গান-বাজনার ব্যাপারটা তাহ'লে সে-বাড়িতেই হবে?'

'হ্যাঁ, ঐ গোলঘরেই। ওখানে প্রায় সাত আট শো লোক বসতে পারে।'

'অ্যাতো বড়ো!'

বিনীত হাশ্বে যুক্তকব হ'লো সোমেশ্বর। 'ও-বকম জলসাঘর একমাত্র ণায়গডের রাজাদেবই আছে, মিসেস দত্তমল্লিক, অহংকার ক'বে বলছি না, আমার পিতামহদের শুধু শখই ছিলো না, রুচিবোধেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।'

এ-কথাৰ পৰে ননীবালা শুধু বিহ্বল হ'যে তাকিষেছিলেন সোমেশ্বৰে মুখের দিকে। একটা সত্যিকার বাজপুত্ৰকে কিংবা রাজাকে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে দেখছিলেন বোধহয়। তিনি কি আব কখনো কোনো ধনী ব্যক্তিকে দেখেন নি? দেখেছেন বৈকি। জজ দেখেছেন, ম্যাজিষ্ট্ৰেট দেখেছেন ব্যাৰিষ্টাৰ দেখেছেন, দেখেছেন কোটিপতি মারোয়াড়ি প্রযোজক, লগ পতি ব্যবসায়ী, আৰো কত লোক দেখেছেন, কিন্তু সাক্ষাৎ কোনো রাজ খেতাবধাৰী মানুষেৰ সাক্ষাৎ তো আব পান নি। এমন পরিখা-সেং গোলঘৰেৰ খবৰও শোনে ন। যে-বাডিৰ কোনো একটা অংশে, কোণে একটা ঘৰেই সাত-আট শো লোক বসতে পাবে, সে-বাডিৰ সমস্তটা কত বড়ো সেটাই মনে-মনে ধাবণা কৰতে চেষ্টা কৰলেন তিনি।

একটু পৰে বললেন, 'আপনি তো সে-বাডিতেই থাকেন?'

সোমেশ্বৰ হাসলো, 'তা থাকতেই হয়, কিন্তু শিগগিৰই ছাড়ছি।'

'কেন?'

'ও-সব পুৰোনো জিনিস আঁকড়ে থাকা আমাৰ পোষা ন। এক মানুষ, দিব্যি আবামে একটা ভালো পাডায়, ভালো ফ্ল্যাটে থাকবো, অ বড়ো বাডি দিয়ে আমাৰ হবে কী? ও-বাডিৰ ক'টা মহল জানেন আমাৰ ঠাকুমা বলেন ছেলেবেলায় আমি নাকি একবাৰ আমাদেৰ বাডি মধ্যেই হাৰিয়ে গিয়েছিলাম।' সোমেশ্বৰ হেসে উঠলো।

ননীবালা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটলেন, ইতস্তত ক'বে বললেন, 'দয়া ক' আমাদেৰ এখানে আসবেন তো মাঝে মাঝে?'

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। অনধিকাৰ অনুবোধ। সোমেশ্বৰ এই প্রথম নি এসেছে তাঁৰ বাডিতে, বেডাতেও আসে নি, প্রয়োজনেই এসেছে। যেম আৰো কত কেউ কত জাযগা থেকে নিমন্ত্ৰণ করতে আসে, এও তেমনি স্তুপ্ৰিয়া পরিচিত ব'লে, স্তুপ্ৰিয়াৰ সঙ্গে এসেছে এইটুকু যা তফাৎ। এর মৰ

ঘাবার আসবার মতো প্রশ্ন ওঠে কোথায় ? মানসী বিরক্ত হয়েছিলো । নীবালা জানেন বিরক্ত তাঁর মেয়ে অনেকক্ষণ থেকেই হচ্ছিলো, কিন্তু এবার সেটা চরম হ'লো । হঠাৎ হারমনিয়মটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ললো, 'আচ্ছা, আজ তাহ'লে—'

বিদায় দেবার স্বস্পষ্ট ইঙ্গিত । তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো সোমেশ্বর, গা ঘষে সুপ্রিয়াও উঠে দাঁড়ালো কিন্তু ননীবালা ব'সে রইলেন, ব'সে-ব'সেই নির্বন্ধ হলেন, 'দয়া ক'রে এসেছেন, শুধু মুখে যেতে দেবো না । একটু মৃষ্টিমুখ করতেই হবে । মানসী, যা তো, একটু দেখে আয় তো চা-টা হ'লো কিনা ।' লোকের সামনে মেয়েকে তিনি টুনি বলেন না ।

সোমেশ্বর বাস্তব হ'য়ে বললো, 'না, না, ও-সব কিছু করতে যাবেন না, গাছাড়া এই অসময়ে—'

'অতিথি নারায়ণ—' মৃষ্টি ক'রে হাসলেন ননীবালা, 'তার উপরে এমন অতিথি, এর কি কোনো অসময় থাকতে পারে ?' মেয়ের উদাস গভীর মুখের উপর পলকপাত করলেন তিনি, তারপর নিজেই উঠলেন, 'আমিই দেখে আসছি, তুই ওদের কাছে বোস ।' যেতে-যেতে ফিরে তাকালেন, 'সুপ্রিয়া, শোনো ।'

'কী, মাসিমা ?' সুপ্রিয়া কৌতূহলী হ'য়ে কাছে যেতেই ননীবালা তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন ।

বাধ্য হ'য়ে বসলো সোমেশ্বর । বাধ্য হ'য়ে মানসীও আলাপে প্রবৃত্ত হ'লো । কিন্তু ননীবালার চালটা কি কেউ ধরতে পেরেছিলো সেদিন ? সুপ্রিয়াকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আজীবাজে কথায় আটকে রাখতে-বাখতে সোমেশ্বরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কতখানি গভীরতা সে-খবরটা সংগ্রহ করতে-করতে তিনি যে মেয়ের কতখানি উপকার করছিলেন তা-ই কি বুঝেছিলো তাঁর বোকা মেয়েটা ? সিন্ধের মস্ত কুমালটা ঘুরিয়ে হাওয়া

খেতে-খেতে আজ তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভাবলেন সে-সব কথা। তারপর নিজেকে তাবিফ ক'বে হাসলেন আপন মনে।

ভাগ্য। ভাগ্য। সবই ভাগ্য। নৈলে মানসীব কী যোগ্যতা ছিলো সোমেশ্বরের স্ত্রী হবাব? কী আছে তার? রূপ গুণ অর্থ বিদ শিক্ষা দীক্ষা সব দিকেই সে ছোটো। শুধু গান। গানের কি এতোই মোহিনী শক্তি? না, তা নয়। ভাগ্যও নয় শুধু। ভাগ্যেব চাকা ধ'বে রুলে থাকবার অসীম ধৈর্যেবই এই উপহার। ভাগ্যকে গ্রহণ কববার শক্তি কি সকলেরই থাকে, না জ্ঞাছে? ননীবালা না-থাকলে এই ভাগ্য কি আজ মানসীকে ধবা দিতো? কখনোই না।

টুকটুক তুডি মেবে হাই তুলে গাড়িব জানালা দিয়ে তিনি নির্দিষ্ট পথের আশায় উৎসুক দৃষ্টিতে বাস্তাব দিকে তাকালেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভবানীপুর্বেব কোনো এক সফ গলির মুখে এসে গাড়ি থামলো। ননীবালাই থামালেন। কানাই ঠাকুর থাকেন এখানে। ববেন-মামার বাড়িতে যখন ছিলেন, এই ঠাকুরই তাঁদের পুজো-আর্চা ক'নে দিয়ে আসতো। সেই থেকে ননীবালার সঙ্গে চেনা। ননীবালার কাজে কর্মেও দু-একবার ডাক পড়েছে কানাই ঠাকুরের। বছরে দু'বার ঘট ক'বে নারায়ণসেবা কবেন তিনি, এখনো দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে তাঁব অন্তত তাঁব নিজের তা-ই ধাবণা। ঘোরালা প্যাচালা বাস্তা বেঘে এক তলার ছোট্ট দু'খানা ঘবে এই পুরুষ মশায়ের আস্তানা। মাঝখানে উঠোন আছে একটি। সেখানে দাঁড়িয়েই ননীবালা হাঁকলেন, 'ঠাকুরমশায় কই গো?'

প্রথমে একটি বিধবা মেয়ে বেরিয়ে এলো, ননীবালা চেনেন তাকে ঠাকুরমশায়ের মেয়ে, তারপর এলেন ঠাকুরমশায়ের স্ত্রী, তারপর ঠাকুর-

মশায় নিজে । বোঝা গেলো বেরুবার জ্ঞান প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি । টিকিতে ফুলটি পর্যন্ত বাঁধা হ'য়ে গেছে । নামাবলিটি বাঁধে । ননীবালা একগাল হেসে বললেন, 'মেয়ের বিয়ে ।'

'তাই নাকি ? খুব ভালো, খুব ভালো । কোথায় বিয়ে দিচ্ছেন ?'

ননীবালার সবিস্তারে বলবারই ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু সময় কম, তবু তারই মধ্যে যতটা পারেন ব'লে নিলেন ।

ঠাকুরমশায় খুশি হলেন শুনে । আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'কবে ?'

'কবে আবার, একেবারে ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে যে । রাজা বাহাদুর আর একদিনও দেরি করতে চাইছেন না, কালকের তারিখেই সারতে হবে । লগ্ন তাড়াতাড়ি আছে । প্রায় গোধূলি লগ্নই বলা যায় । সকালে আটটার সময় রেজিষ্ট্রি হবে, সন্ধ্যা সাতটার সময় বিয়ে । আপনি যা হয় ক'রে-ক'ন্মে দেবেন—'

'নিশ্চয়ই । নিশ্চয়ই । কিন্তু চুক্তি করবেন, না নিজেই সব—'

'চুক্তি মানে ?' ননীবালা অবাক না-হ'য়ে পারলেন না ।

'চুক্তি মানে চুক্তি ।' ননীবালার অজ্ঞানতায় ঠাকুরমশায়ও একটু অবাক হলেন । 'অর্থাৎ অমৃত্যুতানের আয়োজন আপনারা করবেন, না আমি করবো এই আর কি । যেমন শ্রাদ্ধ । আজকাল সবাই চুক্তিতে করে । তারপর ধরুন উপনয়ন, অন্নপ্রাশন— সব তো আমরা আজকাল চুক্তিতে নিই । বিয়েটাই এতোদিন ছিলো না, এখন সেটারও চলন হয়েছে ।'

'ও ।'

'একটা হিন্দু বিবাহের খুঁটিনাটি তো কম নয় । সব আমরা নিয়ে যাই । যেমন কুলো, পিঁড়ি, শাঁখ, সরা, গাছকোটো, কোষাকুশি— দশকর্ম ভাণ্ডারের সমস্ত জিনিস আমরা ভাড়া ক'রে নিয়ে যাই, বিয়ে শেষ হওয়া মাত্র ফেরৎ দিয়ে দিই । চেলি পর্যন্ত ভাড়া পাওয়া যায় ।'

‘তাই নাকি ?’

‘তা নৈলে অত সব করবেন কখন । একদিনে ঐ অণুকোটি চৌষটি আয়োজন সম্ভব ? আপনি টাকা ধ’বে দিন, আমি কাল সন্ধ্যাবেলা সব স্নান গিষে হাজির হবো । বব-কনে যে বসবে তাব নতুন পাটিটা পয়স্তু নিয়ে যাবো । কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে ।’

‘তাহ’লে তো খুব ভালো হয় । আমি আবো ভাবছিলাম, এতো অল্প সময়ে কী কবি । আপনাকে নিয়ে বাজাব করবো ব’লেই এসেছিলাম । যা-যা লাগবে ফর্দ ক’বে দেবেন, কিনে দেবো । এ-ভাব যদি আপনি নিজেই নেন তাহ’লে তো আমি বাঁচি । আর খবচও তো বোধহয় কম লাগবে ?’

‘লাগবে না । একটা জিনিস কেনা আব ভাড়া কবা, তফাৎ আছে না । তাছাড়া সব তো একদিনেব জগ্ন, কিনেও তো লাভ নেই কোনো ।’

‘তাই তো ।’

‘আপনার আনন্দক টাকা লেচ যাবে ।’

‘তাহ’লে চুক্তিতে কত লাগবে বলুন ।’

‘আসুন, ঘবে বসবেন আসুন, সব ব’লে দিই আপনাকে ।’

ঘবে এসে বসলেন ননীবালা । পাঁচমিনিটেব মধ্যে ঠিক হ’য়ে গেলো সব । আগাম টাকা দিয়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেবিষে এসে গাভিতে উঠলেন । ঠাকুরমশায় সঙ্গে এলেন, কাছেই কোথাও যাবেন তিনি, ননীবালা ঐটুকু বাস্তা দয়া ক’রে তাঁকে পৌছে দেবেন । অবিশি আরো একটু উদ্বেগ আছে সঙ্গে আনবার । দু-জন ঠিকে ঠাকুর ঠিক কবতে চান তিনি কালকের জগ্ন, ঠাকুরমশায় জানেন এ-সব খবব । তাদের আটঘাট তাব নখদর্পণে । কিন্তু ঠাকুরমশায় সে-কথা শুনে বললেন, ‘তার দরকার কী ? তাব চেয়ে হোটেলের অর্ডার দিন না ।’

‘সে কি হয় ?’

‘কত লোক হবে আপনার ?’

‘কত আর ! কাকে বা চিনি এখানে । হ’তো যদি আমাদের গ্রামে দেখতেন পিলপিল ক’রে পাঁচশো লোক এসে হাজিব হ’তো ।’

‘তাব মানে পাঁচশো লোকও হবে না ?’

‘না না, পাঁচশো কোথা থেকে হবে । দু’শো হ’লে ঢের ।’

‘ও, তাহ’লে তো কোনো অসুবিধেই নেই । আব তাছাড়া ও-সব বাঙালি ব্যাপার আপনি কববেনই বা কেন ? রাজাউজিরের সঙ্গে কাজ কবছেন, হালেচালে সেই মর্যাদা বাখতে হবে তো । নিশ্চয়ই অনেক বড়ো-বড়ো লোকও আসবে, ‘বাবা সাহেবস্ববোব মতো থানা খায় ।’

‘হ্যাঁ, তা অনেক আসবে ।’

‘তবে ? সেখানে কি তকমা-আঁটা বঘ-বেয়ারা না-হ’লে মানায় ?’

‘সে-বকম পাওয়া যায় ?’

‘যায় না ? টাকার কাছে সব বিকোয় । বাঘের দুধ পাওয়া যায় আন ভাড়াটে বেয়ারা পাওয়া যায় না ?’

‘তাহ’লে আমাকে তাই ঠিক ক’রে দিন ।’

‘বেশ ।’

ঠাকুরমশায় ওস্তাদ লোক । মস্ত এক হোটেলে নিয়ে এলেন ননীবালাকে । বললেন, ‘এবাব বলুন কী কী আপনি চান ।’

হোটেলের চারদিকে তাকিয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছেন ননীবালা । ভালো-মন্দ খাবারের গন্ধ এসে ঝাপটা দিচ্ছে নাকের মধ্যে । কলকাতা বসবাসের এই কয়েক বছরের মধ্যে কম তো দেখলেন না, সোমেশ্বরের জলসার গান শুনতে গিয়ে তাদের গোলঘরও দেখে এসেছেন, হারিয়ে যাবার মতো তিনতলা তিনমহলা মার্বেল পাথরের বাড়ির আনাচ-কানাচও

ঘুরে দেখে এসেছেন। কত পার্টি দেখেছেন, সম্মিলনী দেখেছেন, বড়ো-লোকদের সাহেব-সাহেব খেলা দেখেছেন, কিন্তু এতো বড়ো হোটেলে কোনোদিন ঢোকেন নি। কানাই ঠাকুরের উপর বীতিমতো শ্রদ্ধা হ'লো তাঁর। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আজকে বিকেলে জন পঁচিশেক থাকবে, তা'ব জগ্গ—'

'বলুন, কী ব্যবস্থা করবো।' দোকানের ম্যানেজার বোধহয়, কাগজ পেনসিল নিয়ে অর্ডার নিতে এলো। একটু চুপ ক'বে থেকে ননীবালা বললেন, 'যা-যা বলবো সব দিতে পাববেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'পরিবেশন কববার লোকও দিতে পাববেন? বেশ পোশাক-টোশাক প'বে যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক সময়ে পৌছতে পাববেন তো?'

'পাববো না? এই তো আমাদের কাজ। আপনি কী করবেন? স্ট্যাণ্ড-আপ সাপাব? না, একেবারে বসিয়ে ডিনার?'

স্ট্যাণ্ড-আপ সাপাব শব্দটা জানা ছিলো না ননীবালা'র, কিন্তু বসিয়ে ডিনারের অর্থটা বুঝলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'ঐ বসিয়ে ডিনারই খাওয়াবো।'

'ঠিক আছে। পঁচিশজন বসবার মতো চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা আছে তো?'

'চেয়ার-টেবিল?'

'চেয়ার-টেবিল না-হ'লে ডিনার হবে কী ক'রে?'

'ও।'

'যদি মেঝেতে বসিয়ে খাবার ব্যবস্থা করেন, তাহ'লে আমাদের লোক

পরবেশন করতে যাবে না, চেয়ার-টেবিল হ'লে, আমরা তার উপযুক্ত সব ব্যবস্থাই ক'রে দিতে পারবো। জলেব গ্লাশ, খাবার প্লেট, গ্যাপকিন, কাঁটা চামচে—এ-সবও তো চাই।’

‘ও।’

‘অবিশি ভাববার কিছু নেই। চুক্তি দিলে আমরাই ক'রে দেবো সব। পাঁচটার সময় লোকজন গিয়ে টেবিল লাগিয়ে আসবে, কাঁটায়-কাঁটায় আটটার সময় ডিনার নিয়ে চ'লে যাবে বেয়ারারা, একেবারে খাইয়ে-দাইয়ে সব নিয়ে চ'লে আসবে। দশটার মধ্যে সাবা।’

‘এও চুক্তিতে হয়?’

‘হয় না? বাঃ। আজ দশ বছর আমরা করছি কী?’

ননীবালা চমৎকৃত হলেন। ‘তবে কালকের ব্যাপারটাও চুক্তি ক'বে নিন।’

‘কাল কী হবে বলুন। আর উপলক্ষ কী তা-ও বলুন।’

‘আমার মেয়ের বিয়ে।’

‘ও, বিয়ে! তাহ'লে তো একটু হাঙ্গামার ব্যাপার। খাবার ব্যবস্থা ~~ক'রে~~ ক'রে হ'বে, ছাদে?’

‘না, লনে।’

‘লনে! বাঃ, তাহ'লে তো ভালোই। শামিয়ানা খাটিবে?’

‘না। অমনি খোলা থাকবে। ঝুটি-বাদলের দিন যখন নয়—’

‘তাই তো। তাছাড়া লনে খোলা পাটিই ভালো হয়। বেশ গ্রুপ ক'রে-ক'রে চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে ফুলদানি রেখে—এই রকম চান তো?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঐ রকম।’

‘ঠিক আছে। কতজন লোক হবে?’

‘ধরুন দেড়শো থেকে দু'শো—’

কর্মচারিটি মাথা নেড়ে খাতার উপর পেনসিল ঠুকতে লাগলো। একটু পরে বললো, ‘আর খাওয়ার লিস্ট কী হবে?’

‘কী হ’লে ভালো হয় বলুন তো?’

‘আপনি যদি ফুল ডিনার চান সে একবকম হবে, আর যদি অল্প সব বিয়ের মতো পোলাও, মাংস, মাছের কালিয়া, চপ, চাটনি এ-সব চান সে আর একরকম হবে। যেটা আপনার পছন্দ।’

উত্তর দিতে একটু চিন্তা করতে হ’লো ননীবালাকে। নিমন্ত্রিতদের কার কী রকম পছন্দ, কী রকম পদমবাদা এক লহমায় যেন সব ভেবে নিতে চেষ্টা ক’বে বললেন, ‘এক কাজ করুন, দু-রকম ব্যবস্থাই দিন, আদ্বৈক-আদ্বৈক।’

‘বেশ। আর আজকেরটা?’

‘আজ জন তিরিশেকের মতো মাংস পোলাওয়ের ব্যবস্থা ক’রে দিন।’

‘বেশ।’

‘কত খরচ হবে?’

‘তা কিছু বেশিই তো হবে। ডেকরেটরের ব্যবস্থাও তো আমাদেরই করতে হবে। আজকে এক গ্রন্থ, আবার কালকে এক গ্রন্থ। গেট সাজাতে হবে কি? আলো? আলোও তো লাগবে।’

‘গেট সাজাবেন? তাহ’লে তো খুব ভালো হয়। এ তো আর সাধারণের ব্যাপার নয়, রায়গড়ের রাজা আসছেন বিয়ে করতে, গেট তো সাজানোই উচিত।’

‘নিশ্চয়ই।’ কর্মচারিটি তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লো। ‘তাহ’লে আপনার কিছু বেশিই প’ড়ে যাবে।’

‘তা পড়ুক। আমার এই একটিই মেয়ে, আর টাকারও আমার অভাব নেই—’

‘তা তো ঠিকই। আচ্ছা আপনি বসুন, আমি হিসেব ক’ষে দিচ্ছি।’

বসলেন ননীবালা। এতো সহজে, এতো অল্প সময়ে, সম্পূর্ণ অত্তোর ঘাড়ে ভার দিয়ে যে-কাজটি সমাধা হ’তে যাচ্ছে এটা ভেবে হালকা লাগলো খুব। মনে-মনে তিনিও হিসেব কষতে লাগলেন, খরচটা কতদূর গড়াতে পারে, আর তিনি কতদূর পর্যন্ত উঠতে পারেন। খাওয়া খরচটা সোমেশ্বর দিতে চেয়েছে, আর্বাশি সেটা চেয়েছিলো জন্মদিনেব পার্টি হিসেবে, এখন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বিয়ের পার্টি। তা হোক, বলেছে যখন, তখন সে দেবেই, অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে, ননীবালাও তা নেবেন, কাজেই সেখানে খানিকটা বাঁচোয়া। আর যা বাকি থাকবে, তা-ও নেহাৎ কমে হবে ব’লে মনে হচ্ছে না, তা না হোক। বাজি হবেন ননীবালা। এমন সাজানোস্বজোনো সুন্দর ব্যবস্থা তিনি কি কখনোই ক’রে উঠতে পারতেন? তিনি জানেন কী? জীবন ভোর তো কুশাসন কলাপাতাই দেখে এসেছেন। তার উপর লোকবল নেই, জিব বেরিয়ে যাবে না এতোখানি? আর এই কেমন ছিমছাম, ফিটফাট, পবিত্কার। বাড়িতে রান্নার হাঙ্গামা নেই, লোক লাগিয়ে খাটাবার ঝকঝক নেই, স্ফাজো গোজো আর ফোঁপরদালালি ক’রে বেড়াও। ব্যস্। খরচের বডো একটি অঙ্কের জন্ত মনকে তিনি প্রস্তুত করতে লাগলেন।

দর কষাকষি অবশ্য হ’লো অনেকক্ষণ। তবুও শেষ পর্যন্ত মোটামুটি বেশ ভালো ব্যবস্থা ক’রেই হোটেল থেকে বেরলেন ননীবালা। এর পরে শাড়ির দোকান আর গয়নার দোকান। শাড়ি অনেক আছে মানসীর, আর পাবেও নিশ্চয়ই অনেক। ঠাকুরমশায় তার নির্দিষ্ট জায়গায় নেমে গেলে, মস্ত ব্যাগ থেকে একটা ফর্দ বার ক’বে তিনি চোখের সামনে মেলে ধরলেন। বেনারসি একখানা, মুর্শিদাবাদ সিঁদ্ব একখানা, একখানা

গোদাবরী কটকি, একথানা মাদ্রাজি। মোট চারখানা শাড়ি। সেই সঙ্গে মানিয়ে ব্লাউজ পছন্দ করে কেনাও জেতা দায়। মানসীর কোনো বন্ধুবান্ধব, অল্পবয়সী মেথেকে সঙ্গে আনলে ভালো হ'তো। ওদিকে জামাইয়েব জগু গরদের জোড়, পাঞ্জাবির মুগা, এ-সবও তো কিনতে হবে। তার উপরে সোনার জিনিসও আছে কিছু। একটা নেকলেস আর হাতেব একজোড়া বাল। এ-দুটোই মানসীর নেই, নৈলে ধীরে-ধীরে গয়না তিনি প্রায় সবই গড়িয়ে রেখেছেন। সোমেশ্বরকে একটি দামি আংটি দিতে হবে। আর মিনে-করা সোনার বোতাম। তাই দিয়ে আশীর্বাদ করবেন আজ, পাঁচজনে দেখবে।

ননীবালা মার্কেটে এসে নামলেন।

কলকাতা শহর। সত্যি আজব দেশ। টাকা থাকলে সব আছে। তা নৈলে একটা বিয়ের ব্যবস্থা! সোজা? যার জগু এক মাস ধ'রে কত মাঝুষের কত পরিশ্রম, কত খাটুনি, কত আয়োজন। সেই ছেলেবেলায় চপি-পিসির বিয়েতে লক্ষ্মীব মা-টা তো খাটতে-খাটতে ম'রেই গেলো। আর ননীবালা কিনা একখানা চার চাকার গাড়িতে ব'সে হাওয়া খেতে-খেতে দু-ঘণ্টাতেই সব সেরে ফেললেন? কী আশ্চর্য! পায়ের উপর পা রেখে নরম ক'বে নাচাতে লাগলেন তিনি।

বাড়ি-বাড়ি নেমে নিমজ্ঞণ করতে কিন্তু একটু কষ্ট হ'লো শেষে। বারে-বারে ওঠা আর নামা, মেপে-মেপে হাসা আর বলা, একটুখানি বসতেও হয় আবার। সবশেষে ফেরবার রাস্তায় কালিঘাটে বরেন-মামার বাড়িতেও নামলেন নিমজ্ঞণ করতে।

ততোক্ষণে বেলা ঢ'লে এসেছে, পডন্ত রোদের অসহ্য উত্তাপে গা ভিজ়ে যাচ্ছে ঘামে। চিড়বিড় করে উঠছে মাথার ভেতরটা। অথচ ফাল্গুন মাস।

এতো গরম হওয়া কি উচিত ? কলকাতার সবই অদ্ভুত। রাধানগরে পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়, আর ফাগুনের শীত আশুনের গায়। এখানে মোষ বাঘ আশুন সব সমান। শীতই নেই মোটে। ভালো-ভালো গরম জামাগুলো বাজেই পচে। এই তো গেল-এছর কত দাম দিয়ে কী সুন্দর কাশ্মিরি শালখানা কিনলেন, নিয়মমতো লাগত থাকলে আজ কি পারতেন না সেখানা পিঠে ফেলে বেরুতে ? আর পোষ মাঘ মাসেই বা কী ? কতটুকু শীত নামে ? ঐ বড়োদিনের সময়ে যা দু-চারদিন।

বরেন-মামার বাড়িতে নামবার আগে ড্রাইভারকে বলে অনেকবার হঠাৎ দেওয়ালেন ননীবালা, কিন্তু কেউ এসে দোতলার চিলতে বারান্দাটাতে লাড়ালো না, একটা বাড়ির একটা জানালাও এতোটুকু ফাঁক হ'লো না। আশা করেছিলেন কত মুখ কত দিক থেকে উকিরু'কি মারবে, নতুন ঝকঝকে গাড়িটা দেখতে-দেখতে ভাববে, 'কে এলো, কে এলো ?' বেয়্যারাটা এখন তার রাজকীয় পোশাক নিয়ে নেমে হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দেবে, চোখগুলো বড়ো-বড়ো ক'রে অপেক্ষা করবে গাড়ির আরোহীটিকে দেখবার জন্য। শাদা ধবধবে দুধ-গরদ প'রে তখন ধীরে-ধীরে নেমে আসবেন ননীবালা। কিন্তু হতাশ হলেন। ঠোঁট বঁকিয়ে মনে-মনে বললেন, নিষ্কন্মা মেয়েমানুষগুলো ঘুমুচ্ছে এখনো।

সদর দরজা খোলাই ছিলো। তিনটে বেজে গেছে, ঠিকে-ঝিয়েরা এসে গেছে বাসন মাজতে। একতলার উঠানে সরকারি কলতলাটা রমরম করছে তাদের কাংশুনিন্দিত কণ্ঠের আলাপে আর বাসনমাজার পটু হাতের ঘষঘবানিতে। পচা ভাত তরকারি, জল আর ছাইয়ের সমন্বয়ে একটা ভ্যাপসা বিজ্রী গন্ধ উঠছে জায়গাটাতে, চলাফেরার রাস্তাটা জলে

জলাকার। ননীবালা পাশ কাটিয়ে নাকে রুমাল চেপে কোনোরকমে উঠে গেলেন দোতলায়, কতকাল পরে এই ধরনের একটা বাড়িতে পা দিয়ে গা ঘিনঘিন কবলো তাঁর। এ-বাড়ি ছেড়ে সেই যে তিনি মেয়েকে নিয়ে তেরো টাকার ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন তারপরে এই এলেন। যাবাব আগে এঁদের সঙ্গে একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গিয়েছিলো। মাস্টারমশায়ের পক্ষপাতিত্বে এমনিতে আগুন হ'য়ে ছিলো সবাই, ঘর ভাড়া নিয়ে হঠাৎ এ-ভাবে উঠে যাবাব চক্রান্তে সে-আগুন শতগুণ হ'য়ে জ্বলে উঠলো। কি নেই, চাকর নেই, বিনা নোটিশে এ-রকম চলে গেলেই হ'লো? আগুনটা অবিশি মামীই উদগার কবেছিলেন বেশি, কেননা অসুবিধেটা তাঁকেই ভোগ করতে হবে। আপিশেব ভাত, স্কুলেব ভাত, মসলা পেয়া, মাছ কোটা, ছেলে বাখা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাড়া, ঘর মোছা, সবই তো এক-হাতে ঠেলতে হবে তাঁকে। মেয়ে দুটো তো সাজেব লাঠি। কোনো কাজে এগুবে নাকি? গান কববে, বাজনা বাজাবে, ফুটুক-ফুটুক ছুটুক-ছুটুক এ-জানালায় ও-জানালায় দাঁড়িয়ে কষ্টিনষ্টি করবে উন্টোদিকের রাইবাবুব কাজিল ছেলেটার সঙ্গে — মাথায়-মাথায় দুটোকে ঠুকে দিলেও হ'শ হবে না।

সেদিন ননীবালাও গ'র্জে উঠেছিলেন সমানে-সমানে। কেন? ভব কিসের? আর কি তিনি এদের আশ্রয়ে থাকছেন? ভাসতে-ভাসতে কুটোটা ধরেছিলেন ব'লে নাকানি-চোবানি তো কম খাওয়ান নি এঁরা, অনেক সয়েছেন, অনেক মুখ বুজে থেকেছেন, কিন্তু আর না। আজ তিনি পায়ের তলায় মাটি পেয়েছেন, সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ তিনি জন্মেব শোধ জবাব দিয়ে যাবেন, দুটো ভালো-মন্দ কথা খুব ভালো ক'বে শুনিবে দিয়ে যাবেন, জানিয়ে যাবেন বলতে-কইতে শুধু তাঁরাই পারেন না, বিধাতা তাঁকেও একখানা মুখ দিয়েছেন, আর সে-মুখের ধার বডো সহজ নয়। কোমরে কাপড় বেঁধে ডিঙি মেঝে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি, 'কী,

কী বললে? আমরা ধড়িবাঁজ? আমার মেয়ের স্বভাব খারাপ! আর তোমরা? তোমরা কী? তোমাদের জানি না? তোমাদের চিনি না? মুখ তোমাদের থ'সে যাবে, পুড়ে যাবে, কুরুকুষ্ঠি হবে।' কুষ্ঠিত টুনি দুই হাতের সজোর আকর্ষণে মাকে টেনে নিতে-নিতে বলেছিলো, 'ছী, ছি, এ-সব তুমি কী বলছো? মা? কী করছো?' মেয়েকে এক ঝটকায় উল্টে ফেলে দিয়ে ননীবালা আবার মামীর মুখের কাছে এসে দাঁড়ালেন। একবার যখন শুরু করেছেন, এখনি সেটা সাক্ষ্য করবেন তেমন পাত্রই নন তিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যে কলহটি এমন অবস্থায় দাঁড়ালো যে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। বরেন-মামা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিলেন, ছেলেমেয়েরাও খানিকক্ষণ পবে ঘরে গিয়ে ঢুকলো, মামীও থমকালেন, কিন্তু ননীবালা থামলেন না। দুটি ঘণ্টার মধ্যে ছাতে, দেয়ালে, কলতলার আবর্জনার স্তুপে, রেলিঙে, কোথাও একটি কাক চিল বসতে পারলো না। অগ্নি ভাড়াটেরা ভিড় ক'রে মজা দেখতে লাগলো, আশে-পাশের বাড়ির বাসিন্দারা চকিত হ'লো। ছোটো ছেলেরা কাঁদতে লাগলো, তবু নিরুত্তি নেই। ননীবালা গাঁয়ের মেয়ে, গাঁয়ের বউ, যতদিন বউ-কাল গেছে, গেছে, তারপরই তো স্বাধীন। চিরদিন প্রিয়নাথবাবুকে দাপটে রেখেছেন, অনেক যুঝে-বুঝে সংসার করেছেন, কারণে-অকারণে পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে গলা লুটিয়ে ঝগড়া করেছেন, নিন্দে করেছেন, স্তুতি করেছেন—অনেক লড়াইয়ে জিতে এ-বিষয়ে রীতিমতো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়েছেন তিনি। কলকাতা আসবার পরেই না হয় অবস্থার বিপর্যয়ে ইঁদুর হ'য়ে গর্তে ঢুকেছিলেন, কিন্তু সেদিন, অতদিন পরে মুখ ছুটিয়ে বেশ ভালো রকম একটা জমজমাট কলহ করতে পেরে ভালোই লেগেছিলো, দম-বন্ধ-করা দুঃখের নৌকোয় খোলা বাতাসের পাল উঠেছিলো, মনটা হালকা হয়েছিলো। বরং শেষ পর্যন্ত সব চূপ হ'য়ে

যাওঘাষ হতাশই হলেন একটু। মনে মনে ধিক্কাব দিলেন। এই ? এইটুই শক্তি নিয়ে এতো বিক্রম ?

পথে বেরিয়ে টুনি বলেছিলো, ‘তুমি অগ্নায় কবেছো।’

‘কেন, অগ্নায় কেন ?’ কথা শুনে গা জ্বালা কবেছিলো ননীবালাব ঠাম ক’বে একটা চড মাঝতে ইচ্ছে কবেছিলো মেঘেব গালে। অগ্নাদিবে তাকিয়ে টুনি বলেছিলো, ‘হাজ্জাব হোক, ওবাই আমাদের দুঃসময়ে আশ্রয় দিযেছিলেন। তাড়িয়ে দেন নি, শত্রুতা কবেন নি, ব্যবহাবও এমন কিছ—

মেঘেব অশ্রুট গলাব ধর্মকথা ননীবালা তৎক্ষণাত্ তাব প্রবল কণ্ঠে গর্জনে সমুদ্রেব মধ্যে এক টুকরা ঝড়িব মতো ডুবিয়ে দিযে বললেন ‘আহা বে আমাব ভালো ব্যবহাব, আমাব সাতকালের দবদী বন্ধু, দিন বাত বিনি পয়সাব দাসী খাটিযে কী উপকাবই না কবেছেন। ছোটো লোক। ইতর। ছু বেলা ছুটো খেতে দিযে তো ছুটো কুত্তা পুষেছে, তাব আবাব লগ্না চওডা কথা। দেহে গতবে খাটিযে খাটিযে একেবাবে ফোঁপনা ক’বে ছেড়েছে শয়তানেব বাচ্চাণা। তাদেব সঙ্গ আবাব ইযে। গ্নায় আর অগ্নায়।’

একদণ্ডে টুনি ঠাণ্ডা।

সেই ঝগড়াব বেশ এখন অবিাশ্র মুছে গেছে। মনে বাখেন নি ননীবালা, বরদাাত্রী মতো প্রসন্ন হাস্তে সব তিনি ক্ষমা করেছেন। এমন কি লেকেব ধারে জুতো পাযে খু ডিযে খু ডিযে বেডাতে বেডাতে হঠাৎ একদিন বরেন মামাকে দেখে বেশ খুশিই হয়েছিলেন। খুশি মনেই কথা বলেছিলেন। প্রত্যেকটি কথাব ফাঁকে-ফাঁকে বরেন-মামার মুখের পেশীতে যে-সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোডন উঠতে দেখেছিলেন তাতে প্রায় চোঁচিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করেছিলো তাঁব।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এসে ঘরের সামনে ননীবালা থমকে দাঁড়ালেন। মামীমা মাহুরে গড়াচ্ছিলেন, কচি বাচ্চাগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমচ্ছে মায়ের সঙ্গে, ছোট্টো ঘরটা যেন থিকথিক করছে মাহুরের ছানায়। ননীবালা হাতের স্বগন্ধি ক্রমালে, মুখ মুছলেন, পায়ের জুতোটা খুলবেন কি খুলবেন না ঠিক করতে পারলেন না।

চোখ খুলে হাঁ হ'য়ে গেলেন বরেন-মামী। ননীবালার স্তম্ভজিত দেহ ঘিরে অনেকক্ষণ ধ'রে থেমে রইলো। তাঁর বিস্মিত চোখ, তারপর অসংবৃত আঁচলে গা মাথা ঢেকে ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে বললেন, 'ও মা, ভাগ্নি নাকি? আমি তো চিনতেই পারি নি। এসো, এসো। বোসো। মামীকে তবে মনে পড়লো এতোদিনে?' সন্তুষ্ট আর খুশি ফুটে উঠলো সেই অভ্যর্থনার স্বরে; হাত দিয়ে নোংরা বালিশটা খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে, একটা বাচ্চাকে সরিয়ে তিনি বসবার জায়গা ক'রে দিলেন ভাগ্নিকে।

ননীবালা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই মুখে নরম হাসি ছড়ালেন, 'মনে পড়বে না কেন? তোমরা কি আমার পর? না কি কোনোদিন দেখেছি সেই চোখে?'

'না, তা তুমি সত্যি ঝাখো নি।' সব ভুলে গ'লে গেলেন মামী।

'কই, ছুটকি ফুটকি কই?'

'ফুটকির তো বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে, সে খণ্ডরবাড়ি।'

'ও মা, তাই নাকি? কেমন বিয়ে হ'লো? বর কী করে?'

'হ'লো একরকম মন্দ না। এখন তো ছুটকির জুটই ভাবনা। তোমার মামা তো একেবারে হয়রান হ'য়ে গেলেন, জুটছে কই? আর জুটবেই না কী বলো? টাকাকড়িরও জোর নেই, চেহারারও জৌলুস নেই।'

'গান-টান করছিলো তো—'

'আর গান—মাথা নেই তার মাথাব্যথা। তা তোমার খবর কী? বোসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

ননীবালা সস্তর্পণে বসলেন ; কিন্তু বললেন, ‘না ভাই, আর বসবো না, বেলা গেছে ।’

‘এলেই তো বেলা ফুরিয়ে, বেলার আর দোষ কী বলো ? তোমার মামা আস্ত্রন, চা জলখাবার করি, তারপর তো যাওয়ার কথা—’

‘ওরে বাবা, চায়ের কথা আর ভাবতেই পারছি না খালি পেটে— বাড়ি গিয়ে চান ক’রে যা হোক কিছু দাঁতে কেটে একটু বসতে পারলে এখন বাঁচি ।’

‘সে কি ! এই অবেলায়, এখনো নাও নি খাও নি নাকি ?’

‘সময় আর পেলাম কই, একলা মানুষ, সব দিক তো সামলাতে হচ্ছে ।’

‘এতো ব্যস্ততা কিসের ? আর কোথাও গিয়েছিলে ?’

‘সারাদিনই তো ঘুরছি, কেনাকাটা, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ— অবিশ্রি চাকর-বাকরের অভাব নেই, কিন্তু তাই ব’লে তোমাদের নিমন্ত্রণ তো আর আমি লোক পাঠিয়ে করতে পারি না । তাছাড়া কতদিন দেখি না—’

‘নিমন্ত্রণ ! কিসের নিমন্ত্রণ ?’

‘টুনির বিয়ে ।’

‘টুনির বিয়ে ? তাই বলো । খুব ভালো কথা । খুব সুখের কথা । কী মেয়েই তুমি পেটে ধরেছিলে ভাগ্যি । একেবারে রত্নগর্ভা । কত নাম, কত যশ, টাকাকড়িও নিশ্চয়ই যথেষ্ট রোজগার করে ?’ মামীর একেবারে কৃতার্থ গলা ।

ননীবালা চোখ টান করলেন, ‘তা তো একটু করেই । এই ধরো না গিয়ে মাসে বাড়িভাড়াটাই তো দি তিনশো টাকা (পঞ্চাশ টাকা বাড়ালেন), তারপর ধরো গিয়ে ঝি-চাকর মিলে জনা চারেক খাটে (একজন বাড়ালেন), তাদের মাইনেও কি সোজা নাকি ? চার জনেই ওরা সস্তর টাকা (আসলে চল্লিশ) টানে । তার উপরে ধরো গিয়ে

আলোটা পাখাটা, পাটি সন্মেলন, জন্মদিনের উপহার, পজিসন মতো পোশাক-আশাক— তা থাক গে সে-সব। কাল রাত্তিরে তোমরা সবাই যাবে। থাকে-দাবে বিয়ে দেখবে, একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে আর কি। মামাকে বোলো। নিমন্ত্রণ-চিঠিটা আনতে আবার ভুলে গেছি, সে না-হয় কাল পাঠানো যাবে, কিন্তু নিজে ব'লে গেলাম, মনে থাকে যেন।’

‘নিশ্চয়ই থাকবে। তুমি যে মেয়েব বিয়েতে ভোলো নি, তাতে আমি কত খুশি হলাম—’

‘খুশি আর কী, এ তো আমার কর্তব্য।’

‘সেই কর্তব্যই বা ক’জন মনে রাখে বলো? তা বিয়ে কোথায় ঠিক হ’লো?’

ননীবালা হাসলেন, ‘রায়গড়ের রাজবাড়িতে। ঐ যে গো, শ্রামবাজারে মস্ত গম্বুজওলা বাড়ি, সবাই তো চেনে, বাগচি-লজ। অত বড়ো বাড়ি ঐ তল্লাটে আর নেই। থাকবে কী, রাজরাজড়ার কাণ্ডই অল্প রকম। তাদের সঙ্গে আর কে পাল্লা দেবে বলো।’

‘রাজা!’ মামী ফ্যালফ্যাল ক’রে তাকিয়ে রইলেন।

‘একদিন গিয়েছিলাম বাড়িটার ভেতরে, বাক্সা, কী বিশাল। রাজ-বাড়িই বটে। আমার তো রীতিমতো ইয়ে লাগছিলো। মহলের পর মহল পার হ’য়ে যখন একেবারে অন্তরে গিয়ে পৌঁছলাম, বলবো কি তোমাকে, হাটতে-হাটতে আমার ঘাম ছুটে গেছে। অত বড়ো বাড়ি কি একদিনে দেখে ওঠা যায়? হাতিশাল, ঘোড়াশাল, পক্ষীশালা, রন্ধনশালা, অতিথি-শালা, জাদুঘর— কত যে আছে বাড়িটার মধ্যে— তারপর গিয়ে তোমার জলসাঘর, পরিখা, বাগান, ফোয়ারা—’

বরেন-মামীর গলায় কফ আটকালো, দু-বার কেসে নিয়ে বললেন, ‘সেই বাড়িতে বিয়ে?’

পাশের ঘর থেকে ফট ক’রে তাঁর মেজো মেয়ে বেরিয়ে এলো, ‘আপনি “বাগচি-লজ্জা”-এর কথা বলছেন? সোমেশ্বর বাগচিদের আদিবাড়ি?’

‘ঐ ঠাথো, মেয়ে তোমার সব জানে। ও মা, কত বড়ো হয়েছিল রে মাথায়? চিনিস নাকি সোমেশ্বরকে?’ ননীবালা হেসে খুন।

ভুরু কঁচকে এতোখানি ঘাড় নাড়লো ছুটকি, ‘হ্যাঁ-অ্যা। আমাদের স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে এসেছিলেন যে। প্রাইজ দিলেন।’ তার চোখে-মুখে দস্তুরমতো শ্রদ্ধা ফুটলো, ‘ঠিক নেকড়ে বাঘের মতো একটা মস্ত কুকুন আছে, গুঁর সঙ্গে গাড়ি চ’ড়ে বেড়ায়। এখন তো উনি কুইন্স পার্কে থাকেন, লাল টকটকে চেহার।। ওঁদের মহারাজা খেতাব, জানেন?’

‘আর না-জেনে কী করি বল? কুটুন্স হচ্ছে যখন।’

‘ওঁদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে এ-পাড়ায়, তাদেরও অনেককে আমি চিনি। আমার সঙ্গেই তো দুটি মেয়ে পড়ে, তারপর এই সামনের হরিশবাবুর বড়ো ছেলেও ওঁদের জ্ঞাতিভাই—’

‘ঐ জ্ঞাতি ফ্যাতি দিয়ে কী হবে,’ ঠোঁট বাঁকালেন ননীবালা, ‘ঐ সোমেশ্বরই তো আমার জামাই হচ্ছে। না বাপু, উঠি এবার, গাড়িটা আবার দাঁড়িয়ে রয়েছে—’

‘সোমেশ্বর! সোমেশ্বর বাগচি!’

‘তাই তোমার বোনঝির মন ওঠে না। হাতে পায়ে ধ’রে কত সাধ্য-সাধনায় তবে না সোমেশ্বর মন পেয়েছে মেয়ের।’

‘সোমেশ্বর বাগচির সঙ্গে টুনির বিয়ে হচ্ছে?’

‘কী বলবো, নিজের মেয়ে, লজ্জাও করে, টুনি হেঁটে গেলে সোমেশ্বর বুক পেতে দেয়, মুখভার হ’লে ছুনিয়া অঙ্ককার দেখে, ঐ মেয়ের জন্তু সে জলে কাঁপ দিতে পারে, আগুনে পুড়তে পারে, এমন ভালোবাসা দেখি নি কোনোদিন, আর আমার মেয়ের কিনা মন ওঠে না।’

বরেন-মামী এ-সব নাম-ধাম কিছুই জানতেন না, তবুও ব্যাপারটা যে কিছু সহজ নয় সেটা বুঝলেন। কেমন অর্থহীনভাবে একবার মেয়ের দিকে আর একবার ননীবালার দিকে তাকাতে লাগলেন। অনেক পরে বললেন, ‘তাহ’লে মেয়ে তোমার রানী হচ্ছে?’

ননীবালা শরীরের মেদে, শাড়ির ভাজে তরঙ্গ তুলে উঠে দাঁড়ালেন, জুতোটা পায়ে ঢুকোতে-ঢুকোতে বললেন, ‘তা হচ্ছে।’ এক পা এগিয়ে দরজা ধ’রে, ‘তাহ’লে কাল তোমরা যেয়ো!’

মামীও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সঙ্গে-সঙ্গে, অক্ষটে কী বললেন শোনো গেলো না। ননীবালা ছটকির দিকে তাকালেন, ‘যাস রে। মাসি মাস্তম্ব, বোনঝির বিয়েতে গিয়ে খাবি-দাবি, আমোদ-আহ্লাদ, সর্দারি এ-সব করবি তবে তো? শোনো মামী, বিয়ে কিন্তু একেবারে সন্ধ্যার লগ্নেই, দেরি কোরো না যেতে। ঐ ছাখো ভুলে গেলাম। চল তো ফুটকি, এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে আসবি গাড়ি থেকে।’

হাতের মুঠো আলগা হ’য়ে গেছে ননীবালার। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মা-মেয়ের মুখের দিকে তিনি পলকপাত করলেন। মেয়েটি নড়লো না। শিথিল গলায় বললো, ‘মিষ্টি দিয়ে কী হবে?’

মামীমা ঝংকার দিলেন, ‘আহা, এতো বড়ো দিদি বলছে, মেয়ের যেন একটা মাস্তমাননা নেই।’ বলে নিজেই নামতে লাগলেন ননীবালার পিছে-পিছে।

নিচে নেমে এসে গাড়ির দরজাটা সবখানি খুলে ধরলেন ননীবালা, আকর্ষণ জিনিসপত্রে ঠাসা। মিষ্টির হাঁড়িগুলো সামনেই ছিলো, তবু তিনি এটা হাঙড়ালেন, ওটা হাঙড়ালেন, বেনারসির বাস্কাটা অথবা ফেলে দিলেন হাতের ঠেলায়, তারপর ঠিক আছে কিনা, নোংরা লাগলো কিনা দেখবার জন্য বাস্কাটা খুলে একশো দশ টাকা দামের শাড়িটা মামীর

চোখের সামনে নাড়াচাড়া করলেন। এ-পাশে স'রে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'বাহাদুর সিং।' .

'জী।' ড্রাইভারের পাশে ব'সে থাকা পোশাক-আটা নেপালি বয় ত্রস্তে ছুটে এলো কাছে, এসে সেলাম করলো।

ননীবালা সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে আদেশ দিলেন, 'একঠে। মিঠাইকা হাড়ি বাহার কর দাও তো।'।

নেপালি বয় পরিষ্কার বাংলা শিখেছে। ননীবালা জানেন সে-কথা। হিন্দি বলতে যে তিনি পটু নন সে-কথাও জানেন। আর এও জানেন বাড়িতে তিনি বাহাদুরের সঙ্গে বাংলায়ই কথা বলবেন। কিন্তু তাই ব'লে লোকের সামনে তো চাকর-বাকরের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে বলতে পারেন না। আড়চোখে মামীর মুখের দিকে তাকালেন একবার। বাহাদুর তৎক্ষণাৎ ছকুম তামিল করলো।

এবার ননীবালা মিষ্টি হেসে গাড়িতে উঠে বসলেন। 'তাহ'লে যাই, মামী?'

মামী মিষ্টির হাঁড়িটা বুকে চেপে ধ'রে শুধু ঘাড় নাড়লেন। আর গাড়ি ছেড়ে দেবার পরও যে তিনি অনেকক্ষণ হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে, পিছনের কাচ দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে ~~সেদিকে~~ দেখলেন ননীবালা। গভীর তৃপ্তিতে শরীরটা যেন অবশ হ'য়ে এলো।

বাড়ি এসে প্রথমেই মেয়ের ঘরে ঊকি দিলেন। চুপচাপ পাশ ফিরে শুয়ে আছে বিছানায়, বুঝতে পারলেন না জেগে আছে, না ঘুমুচ্ছে। এক-বার ডাকলেন, সাড়া পেলেন না। ইচ্ছে ছিলো জিনিসগুলো দেখান হ'লো না। বাড়িটা নিঝুম। যদিও উচিত নয়, চারটে প্রায় বাজে আজ শুয়ে-ব'সে কাটাবার দিন নয়। কত লোক আসবে, তার জ্ঞ

প্রস্তুতি আছে। ঘর-বাড়ি গুছোনোই কি একটা সহজ কথা নাকি? সোমেশ্বরকে আসতে বলেছেন সাতটার সময়ে। সাতটা-পয়তাল্লিশ মিনিটে আশীর্বাদে সময়। অতিথিরা আসবেন আরো খানিক পরে। রাত্তিরের নিমন্ত্রণ তাঁদের। আর হোটেলের লোকেরা তো চেয়ার টেবিল সাজাতে এলো ব'লে। ভাগ্যিস সব ব্যবস্থা চুক্তিতে সেরে এসেছেন, নৈলে কী হতো ভাবতেই এখন ভয় করছে। অবিশিষ্ট এটা তিনি আগাগোড়াই ভেবেছিলেন যে মাংস আর চপ-কাটলেট কোনো রেস্টোরাঁ থেকেই কিনে আনবেন, এর আগেও একবার এনেছিলেন। টুনির এক ভক্ত ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলো। কিন্তু ভাত মাছ ডাল সব-কিছুর ভারই যে নিতে পারবে তারা তা ভাবেন নি। কী সুবিধেই না হ'লো। তা নৈলে এই সব অকম্মা ঝি-চাকর দিয়ে কিছু করতে হ'লেই হয়েছিলো আর কি। আর মেয়ের কথা না-হয় না-ই তুললেন। ভূতে ধরেছে আবার। এখন ভগবানের ইচ্ছায় কোনোরকমে বিয়েটা দিতে পারলে তিনি বাঁচেন।

ঝি দু-জনকে বকতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ডাকবার আগেই বিশ্রাম ত্যাগ ক'রে কাজে লেগে গেলো তারা। একজন ব্যস্ত হ'য়ে গ্যাস জালিয়ে ননীবালার খাবার গরম করতে বসলো, একজন কাপড়চোপড় পাট করতে এলো। ছোকরা চাকরটাও ঘর ঝাঁট দিতে লেগে গেলো। ননীবালা চোখ দিয়ে পরখ করতে লাগলেন কোথায় কী ভাবে এতো লোকের বসবার এবং খাবার একটা সুব্যবস্থা করা যায়। ড্রয়িংরুমটা খুব বড়োই আছে, পাশে-পাশে সোফা কোঁচগুলো ঠেলে সারা ঘর জুড়ে যদি দামি কার্পেট আর চাদর বিছিয়ে দেন, দেখাবেও সুন্দর, ভালো ক'রে বসতেও পারবে। আশীর্বাদও এ-ঘরেই হবে। আর খাওয়ার ব্যাপারটা ছাতে করলে কেমন হয়। সেখানে আলো-টালো সবই আছে। আজ ছাতে, কাল লনে, সেও একটা বেশ নতনত্ব হবে। আবার এদিকে ঘর-বাড়ি ওলোটপালোট

হবে না, জিনিসপত্র টানাটানি হবে না। তাই ভালো। নিশ্চিন্ত হলেন মনে-মনে। এর পরে কয়েকটা ফোন করলেন তিনি, যাদের করলেন তারা সবাই (ননীবালার মতে) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, ঈর্ষুক, আজকের এই মৌভাগ্যে তাদের বুক ব্যথা করবে, রাগিত্তিরে ঘুম হবে না।

এই সব সেরে স্বান ক'রে দুটি মুখে দিয়ে ডেক-চেয়ারটিতে বসলেন এসে। আজ আর ভালো ক'রে শোবার সময় কই? কেবল মিনিট কয়েক শরীরটাকে একটু শিথিল করা, ছেড়ে দেওয়া। চারজন বি-চাকর বেয়ারা, আর একজন অধীনস্থ অবনত ভদ্রলোকের দুঃস্থ ছেলেকে (সোমেশ্বরের সেই ছেলেটি) ক্রমাগত একটার পর একটা ফরমাশে ব্যাকুল ক'রে রাখতে-রাখতে ভাবলেন : 'একটা দিন না-হয় না-ই ঘুমোলাম, না-ই বিশ্রাম করলাম। গাধাগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে না-চালালে এগুলো কি চলবে? মাথা তো সব গোবরে ঠাসা।'

.... তিন

বেলা গড়ালো। রঙিন বিকেল আবার ছড়ালো চারদিকে। লেকের তীরে ধীরে-ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। সুন্দর সময়। দিন বড়ো হয়েছে আজকাল, দুপুর লম্বা হয়েছে। যাই-যাই ক'রেও সূর্য দেরি করে অন্ত যেতে, চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে নিজের লাল আর গোল আর প্রকাণ্ড ছায়াটি দেখে জলের আয়নায়। তারপর কখন যেন টুপ ক'রে ডুবে যায়। মানসীর দক্ষিণ-পশ্চিম-খোলা ঘরের মস্ত জানালা দিয়ে তার ম্যাজেণ্টা আভা অনেকক্ষণ ছড়িয়ে থাকে ঘরে। অল্প দিন সেই সময়ের মধ্যে মানসীর গা-হাত-পা ধোয়া সারা হ'য়ে যায়, অগন্ধি সাবানের মুছ সৌরভে ঘরের বাতাস আলোড়িত করতে-করতে সে চিকনি চালায় লম্বা চুলে। গুলগুন

ক'রে হুয়ের আগুন ছড়ায়। সন্ধ্যাগুলো সুন্দর কাটে। যেন জলের স্রোতের মতো ব'য়ে যায় গান-বাজনা আর আলাপে উৎসবে।

কিন্তু আজ কী হ'লো তার? এমন শুভদিনে?

চুপচাপ সে ব'সে থাকলো জানালার তাকে ছবি হ'য়ে। সূর্যাস্ত দেখলো, দেখলো সন্ধ্যা আর রাত্রির সংগম। যখন অন্ধকার হ'য়ে গেলো তখনও নড়লো না। নড়বার কথা মনে হ'লো না তার। আর ওদিকে ননীবালা সব কাজকর্ম সেরে কাপড়-চোপড় বদলে প্রস্তুত হ'য়ে নিলেন অতিথিদের জগ্ন। এতোক্ষণ ছাতেই ছিলেন। মস্ত বাড়ির মস্ত ছাত, সুন্দর দেখাচ্ছিলো খোলা ছাতে খাবার টেবিল সাজিয়ে। লোকগুলোর পছন্দ আছে, মাঝে-মাঝে ফুলদানিতে ফুল রেখেছে আবার। রেখেছে প্লেট আর কাঁটা-চামচে। ননীবালা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এটা তাঁরই ব্যবস্থা, তাঁর বাড়িরই ঘটনা। ঘড়ির কাঁটা ছ'টায় পৌছতে-পৌছতেই সব ফিটকাট। তিনিও নেমে এলেন ছোকরা চাকরটাকে পাহারা বসিয়ে।

পাহারার ঘরের পাশের চৌবাচ্চাওলা বাথরুমটাতে স্নান করেন তিনি। যদিও এই খানিক আগে স্নান করেছেন, তবুও আবার ঢুকলেন। হাতে-কলমে না-হয় কিছু না-ই করেছেন, তাই ব'লে পরিশ্রম তো কিছু কম হয় নি? কালিঝুলিও কম লাগে নি শরীরে। কোথায় কী করা হবে, কী সরানো হবে, কী সংযোগ হবে, কী ধরনে সাজালে সুন্দর হবে সবই তো তাঁকেই দেখিয়ে দিতে হয়েছে। সেই একটু ডেক-চেয়ারে বসেছিলেন কখন, তারপর থেকেই তো পায়ের তলায় সর্ষে, ঘুরছেন তো ঘুরছেনই। এই আসছে ডেকরেটররা, এই আসছে হোটেলগুলারা, এই আসছে ফুল, আসছে শুভেচ্ছা, ঝি ডাকছে, চাকর ডাকছে, বেয়ারা ডাকছে, একেবারে হস্তদস্ত। সাতটা বেজেছে, বেশি পাওয়ারের আলো জ্বালা হয়েছে বসবার ঘরে, ঝকঝক করছে ঘরখানা। এখনো সোমেশ্বর এসে পৌছয় নি, এলে

ব'লে । তাই ননীবালা তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, সেজে
 নিলেন । এই ব্যস্ততার মধ্যে মেয়ের কথা বেশি ভাববার সময় পান নি
 তিনি । চকিতে দু-একবার মনে হ'য়েই মিলিয়ে গেছে । এইবার পর্দা সরিয়ে
 ঘরের দরজায় এসে অন্ধকার দেখে থমকে দাঁড়ালেন । একবার মনে হ'লো
 বোধহয় স্নান করতে ঢুকেছে বাথরুমে, তাই ঘরের আলো নেবানো ।
 পরমুহূর্তেই বুঝলেন তা নয় । বাথরুমে যাবার সময় ঘরের আলো নিবিয়ে
 যাবে এতো হিসেবি নয় তাঁর মেয়ে, তাছাড়া বাথরুমের দরজাটিও আধো-
 ভেজানো । অন্ধকার । জানালার লম্বা ছায়াটি আধো-অন্ধকারে ন'ড়ে
 উঠলো, সেদিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত শব্দ থেকে আপাদমস্তক জ'লে
 উঠলো তাঁর । কঠিন গলায় ডাকলেন, 'টুনি ।'

'গ্যা !' চমকে মুখ ফেরালো মানসী ।

'অন্ধকার কেন ঘর ?'

'ও ।'

'আলো জ্বালতেই মনে নেই দেখছি ।' নিজেই এগিয়ে এসে দেয়ালে
 হাত বাড়ালেন । আলোকিত ঘরে মেয়ের বিশ্রুস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে
 বললেন, 'এখনো চান করিস নি তুই ? চুল বাঁধিস নি ?'

'এই যাই ।' কুণ্ঠিত মানসী সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো ।

'যাই মানে ? এতোক্ষণ করলি কী তবে ?'

'ব'সে ছিলাম ।'

'ব'সে ছিলি ?'

'যাচ্ছি স্নান করতে । দেরি হবে না ।'

'তোর হয়েছে কী শুনি ?'

'কী হবে !'

'তা আমার জানবার কথা নয় ।'

আলনা থেকে তোয়ালে জামা টেনে নিলো মানসী।

‘আমি কাল থেকেই লক্ষ্য করছি,’ রোষে প্রায় ফুঁশতে-ফুঁশতে ননীবালা উচ্চারণ করলেন, ‘আবার রোগে ধরেছে তোমাকে। কেন, হয়েছে কী জানতে পারি সেটা?’

এবারও জবাব দিলো না মানসী। ননীবালা বললেন, ‘বাড়িতে একটা কাজ, সারাদিনে একবার ঘর থেকে বেরুতে দেখলুম না, একবার নড়লি না, একগাছা কুটো নাড়লি না। বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকা দরকার।’

মুখ তুললো মানসী, ‘বাড়াবাড়ির কথা উঠছে কিসে? তুমি তো জানো, আমার শরীর ভালো না।’

‘শরীর তোমার ঠিকই আছে, আসলে বলো মন ভালো না।’

‘তা কী করবো।’ মানসী বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো, ‘মন থাকলেই তার ভালো লাগা মন্দ লুগা থাকে।’

মেয়ের দিকে ননীবালা ভীষ দৃষ্টিতে তাকালেন, ‘আমাদের আর মন নেই, মন কেবল একলা তোমাকেই দিয়েছেন বিধাতা।’

‘হয়তো।’

‘তার মানে তুই বলতে চাস এ-সব ব্যাপারে তোর কোনো মন বা ইচ্ছে বা গরজ, কিছুই নেই। সবই আমার আয়োজন। সোমেশ্বরকে তুই নিজের মুখে কথা দিস নি?’

‘ও-সব কথা উঠছে কিসে?’

‘কিসে নয়? বিয়ে করবি তুই, ঠিকও করেছিস তুই, আর এখন দোহাই দিচ্ছিস আমার।’

‘তোমার?’

‘তাছাড়া আবার কী? মনের কথা বুঝতে কি মুখের কথার দরকার হয়?’

‘তর্ক করতে ভালো লাগে না, মা।’

‘তা কেন লাগবে? সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতেই তোমার ভালো লাগে। অলক্ষ্মীতে পেলে এই হয়। ভগবান যা দিয়েছেন, তা তোর সহিবে কেন? রাধানগরের ভাড়া বাড়ি আর ছেঁড়া কাঁথা চাই যে। তারই যোগ্য তুই।’

মানসী বাথরুমের দরজা ধরে চূপ। অভ্যাসবিরুদ্ধভাবে অনেকক্ষণ প্রতিবাদ করে সে ক্লান্ত।

ননীবালা গলা ককশ হয়ে উঠলো, ‘খেতে পেতিস না, পরতে পেতিস না, শেয়াল-কুকুরের মতো ঘুরঘুর করতিস দাওয়ায়-দাওয়ায়, আব মনে-মনে ভাবতিস কেউ এসে রাজা ক’রে দেবে বুঝি, একটা বিশ্বাসঘাতক, ছোটোলোকের জন্তু সারাদিন গলা উচিয়ে থাকা—’

‘মা!’

‘শোন টুনি,’ ননীবালা দু-পা এগিয়ে এসে মুখের সামনে আঙুল নাড়লেন, ‘সাপের ভক্তি যেমন বেদের অজানা নয়, তেমনি তুই কী ভাবছিস, কী মনে ক’রে মড়ার মতো সারাদিন নেতিয়ে আছিস ঘরের কোণে তা-ও আমি জানি। আমার চোখে তুমি ধুলো দিতে পারবে না।’

মানসী নিঃসাড়।

‘কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও জেনো, আজ যদি হঠাৎ কোথাও তাকে দেখতে পাও, তুমি দেখবে স্বপ্ন তোমার স্বপ্নই। তোমার সঙ্গে আজ আর তার কোনো মিল নেই। রাধানগরের ঝাড়ে-জঙ্গলে অশিক্ষা-কুশিক্ষা যে ছিলো শেয়াল-রাজা, কলকাতার এই আড়াই শো টাকার ক্ল্যাটের বাসিন্দা মানসী দত্তমল্লিকের দরজায় সে ছুঁচো।’

মানসী চূপ।

‘আর এও জেনো, যদি কোনো কারণে আবার তোমাকে ফিরে

যেতে হয় সেই অবস্থায় একদণ্ডও টিকতে পারবে না তুমি। সেই মানুষ তোমার কল্পনায় যতই রঙিন ফাহুস ওড়াক, বাস্তবে সে অসম্ভব।’

‘মা, চূপ করো, চূপ করো!’ মানসী হাতের ভাঁজে মুখ লুকোলো।

‘চূপ করবো কেন? যা ঠিক তা আমি বলবোই। যা নেই, যা থাকতে পারে না, তা খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে এই বানানো কাহ্না আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। আজকের মতো একটা শুভদিনে—’

দুই হাতের সবল ঠেলায় বাথরুমের দরজাটা খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকে গিয়ে মানসী যেন মা-র কথার জবাবেই ঠাস ক’রে বন্ধ ক’রে দিলো ছিটকিনিটা। তারপর দেয়াল ধ’রে ধুকতে লাগলো পরিশ্রমে। কপালটা ভ’রে গেলো বিন্দু-বিন্দু ঘামে।

কিন্তু দরজা বন্ধ করলেই কি আজ এই ভাবনা থেকে রেহাই পাবে মানসী? মা-র কথার তীক্ষ্ণ ফলাগুলো উপড়ে ফেলতে পারবে? যে-মাটির নিখাস টেনে-টেনে চারাগাছ আকাশে মুখ তুলেছিলো, বাতাসে নিখাস নিয়েছিলো, সূর্যস্নানে অভিষিক্ত হ’য়ে দেহের মধ্যে প্রাণের স্পর্শে শিহরিত হ’য়ে চিনে নিয়েছিলো নিজেকে, সে-মাটি ছাড়িয়ে যে আজকের মহীকুহ অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছে, সে-কথা কি মানসী নিজেই জানে না? জানে। মা না-ব’লে দিলেও জানে, একপলক যে-মানুষটিকে দেখে আজ তাব মর্মমূল পর্যন্ত এমন ক’রে কেঁপে উঠেছে, সেটা তার অতীতেরই একটা অভ্যাস মাত্র। একটা চেনা গানের ভেসে-আসা স্বরের যন্ত্রণা। আসল সে যে একদিন ছিলো, যাকে ঘিরে টুনি নামে কোনো একটি অল্পবয়সী মেয়ের জীবন কোনো একদিন পল্লবিত হ’য়ে উঠেছিলো, যে-টুনি আজ বিখ্যাত মানসী দত্তমল্লিকের বৃকের মধ্যে জ’মে পাথর হ’য়ে গেছে এ শুধু তারই একটা অসার মৃত স্মৃতি। তা নৈলে এতোদিন কোথায়

ছিলো সে-মানুষ? মানসী কবে তার কথা ভেবে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়েছে? শেষ কবে ভেবেছে তা পর্যন্ত মনে নেই। নিজের কত ণত অপরিমিত আনন্দে, উৎসবে, প্রাচুর্যে একদিনও তো এই নির্গলকে মনে ক'রে একটা নিশ্বাস ফেলে নি। তবে?

তবে কেন বকের মধ্যে এই আলোড়ন বিলোড়ন? পরিচ্ছন্ন মোজেইক-করা প্রশস্ত বাথরুমের ছোট্ট টুলটার উপর ব'সে প'ড়ে শ্রান্ত মানসী নিজেকেই নিজেকে প্রশ্ন কবলো। ভাগ্যের শত্রুতায় যে অন্তরতম মানুষকে একদিন বাধ্য হ'য়েই তোমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিলো, প্রায় দশ বছরের অদর্শনে, জীবনের আশ্চর্য উত্থান-পতনের সঙ্গে-সঙ্গে সে-মানুষ সত্যিই কি আজ তোমার হৃদয় থেকে নিবাসিত হয়েছে? যার বিরহে তোমাব হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গিয়েছিলো আজ কি জালিয়ে-পুড়িয়ে থাক ক'বে সত্যি নিবে গেছে সে-আগুন?

একটা কান্নার স্রোত গড়িয়ে গেলো গল। বেয়ে বুক বেয়ে আরো কোথায়। ছটফট ক'রে উঠলো সে, মনে পড়লো সেই বাইশ বছরের প্রথম সূর্যের মতো একমুঠো উত্তপ্ত আগুন, যার সঙ্গে আজকের দিনের ঐ রঙ-ধ'রে-ঝুলে-পড়া ক্ষণিক দেখা মানুষটির তামাটে অপরাহ্নের সঙ্গে বুঝি বা আর কোনো সম্বন্ধ নেই। একটা হুঃসহ যন্ত্রণায় দু-হাতে বুকটা সে চেপে ধরলো।

তবে থাক, থাক। এই প্রবঞ্চনা থাক। থাক এই ভালোবাসার প্রহসন। মৃত স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরার অন্তিম প্রয়াস। হে প্রিয়তম। অন্তরতম। আমাকে ক্ষমা করো তুমি, দয়া করো। নিজের অজান্তেই মানসী উঠে দাড়িয়ে যেন জলতে-জলতে শীতল হবার আশায় ঝরনার তলায় পেতে দিলো দেহ।

.... চাব

পাটিটা সেদিন ভালোই জমলো। আলোতে, ফুলেতে, আনন্দে, স্বগন্ধে, গ্রামোফোন রেকর্ডের সানাইতে, গাইয়েদের আধুনিক গানের বিশ্বল প্রমেতে, একেবাবে জমজমাট হ'য়ে উঠলো সব। মেনে নেবার ক্ষমতা নানসীর সহজাত। নিজের উদ্বেলিত হৃদয়কে পোষা কুকুরের মতো এক একমকে সে ঠাণ্ডা ক'রে দিলো। ড্রয়িং রুমের উজ্জল আলোয় আলোকিত হ'য়েই সকলকে অভ্যর্থনা করলো সে, অগ্নেবা যখন হাসলো সেও হাসলো, যখন সবাই ঠাট্টা কবলো লজ্জা পেতেও দেরি হ'লো না তার, এমনকি সময় সন্ধ্যোগ খুঁজে পিছনের বারান্দায় ডেকে এনে সোমেশ্বর যখন আদর কবলো, তখনও আঙুলটুকু নাডলো না।

সময় সন্ধ্যোগ খুঁজে ননীবালাও একবাব দেখা করলেন ভাবী জামাইয়ের সঙ্গে। আঁচলের কোণে চোখ মুছে বললেন, 'আমার সর্বস্ব আজ তোমার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি, জানি না এর পরে কেমন ক'রে দিন কাটাবো। ওকে বিদায় দিয়ে কোন প্রাণে বেঁচে থাকবো।'

সোমেশ্বর বললো, 'বিদায় মানে? আপনি কি ওকে ছাড়া আলাদা থাকবেন নাকি? না কি আপনি চাইলেই আমরা তা দেবো?'

ননীবালা একটি ককণ হাসি ভাসিয়ে দিলেন মুগের উপর, 'বিয়ে দিলেই ময়ে পর। তারপর যদি দয়া ক'রে মাকে তোমরা মনে রাখো, তবেই আমার অনেক।'

'ছী ছি, এ-রকম আপনি বলবেন না।' সোমেশ্বরের গলা রীতিমতো শবদে শোনালা।

ননীবালা ধীবে মাথা নেড়ে হাসলেন, 'না-বললেও, যা সত্য তা তো সত্যই?'

‘আপনি তো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, কিংবা আপনার সঙ্গে আমরা। এই ফ্ল্যাট এ-মাসেই ছেড়ে দেবো। ওখানে আমার মস্ত বাড়ি—

‘তোমার বাড়ি আরো মস্ত হোক, তোমার ঐশ্বর্য আরো বাড়ুক— প্রায় সমবয়সী প্রোট জামাইয়ের মাথায় তিনি হাত ছোঁয়ালেন, ‘কিন্তু অমন কথা বোলো না। মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে গিয়ে যেন আমাকে আপদ হ’তে না হয়। আমাকে দয়া ক’রে আলাদা ব্যবস্থাই ক’রে দিয়ে।

‘বেশ তো।’ সোমেশ্বর শরীর কাঁপিয়ে হাসলো, ‘তা-ই যদি চান তা-ই হবে।’

‘আচ্ছা, তোমার যে লেকের ধারে খানিকটা জমি আছে,’ কথাট যেন হঠাৎ মনে পড়লো ননীবালার, ‘সেটার বিষয়ে কিছু ভেবেছো কি?’

‘ভাবছি তো বাড়ি তুলবো একটা—’

‘জমি তো বোধহয় বেশ খানিকটা—’

‘বেশ আর কি।’

‘তুমি আমাকে তা থেকেই খানিকটা জমি দাও বাবা, যেমন ক’রে হোক একটা কুড়ে তুলে নিয়ে না-হয় বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দিই—’

‘ঠিক আছে। তা নিয়ে আপনাকে অত ভাবতে হবে না। আপনি যেমন আমাকে আশীর্বাদ করলেন আমারও তো তেমনি একটা প্রণাম আছে। যদি চান আমি একমাসের মধ্যেই আপনাকে বাড়ি তুলে দেবো।’

‘না, না, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই—’ স্বপ্নের আবেগে ননীবালার গলা বন্ধ হ’য়ে এলো, ‘তোমার মতো এমন দেবতুল্য মানুষকে যে আমি জামাই ক’রে পেলাম এই তো আমার সব চেয়ে বড়ো ভাগ্য।’ এবার সত্যি-সত্যিই চোখে জল এলো তাঁর।

শাশুড়ির সঙ্গে পাকা কথা বলে এ-ঘরে চলে এলো সোমেশ্বর। চোখে-চোখে মানসীকে খুঁজলো। আজ আর একদণ্ড তাকে কাছে না-পেয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এতো ভিড়ে নিভৃত হবার আশা কই? এতো দিন দূরে-দূরে ছিলো, বরং সে-ই ছিলো ভালো। একরকম নিষ্পত্তি ছিলো মনের সঙ্গে। কিন্তু বাঘের রক্তের আশ্বাদ পাওয়ার মতো মানসীর নরম স্নিগ্ধ দেহের এতোটুকু স্পর্শেই আর আজ মন মানছে না সোমেশ্বরের। শুধু আজ নয়, কালকে রাত পর্যন্তও এই স্মদীর্ঘ অপেক্ষা। কিন্তু তারপর। ভাবতেই শরীর রোমাঞ্চিত হ'লো সোমেশ্বরের।

তারপর এই মেয়ে তার হাতের মুঠোয়। এই মেয়ের এই দেহ তারই, একমাত্র তারই অধিকারভুক্ত। প্রুণ্ডিয়িনীর ভূমিকায় মানসী এ-পর্যন্ত তাকে বত-অচিবায়ু দেখিয়েছে স্ত্রীর ভূমিকায় স্বামীর বলাৎকারের কাছে তার একটা জবাবদিহি আছে বৈকি। আর সেটাই তো পুরুষের যোগ্য। তা-ছাড়া অনর্গল দৈহিক বাসনার চরিতার্থতা একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কিসেই বা সম্ভব?

বেয়াল্লিশ বছর বয়সের সোমেশ্বর অল্পমনস্ক হ'য়ে ব'সে-ব'সে আজ এ-সব কথাই ভাবলো। না-ভেবে পারলো না। যেদিন এক মেয়েতে আবদ্ধ থেকে নিজেকে খাঁচার চিড়িয়া বানিয়ে দিতে তার আপত্তির সীমা ছিলো না, আজ আর সেদিন নেই। স্বেচ্ছাচারিতার ঘোড়ায় চড়ে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়িয়ে দম ফুরিয়ে এখন ঘরের কথা মনে পড়েছে। এখন শুধু শরীরের একরকম চাহিদাই নয়, তার আরো অনেক প্রয়োজনের কথা টের পেয়েছে সোমেশ্বর। সেবা চাই, সঙ্গ চাই, গৃহস্থালি চাই। আর এই ঠাণ্ডা শীতল চন্দনের মতো পবিত্র মেয়েটিই তো একমাত্র মেয়ে, যে তার জীবনে কেবল স্মদূর হ'য়ে থেকেই তাকে এমনি প্রবলভাবে আকর্ষণ

করতে পারলো, পাখির মতো গলা গানের হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে তাকে পাগল ক'রে দিলো।

আড্ডা ভাঙতে-ভাঙতে মন্দ রাত হ'লো না। সুন্দর হাওয়া দিলো বাইরে, ফুটফুটে চাঁদ উঠলো আকাশে, অতিথিদের বিদায় দিতে নিচে নেমে এলো মানসী, আর ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত দাঁড়িয়েই ননীবাল। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এলেন সব তুলে-টুলে রাখতে, নিরাসারা করতে। আজকের গোলমালে অনেকক্ষণ ভাঁড়ারের চাবি খোলা ছিলো, সন্দেহ দৃষ্টিতে সে-সবের মধ্যেও উকি মারলেন হুঁশিয়ার হ'য়ে, আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন ঠিকই আছে, না খোয়া গেছে কিছু। ঝি-চাকরদের তিনি এক মুহূর্তের জন্তেও বিশ্বাস করেন না। টুনি আবার বলে, 'তুমি এ-রকম করো কেন ওদের সঙ্গে?' মেয়ের ঢং দেখে শরীর জলে তখন। ভারি হয়ে হয়েছেন। বড়োমামুষি! বলতেই বলে 'দাকে আছাড়, কোদালকে খিল, বাদিকে লাথি, আর গোলামকে কিল।'

এদের সব সময় হাতে রাখতে হয় কেবল ব'কে মেরে। নইলেই লাইকুতার পাতে ভোজন।

ঝি-চাকরদের খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও এই জন্তে তিনি ঢিলে নন। তবু তো তেমন শাসনে রাখতে পারেন না মেয়ের যত্নগায়। সমানে মাছ দিতে হবে তাদের, দামি-দামি তরকারির খোসাগুলো ফেলে দেবে তবু ঝিয়েদের জন্ত একটা আলাদা তরকারি হ'তে দেবে না। সকালে বিকেলে আবার জলখাবারের ঘট কত। এইজন্তেই তো দিন-দিন এগুলো নিষ্কর্য হ'য়ে যাচ্ছে। এর শোধ তোলবার সুযোগ অবিশি প্রায়ই জুটে যায় তাঁর। মাসের মধ্যে অনেক দিনই মানসী বাড়িতে থাকে না।

নানা জায়গায় পার্টি থাকে, জলসা থাকে, সাক্ষ্য নিমন্ত্রণ বা ডিনার

থাকে। সে-সব দিন ননীবালা ডাল আর রুটি ছাড়া তৃণটুকুও দেন না। যদিও তাঁর নিজের জন্ত মাছ ছাড়া আর সব-কিছুরই ব্যবস্থা হয়। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো না, বেয়েস হয়েছে, ভালো খাওয়া-দাওয়া না-করলে শরীরই না টিকবে কেন? খাঁটি গাওয়া ঘিষেব খান চোন্দ লুচির সঙ্গে রান্ধিয়ে তিনি বেগুনভাজা, আলুভাজা, ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, একবাটি ক্ষীর, মিষ্টি এই সব খান। আর টম্যাটো তাঁর রোজই চাই। তাতে নাকি ভিটামিন আছে। (কলকাতা এসে কত ইংরিজিই শিখলেন তিনি!) যখন পা ভেঙে গিয়েছিলো তখন বলেছিলো ডাক্তার। যথেষ্ট ভিটামিন দিতে হবে শরীরকে। মাছ, মাংস যদি নেহাৎ না-ই খান তবে এদিকে দুধ, ঘি, ফল, মিষ্টি, আব ওদিকে তরকারির মধ্যে আলু, গাজর, বীট, বীন, স্কোয়াশ এ-সবের স্যুপ। টম্যাটোটা যথেষ্ট পবিমাণে। স্যুপ তো খাবেনই,—শরবৎ ক’রেও শ্লাশ দুই খাবেন চিনি দিয়ে।

কী করেন ননীবালা! সেই থেকে এমন অভ্যেস হ’য়ে গেছে যে ঐ স্যুপটি তাঁর একবাটি এক চুম্বকে চাই-ই চাই। টম্যাটোর শরবৎটাও বেখেছেন। তাতে শরীরটা সত্যি ঠাণ্ডা থাকে। আর রংটাও পরিষ্কার হয়।

রাধানগরে থাকতে এ-সবের নামও জানতেন না। কী জঘন্ত দেশ রে বাবা।

ঝি ছুটো ভারি মুখে গনগন ক’বে রুটি খায় মটরের ডাল দিয়ে আর বলে, ‘এমন খাবার দিলে বাপু থাকবো না আমরা।’

‘থাকবি না তো যা না কোন চুলোয় যাবি? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?’ পরিপাটি ক’রে খেয়ে উঠে আঁচাতে-আঁচাতে তিনি ভাবেন।

তা কি যাবে নাকি? এমন হাবা মনিব কি রোজ-রোজ জুটবে? বডো একটা কনট্র্যাক্ট হ’লো কি অমনি বকশিশ। নিজে কিছু কিনলো কি

অমনি ওদের। পুজোর সময় শাড়ি চাই, দোলেব সময় ব্লাউজ চাই, বাঘনা কত। আব ঢংও জানে মাগি ছুটো। ‘দিদিমণি। দিদিমণি।’ একেবারে মিছরিব পানা।

আজ কিন্তু বিষেদেব কিছু বললেন না। ববং গলায় মধু ঢাললেন, ‘নে বাপু, ভালো ক’বে খা। পাস্তা আর-একটা নিতেই হবে। না-খেলে খাটবি কেমন ক’বে শুনি।’ ঝপাঝপ খাবাব জিনিস তিনি পাতে ফেলে দিলেন। গাল ভ’বে হেসে বললেন, ‘আবো কত খাবি, কত পাবি। বাজবাডিতে যাচ্ছে দিদিমণি, তোবাই কি কম সম্মান পাবি? হাজাব হোক বানীব ঘবের খাস দাসী তো? জামাই আমার সাধাবণ মান্নুষেব মতো কাপড জামা প’রে আসেন ব’লেই ভাবিস না আমাদেব মতোই একজন। বুঝলি? তা নব। সোনা দানায় বাড়ি ঠাসা, আজ একটা হাজাব ঢাকা দামেব হীরেব আংটি দিয়েছে, আবাব কাল সকালেই তো একলক্ষ টাকাব হীরেব কণ্ঠি দিয়ে পাকা আশীর্বাদ করতে আসবে বাড়িব দেওয়ান। সোনাও পোশাক পর্যন্ত আছে এদেব। আব মাথায় যখন মুকুট পরবে দেখবি।

বাডতি খাবার মীটসেফে তুলে রাখতে বাখতে উল্লসিত হ’ব জামাইয়ের অগাধ ঐশ্ব্যেব কাহিনী তিনি উদ্ঘাটিত করতে লাগলেন নন্দব মা আব নবলক্ষ্মীর কাছে। ছোকরাটাও ঘুমে ঢুলে বডো বডো গবসে ভাত মুখেতুলতে-তুলতে চোখ বডো ক’বে গুনলো।

যাবার মুখে সোমেশ্বব বললো, ‘বাই দি ওয়ে, একটা কথা, আমি আজ ফোন করেছিলাম ট্রান্সপোর্টকে, মানে ট্রান্সপোর্ট আপিশে।’

‘ট্রান্সপোর্ট আপিশে?’ অবাক হ’লো মানসী।

‘ঐ তোমাব কালকের ব্যাপারটা। সেই কণ্ডাক্টব।’

‘কে?’

‘আরে তোমার জ্ঞাত যে-লোকটা কাল বাস থেকে ঝুলে প’ড়ে প্রায় আত্মহত্যা উদ্ভূত হয়েছিলো।’

‘কণ্ডাক্টর!’

‘ঢাখো নি? সেই দোতলায় টিকিট নেওয়া থেকেই তো আরম্ভ। ইভিয়ট। দিলাম একটা কমপ্লেইন্ট ক’রে।’

‘কণ্ডাক্টর?’

‘খোদকর্তাকেই পেলাম ফোনে, যা-তা বললাম। এমন ইতর লোক-জন সব, আর সরকারও তো তেমনি, তুমি কি ভেবেছো কোনো স্টেপ নেবে?’

মানসী চুপ।

‘এজ্ঞেই আমি মেয়েদের বাসে-ট্রামে চড়ার এতো বিরোধী। আচ্ছা, আজ তবে বিদায়, মনি।’

সোমেশ্বর গাড়িতে উঠলো।

মানসী দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হ’য়ে। কে যেন তাকে গঁথে দিলো মাটির সঙ্গে।

এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো কিচিরমিচির ডাক ছেড়ে। চাঁদ দেখলে এমন ওরা যায় লেকের জলে ছায়া ফেলে-ফেলে, তার মানে রাত বেড়েছে।

দোতলার ফ্ল্যাটের আলোটি বন্ধ হ’লো টিপ ক’রে। একটা ছোটো বাচ্চা কেঁদে উঠলো অন্য ফ্ল্যাটে। একটা গোকুল তখন থেকে জাবর কাটছিলো আপন মনে, এবার ধীরে-ধীরে কোথায় হেঁটে গেলো। বড়ো রাস্তা থেকে ছোটো একটা কোলাহল উঠেই আবার নিবে গেলো, একটা।

প্রাইভেট গাড়ি তীর বেগে ছুটে গেলো লেকের দিকে, ভেতর থেকে কোরাস গানের ক্ষণিক স্বব। চাঁদনি রাতের ফুঁতি।

নির্জন রাস্তার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে চোখ তুলে ওদের দেখলো মানসী। শিরশিনে ঠাণ্ডায় শাড়ির আঁচলটা কাঁপলো। মিষ্টি একটা চেনা গন্ধ ভেসে এলো বাতাসে। কিসেব গন্ধ। কী ফুল? মাত্র কয়েকটি বডো-বডো বাড়ি বুকে নিয়ে এ-পাড়ায় মাঠ-ঘাটের অন্ত নেই। নিজে-নিজেই কত বুনো ফুল ফুটে থাকে যেখানে-সেখানে। কী সুন্দর লতা গাছ বডো-বডো গাছের দেহ জড়িয়ে বেড়ে ওঠে। অন্ধকার বাত্রে জোনাকি জলে। ভারি ভালো লাগে মানসী। তখন সে পিছন ফিরে তাকায় জোনাক-জলা আরো কোনো ভুলে-যাওয়া বাড়ির দিকে। ভুলে-যাওয়া? না, ভুলে-থাকা? ভুলে কি যাওয়া যায়? কেউ কি তোলে? ভুলতে পারে? ভোলা কি এতোই সহজ? শুধু ভুলে থাকে। ভুলতেই হয় ব'লে ভুলে থাকে। না-ভুললে মানুষ বাঁচতে পারে না। তাই ভুলতেই হয়। ঠিক এমনিই দুধশাদা চাঁদেব রাতে এমনি বাতাসে-ভেসে-আসা গন্ধভরা মাধবীলতার ঝোপে দাঁড়িয়ে গাঢ় ঘন নিবিড় গলাব ছোট্টো একটা ডাক, 'টুনি। আমার টুনি পাখি।'

টুনি! টুনিপাখি!

হঠাৎ ছটফট করে উঠলো মানসী। ভুলি নি, ভুলি নি, আমি তো ভুলি নি! ভুলতে আমি পারি না। জরের ঘোরে প্রলাপরত রোগীর মতো অস্থিরভাবে এপাশে-ওপাশে মাথা নাড়তে-নাড়তে সে বিড়বিড় করলো। তারপর অদ্ভুত একটা ক্ষিপ্ততাব সঙ্গে রাস্তায় নেমে হাঁটতে লাগলো মোহের মতো।

কলকাতা শহরের সেই প্রথম একমাত্র নীল দোতলা বাস, ঘড়ি ধ'রে যার আসা-যাওয়া, যে-বাস্ চল্লিশ মিনিটে বালিগঞ্জ-শ্রামবাজার করে, যে-বাসে চড়বার জন্ত সারা শহর চঞ্চল, যে-বাসে ক'রে কাল রাত দশটায় মানসী সোমেশ্বরের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছিলো, সেই বাস্ এখন বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে শেষ ট্রিপ সেরে ফিরে যাচ্ছে ডিপোতে। রাস্তা জনবিরল হ'য়ে এসেছে, যতদূর চোখ চলে প্রায় ফাঁকা, এতোক্ষণে গাড়ির চালক একটু অসাবধান হ'তে পেরেছে, মনের মতো বেগ দিতে পেরেছে এঞ্জিনে। সারাদিনের কলকাতার সঙ্গে এই রাত এগারোটার কলকাতার কোনো মিল নেই। একটা ছরস্ত দানব যেন সারা পৃথিবী লঙভঙ ক'রে, ছিঁড়ে-থুঁড়ে দারুণ দাপাদাপির শেষে হঠাৎ শ্রান্ত শিশু মতো ঘুমিয়ে পড়েছে মাঘের কোলে। নীলাশ্রয়ী শাড়ির আঁচল বিছিয়ে স্নিগ্ধ রাতের শাস্তি নেমেছে শহরে। যাত্রীবিরল বাসের অন্তরে নির্মল আর তার সঙ্গী, দু-জন কর্মচারীই এখন আলশ্বে ক্লান্ত। সঙ্গীটি একটু অবসর পেয়ে বসেছে গিয়ে সামনের দিকে, হাতের ভাঁজে মাথা রেখে। হয়তো বা তন্দ্রা এসেছে তার। সারা বাস্‌টাই ঝিমুচ্ছে ঘুমের ঘোরে। নির্মলও আর পারছে না, পা ধ'রে এসেছে, গা এলিয়ে রডের উপরেই ছেড়ে রেখেছে নিজেকে। কেউ উঠছে না, কেউ নামছে না, ছরস্ত বেগে চক্ষের পলকে রাস্তা-ঘাট সব পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। হঠাৎ একটা আতঁনাদ ক'রে লাফিয়ে উঠে থেমে গেলো সামনের স্টপ ছাড়িয়ে, কে যেন ছুটতে-ছুটতে, পড়তে-পড়তে প্রাণপণ বেগে এগিয়ে এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাসের মধ্যে। মুহূর্তে চকিত হ'য়ে পড়ন্ত মানুষটিকে ধরবার জন্ত হাত বাড়িয়েছিলো নির্মল, তারপরেই থমকে নিজেকে নিয়ে আড়াল হ'য়ে স'রে দাঁড়ালো এক কোণে। আর তারই ক্লান্ত, অবনত, ব্যর্থতার ভাবে নিপীড়িত কম্পিত বৃকের তলা

দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে উদ্ভাস্তের মতো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে
গেলো মানসী ।

সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী । দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে মনে-
মনে উচ্চারণ করলো নির্মল । যে-ভদ্রলোক আজ সকালে তাদের নামে
নালিশ করেছেন ট্রান্সপোর্ট আপিশে । ঋার সুন্দরী সুবেশী স্ত্রীর দিকে
কাল রাত দশটা-সতেরো মিনিটে সে বা তার সঙ্গী, অর্থাৎ যে-দু'জন সেই
সময়ে ডিউটিতে ছিলো, তাদের মধ্যে কোনো-একজন অসভ্যের মতো
তাকিয়েছিলো লোলুপ দৃষ্টিতে । আচরণে যাদের শোভনতার একান্ত
অভাব ছিলো, যে-দুটো ইতর এবং ছোটোলোকের বাচ্চা এবং কণ্ঠাক্তর
নামক নিকৃষ্ট জীব এই ধরনের বেয়াদবি করতে শাহস পেয়েছিলো,
সরকারের উচিত, সে-দুটোকে অবিলম্বে ডেকে এনে চাবুক মারা, এবং
কাজ থেকে বরখাস্ত করা । ফোন ক'রে এই সব কথা বলেছেন এই
ভদ্রমহিলার স্বামীটি । কিন্তু ঋার কাছে নালিশ এসেছে সেই মানুষটি খোদ-
কর্তা হ'লেও মানুষই । বয়স হয়েছে, বিভিন্ন চরিত্রের লোক দেখে অভ্যস্ত ।
এই নালিশকে ততো গুরুত্ব দেন নি, একজন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামীর
প্রলাপ মনে ক'রে তাদের ডেকে একটু ধমকেই ছেড়ে দিয়েছেন । ভদ্র বলতে
হবে বৈকি । আপিশের জরুরি ডাকে ছুটতে-ছুটতে গিয়ে এই শাসনটুকু
হজম করতে-করতে তার সঙ্গীটির কী মনে হচ্ছিলো জানে না নির্মল ।
তার নিজের মনটা শূণ্য ছিলো । যন্ত্রণারও তো একটা সীমা আছে, ঋার
পরে যন্ত্রণাও আর যন্ত্রণা দিতে পারে না । নির্মল তখন তাকিয়ে-তাকিয়ে
বাগানের ফুলগুলো দেখছিলো, দেখছিলো সকালবেলাকার প্রথম রোদ,
রোদে কাঁপা প্রজাপতির রঙিন পাখা । মনটা কোথায় উধাও হ'য়ে গেলো
কে জানে । শরীরটাও হালকা থেকে আরো হালকা হ'য়ে তুলোর আশের

মতো ভাসতে লাগলো বাতাসে, যার কোনো স্থিতি নেই, বেগ নেই, চাপ নেই, পতনও নেই। ভালোই হ'লো। মনস্থির করা সহজ হ'লো। এই কলকাতার মোহ মিটলো তার। তা নৈলে শুধু কি কণ্ঠস্বর হ'য়েই ক্ষান্ত দিতো সে? এই চাকরি গেলে, এ-দেশের ফুটপাথ কামড়ে প'ড়ে থাকতো, শেষ পর্যন্ত আশার ছলনা তাকে কোন কুহকের দেশে টেনে নিয়ে যেতো কে জানে। পদত্যাগপত্রখানা আজকের মতো এমন সতেজ বিনয়ের সঙ্গে পেশ ক'রে আসা কোনোদিনই সম্ভব হ'তো না। এতো বছর সে এতো গৌরবের সঙ্গে কাজ ক'রে এসেছে সৈন্যবিভাগে, কলকাতা ছাড়তে পারলে এর চেয়ে ভালো কাজ এর চেয়ে অনেক আগেই তার জুটতো। সে যায় নি, যেতে পারে নি। এতোদিনে সত্যিই মুক্তি পেলো, ছুটি পেলো। ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ ভদ্রলোকটিকে, এই ভদ্রমহিলার ভদ্রলোক স্বামীটিকে।

শরীরটাকে সোজা ক'রে সিঁড়ির মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবলো নির্মল। আর ভাবতে-ভাবতে শিথিল পায়ে কখন এক সময়ে ধীরে-ধীরে উঠে এলো দোতলায়। টিকিট নিতে হবে যে। নেওয়া তার কর্তব্য। যতক্ষণ সে বহাল আছে এই চাকরিতে ততক্ষণ সে অবিশ্বাসী হ'তে পারে না। কেন হবে? কার জগ্ন হবে? ঐ ভদ্রমহিলা তার কে? কিসের কুঠা, কিসের লজ্জা? কেন এই অভিমান? এই ভীকতা? ছি! এক ধমকে নিজেকে এনে সে ঠিক অচেনা মানুষের মতোই নিঃশব্দে দাঁড় করালো মানসীর পিছনে। আত্মসংযম করতে সময় লাগলো একটু, তারপর সহজ গলাতেই বললো, 'টিকিট।'

মানসী সামনের দিকে তাকিয়েছিলো, চমকে মুখ ফেরালো। আর সেই মুখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস নিতে পারলো না নির্মল। এতোক্ষণ ধ'রে জড়ো-করা সকল শক্তি তার মুহূর্তে ভেসে গেলো। টোঁক গিলে চোখ নামিয়ে জানালায় পিঠ ঠেকিয়ে আধখানা ঘুরে দাঁড়িয়ে

নিজের অজান্তেই কখন একখানা হাত উঠে এলো নিজের না-কামানো দাড়ি-ভরা গালে, থাকির প্যান্টটা এই চাকরিতে এসে এই প্রথম বড়ো বেশি নোংরা মনে হ'লো। গায়ের বুশশাটটা আরো অকথ্য। সহসা একটা অদ্ভুত আত্মগ্লানিতে মনটা ভ'রে উঠলো। লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে করলো। বিধাতার নিষ্ঠুরতায় অবাক হবার স্বযোগ সে অনেকবার পেয়েছে জীবনে, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার যেন কোনো তুলনা পেলো না।

মানসীর আকাশের মতো নীল নতুন-কেনা দামি ফরাসী সিল্কের কোমল শাড়ি বাতাসের ছোঁয়ায় ততোক্ষণে ঢেউ তুললো একটা, বাসি বকুলের মতো একটা অস্পষ্ট শিথিল স্তগন্ধ এখানে-ওখানে মাকড়সার জালের মতো ভাসতে লাগলো হাওয়ায়, হাতের পাঁচভরি সোনার নতুন গড়ানো মোটা বালার আশ্চর্য পালিশ থেকে সূর্যের জ্যোতি ঠিকরোলো, সযত্নে প্রসাধিত গালের একটা পাশ কানের টুকটুকে লাল প্রবালে রঙিন দেখালো। পিঠের উপর এলিয়ে-পড়া কালো খোঁপা, খোঁপার উপর ছড়ানো-ছিটোনো রূপোর তারাফুল, ব্রোকেডের ব্লাউজে আঁটো পিঠের রূপোলি রং, ঠিক মাঝখানে লম্বা হ'য়ে বেয়ে নেমে-আসা পাথরের মালাব কুচকুচে কালো সিল্কের ফিতে, সব মিলিয়ে কোনো কিছুই আর নিজেকে একাত্ম বোধ করতে লজ্জা পেলো নির্মল। কেবল হঠাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে-তাকানো আর ঈষৎ তুলে-ধরা মুখের ভঙ্গিটিতে পনকের জগৎ রাধানগরের টুনিকে মনে প'ড়ে মোচড় দিয়ে উঠলো বুকটা।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মানসীও নামিয়ে নিলো মুখ। কপাল থেকে উড়ে-পড়া ছোটো-ছোটো চুলগুলো সাপটে সরিয়ে দিলো পিছনের দিকে। নিজের কিউটেস্ক্স মাথা আঙুলের দিকে তাকিয়ে হাতখানা টেনে নিলো আঁচলের তলায়। হাঁটু বুক বেয়ে পেঁচিয়ে-গুঁঠা আকাশ-নীল

শাড়ির সাদা রূপোলি বর্ডার যেন একটু উগ্র হ'য়ে চোখে পড়লো। শস্তা ময়লা বৃশশার্টের আড়ালে নির্মলের দৃঢ় দীর্ঘ স্থায় দেহ, অনিশ্চয়-ক্লান্ত বড়ো-বড়ো চোখের গাঢ় দৃষ্টি, না-কামানো পুরুষ-গালের কর্কশ লাবণ্য, সব-কিছুই তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করলো সেই মুহূর্তে। তবে কি সকালবেলাকার প্রথম সূর্যের চাইতে মধ্যাহ্নসূর্যের জ্যোতির প্রখরতাও কিছু কম আকর্ষণযোগ্য নয়? না কি বাইশ বছরের টলোমলো তারুণ্যের কাছে উত্তরতিরিশের স্থির যৌবনই অনেক বেশি মনোরম? বৃকের ভেতরটা মানসীর কতকাল পরে আবার তেমনি জোরে-জোরে ঝেঁপে উঠলো ছেলেবেলাকার মতো।

মনকে কিন্তু প্রশ্রয় দিলো না নির্মল। তার পৌরুষ তাকে ধিক্কার দিলো। কাল সারারাত সে যার জন্ত একবিন্দু ঘুমোতে পারে নি, আজ সারা সকাল যার জন্ত অপমানের বৃশ্চিকদংশনে সে জ্বলেছে, সারাদিন যার কথা ভাবতে-ভাবতে একটা মুছার মতো কেটে গেছে সময়, এখন এই মুহূর্তে যার দু-হাত দূরে দাঁড়িয়ে নিজের পদমর্দাদা সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে নিজেকে সে অসম্মানিত হ'তে দিচ্ছে, বলতে গেলে সারাটা জীবনই সে যার জন্ত জ্বললো, পুড়লো, ক্ষয় হ'লো, দেবাদ্বৈতের অত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এসে ঘুরে বেড়ালো কলকাতার পথে-পথে, পকেটের পয়সা ফুরিয়ে গেলে সামান্য ম্যাট্রিক পাশের যোগ্যতা নিয়ে আর-কোনো কাজ না-পেয়ে বিনা দ্বিধায় এই কাজ নিয়ে আজ এইখানে এসে পৌছলো, তার জন্ত কিসের বেদনা? কিসের অভিমান? তাছাড়া অল্প একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সুসজ্জিত, সুশ্রী স্ত্রীর কাছে এই অবস্থায় তার প্রাক্তন প্রণয়ীর পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবার মতো লজ্জা আর আছে নাকি কিছু? এই আট-দশ বছরের যুদ্ধের চাকরিতে সে অনেক দেখেছে, শুনেছে, সয়েছে। মন নিয়ে যেমন জ্বলেছে, তেমনি প্রাণ নিয়েও বিধাতা কম খেলা খেলেন নি।

বেশ তো। যুদ্ধের অবসানে এই তার শেষ খেলা হোক। শেষ শক্তির পরিচয়। নিজের দুর্বল হৃদয়কে প্রায় চাবুক মেরে স্থির করলো নির্মল। এই ঠাণ্ডায়ও বিন্দু-বিন্দু ঘামে তার কপাল ছেয়ে গেলো, বুক-পিঠ ভিড়ে উঠলো, অসহ্য ময়লা রুমালটা পকেট থেকে বেব ক'রে ঘাড় গলা মুছে, দৃঢ় কণ্ঠে আবার বললো, 'আপনার টিকিট?'

টিকিট। টিকিট কেন? মানসী তো পয়সা নিয়ে আসে নি। এখানে যে আসবে তা কি সে জানতো? তবে কখন এলো? কেমন ক'বে এলো? কী ভাবতে-ভাবতে এমন শূন্য হাতে চ'লে এলো সে? কই, কিছুহ তো মনে করতে পারছে না। এই তো সে দাঁড়িয়ে ছিলো কম্পাউণ্ডেব ফটকে, দু-পাশে বেল-কামিনীর ঝাড়। অতিথিদের বিদায় দিতে নেমে এসেছিলো। প্রথমে বিদায় নিলেন 'নবীনাব নিয়তি'র বিখ্যাত ডিবেক্টার অনন্তমাধব বটব্যাল। কালো রং, টানা চোখ, ঝাঁক। ঠোঁটে হাসেন। তাঁর সঙ্গে ফুল্লরা সেন গিয়ে ঢুকলো। গাড়ির অঙ্ককারে, 'প্লী-ই-ই-জ, মিঃ বটব্যাল', গ'লে গেলো সারা শরীরে, 'চলুন না লেকটা চক্কর দি একবার।' তারপর সেই নতুন ছবিটার প্রডিউসার বদ্রিপ্রসাদ আগরওয়ালা, তারপর সুপ্রিয়া চ্যাটার্জি আর তার মস্ত হাউণ্ড, আব সব শেষে সোমেশ্বর। তাঁর ভাবী স্বামী, যার সঙ্গে এই কয়েক মহূর্ত আগে সে সকলের সামনে এনগেজড হয়েছে, যে তাকে একটা মস্ত মার্বেলের গুলির মতো মস্ত হীরের হুমূল্য আংটি পরিয়ে দিয়েছে আঙুলে, যে-হীরের দিকে তাকিয়ে ননীবালা আর চোখ ফেরাতে পারেন নি, যে-হীরে এখন শাড়ির 'তলায় ঢেকে রাখা সঙ্কেও লাল নীল সবুজ বেগনি আলোর ঝিলিক তুলছে প্রত্যেক মুহূর্তে। তারপর? তারপর কী?

বাসের চারদিকে তাকালো সে। অত বড়ো বিশাল দোতলার গম্বুজে অতগুলো আসনের মধ্যে একলা আবোহী নিজেকে দেখতে পেয়ে অবাক

হ'য়ে গেলো। একটু দূবে একটা অনমনীয় নিস্পৃহ ভঙ্গিতে মৌজা দাঁড়িয়ে আছে নির্মল। তার কঠিন চেহারায এমন একটি রেখা ফুটে নেই, যাতে ভুলক্রমেও মনে হ'তে পারে মানসীকে সে চিনতে পেরেছে। মানসী উতলা বোধ করলো, তার পলকপাত দ্রুত হ'লো, নিশ্বাস ঘন হ'লো। আরক্ত হ'য়ে বললো, 'টিকিট ? কিন্তু আমি - আমি তো পয়সা আনি নি।'

নির্মলের দৃষ্টি জানালার বাইরে। পলকের জগ্ন চোখটা ফেরালো কি ফেরালো না। অশ্রুটে বললো, 'তবে ?'

তবে? তাই তো, তবে কী? মানসীর ব্যাকুল দৃষ্টি স্থির হ'লো নির্মলের মুখের উপর। নির্মল শব্দটাকে এক পায়েব ভর থেকে আরেক পায়ে দাঁড় করালো, মাথাব উদ্ভূত চুলগুলোকে আঙুল ডুবিয়ে ঠেলে দিলো পিছন দিকে, নিরাসক্ত গলায় বললো, 'বৈধে দেবো ?'

ভাগ্যের পবিত্রাসে হাসি পেলো মানসীর। উপযুক্ত জবাব বটে। নির্মল আজ টুনিকে পয়সার অভাবে নামিয়ে দিচ্ছে বাস থেকে। শেষ পাওনাটা এতোদিন বাকি ছিলো তাহ'লে? নির্মলের তুণে এমন একটি কঠিন বাণ এখনো অবশিষ্ট ছিলো মানসীর জগ্ন ? হাতের মুঠো শক্ত ক'রে স্তব্ধ থেকে নিজেকে সামলে নিলো সে। জিব দিয়ে চোট চেটে রুদ্ধ স্বরে বললো, 'তাছাড়া উপায় কী ?'

'এখানেই বাধবো ?' নামতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো নির্মল।

'গন্তব্যে পৌছনো যখন সম্ভব নয়,' ছাফিণ বছরের পোড়-খাওয়া রুতবিগ্ন মানসী কঠিন হ'য়ে উঠেছে সেই সময়টুকুর মধ্যে, 'তখন যেখানেই হোক ক্ষতি কী ?'

'কদরূর যাবেন ?'

'সেটা অবিশিষ্ট নির্দিষ্ট নেই। যা-ই হোক, এই ভুলের জগ্ন আমি অত্যন্ত লজ্জিত।'

‘ভুলচুক সকলেবই হয় ।’

‘হয় । কিন্তু এমন মারাত্মক ভুল হবে সেটা ভাবি নি ।’

‘ভুল মাত্রই মানাত্মক । যে কবে সেই ভোগে ।’

‘চারটে পয়সা পাঠিয়ে দেবো আপনাদের সবকাবেব দপ্তরে । ভুল কবতে পাবি, ঠকাতে তো পাবিনে ।’

‘সে কী কথা ? আপনি কখনো ঠকাতে পাবেন ?’

থমকালো মানসী । একটু চুপ ক’রে থেকে বললো, ‘তাহ’লে আব টিকিট চাইছেন কেন ?’

‘সবকারেব নিয়ম ।’

‘শুধু সরকারেব নিয়ম ব’লেই ?’

‘আজ্ঞে আমবা তো ভূত্য মাত্র ।’

‘কাব বলুন তো ।’

‘সবকাবেব তো বটেই । আপনাদেরও ।’

‘আমাদেরও ?’

‘যাত্রীব মনোবঞ্জন করাও আমাদের কাজেব একটা অঙ্গ ।’

‘তাই জন্তেই বুঝি বাত এগাবোটার এই অনিশ্চিত রাস্তায় একজন বিপন্ন মেয়েকে এ-রকম ক’বে পথে নামিয়ে দিচ্ছেন ?’

‘বিপন্ন ?’

‘নিশ্চয়ই ।’ গলায় জোর দিলো মানসী, ‘সঙ্গে পয়সা নেই, সঙ্গী নেই—’

নির্গল সনির্বন্ধ হ’লো । — ‘ক্ষমা কববেন, এই চাকবিতে বিপদভঞ্জেব নির্দেশ নেই কোনো ।’

‘চাকবিতে না থাক, মনে তো আছে ?’

‘সে-বালাই আমরা চুকিয়ে দিয়েই এ-সব কাজে আসি ।’

‘বিবেক ?’

‘আমি একজন সামান্য বাস্-কণ্ট্রি, আর আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা-যাত্রী, আপনার সঙ্গে আমার বিবেকের সম্বন্ধ কী?’

‘তাহ’লে মনুষ্যত্ব? সেটা তো থাকা উচিত?’

‘আমরা আবার মানুষ!’ দুই চোখে অজস্র বিদ্রূপ নিয়ে এবার ঘুরে দাড়ালো নির্মল, ‘কিছু মনে করবেন না, আমি ডিউটিতে আছি, এটা আমার কাজের জায়গা, আলাপ করার—’

‘জায়গা নয়,’ মানসী মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলো, ‘বেশ তো, স-জায়গার ঠিকানাটাই বলুন।’

নির্মলের অগ্রদিকে-তাকিয়ে-থাক। দৃষ্টির পলকে ছোট্টো একটি কম্পন উঠলো। ‘কিছু দরকার আছে কি?’

‘একটু আছে বৈকি।’

‘আশ্চর্য! আমার মতো মানুষের সঙ্গে আপনার—’

‘খুব অবাক হবার মতো ঘটনা ব’লে মনে হচ্ছে, না?’

‘তা তো একটু হচ্ছেই।’

‘মিথ্যে কথা বলাটাও কি আপনার চাকরির একটা অঙ্গ নাকি?’

‘মিথ্যে কথা?’

‘নয়?’

চুপ ক’রে রইলো নির্মল।

মানসী বললো, ‘অস্বীকার করতে চান করুন, মিথ্যার ছদ্মবেশ কেন? আত্মবিশ্বাস নেই?’

নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নিলো নির্মল, ঠাণ্ডা গলায় বললো, ‘সুখে আছেন, সুখে থাকুন। ও-সব কথা থাক।’

‘আমার সুখের জগৎ খুব ব্যস্ত, না?’

‘মন্দ কী।’

‘বছরেব পব বছব তাবই প্রমাণ দিযেছেন বোধ হয়।’

নির্মল স্তব্ধ বইলো। একটু ‘পাংলা লম্বা একটি নিশ্বাস নরম বাতাসে মতো। আস্তে ব’য়ে যেতে দিলো বুকেব মধ্যে। বললো, ‘আমাব সমস্ত অস্তিত্বটাই কি তাব প্রমাণ নয়?’

‘তাই নাকি?’ মানসী ভুক বাঁকালো, ‘ব’লে না-দিলে জানবাব উপায় ছিলো না।’

নির্মল ব্যথিত হ’য়ে বললো, ‘কৌতুক আপনাকেই মানায়।’

‘আপনাকে নয়?’

‘আমাকে! আমাব কৌতুক কবাব অবসব কোথায়?’

‘এব জন্তে অবসবেব দবকান হয় না।’

‘হয়। আপনাব মতো পদস্থ মহিলাদেব সঙ্গে কৌতুক কবতে হ’লে অবসবটাই তাব মধ্যে মুখ্য।’ ঈষৎ বাঁঝ ফুটলো। এবাব নির্মলের গলায়

‘ও, পদস্থ হওয়াটাতেই দেখছি আপনাব আসল আপত্তি।’ মানসী গলায়ও কম জালা নেই।

‘আপত্তি। আপত্তি কিসেব?’

‘ভেবেছিলেন না-থেয়ে, না-প’বে, শুকিয়ে ম’বে আপনাব মতো একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের আশায়ই বুঝি চিবদিন বাধানগরেব অঙ্ককাণে প’ড়ে থাকবো।’ কিসে থেকে কী। আসলে কোথায় একটা সন্দেহেব কুটিল কামড় অহুভব কবছে মানসী। একটা দুবস্ত ঈর্ষার দহন। কল্পনায় যেন কোনো একটি নিভৃত নির্জন গৃহকোণের ছবি দেখতে পাচ্ছে, দেখাত পাচ্ছে একটি মেয়েব দুটি প্রতীক্ষাবত চোখ, যে-চোখের মায়ায় নির্মল আজ পরিপূর্ণ, পবিত্রপ্ত। যে দুটি চোখেব কথা ভেবে নির্মল আজ একবাব এক মুহূর্তেব জন্ত তাকাতে পারছে না তার দিকে। নিশ্চয়ই। তা নৈলে কেন এই ছলনা? এডিয়ে যাবাব এই অসার্থক চাতুরী। আপনি-আজ্ঞে

ব'লে দূবে সবিয়ে রাখাব ঘটা । ওব মন ব'লে কি পদার্থ নেই কোনো ।
কে নিলো সেই মন ?

মাথা নিচু কবলো নির্মল । নিঃশব্দে হুজুম কবলো এই নিষ্ঠুর তিব্বতাব ।
শান্তে বললো, 'আমি কিছুই ভাবি নি ।'

'জানি । তাও জানি । আমিও কাণো ভাববাব অপেক্ষায় ব'সে
থাকি নি ।' মানসী উত্তেজিত ভাবে উঠতে গিয়ে ব'সে পড়লো চলন্ত
পারসব টানে ।

নির্মল হাতের ঘড়ি দেখলো বাইবেব দিকে তাকালো , বললো,
নামবেন ?'

'হ্যাঁ ।'

'এখানেই ।'

'হ্যাঁ ।'

'এটা কালিঘাট ।'

'আমি পথ-ঘাট চিনি ।'

'জানি । তাব জগ্গে নয ।'

'তবে কিসেব জগ্গে ।'

'বলছিলাম, এখানেই কি আপনাব স্টপ ।'

'জেনে কিছু দবকাব আছে ।'

'ঠিক স্টপে নামাই কি ভালো নয ।'

'পরামর্শেব জগ্গ ধন্যবাদ ।' মানসী আবাব উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা কবলো,
কিন্তু এমন জোরে বাস্ চলেছে যে না-থামলে চলা দায় ।

নির্মল বললো, 'বাত হযেছে, একটা যে-কোনো জায়গায় নেমে পড়া
কি উচিত হবে ?'

'ভাবনা হচ্ছে ?'

‘না। আমার ভাবনা কী?’ টোক গিললো নির্মল। ভেবে পেলো না।
কখন থেকে সত্যি এই মেয়ের জ্ঞান মনে-মনে রীতিমতো একটা উদ্বেগ
বোধ করছে সে। হ’লোই বা অগ্নির স্ত্রী, তবু তো ও টুনি। টুনিই তো।

মানসী চোখ তুললো না, চাপা গলায় বললো, ‘কোনো ভাবনা নেই
না?’

অস্বস্তি বোধ করলো নির্মল। বুঝতে পারলো না, টুনি আজ কী চায়।
তার কাছে। কী তার উদ্দেশ্য। গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় বললো, ‘না।’

‘কিন্তু একদিন তো ছিলো।’

‘একদিনের কথা থাক।’

‘তা তো থাকবেই।’ জ’লে উঠলো মানসী, ‘আমিও সেই একদিনের
কথা আজ আর মনে ক’রে ব’সে নেই। কাউকে মনে করিয়েও দিতে
আসি নি।’

‘জানি।’

‘নেহাং কৌতুহলবশতই এসেছিলাম।’

‘সেটাই স্বাভাবিক।’

‘আর তার চেয়েও যেটা স্বাভাবিক, সেটা হচ্ছে মনে-মনে যদি কেউ
কোনোদিন এতোটুকু কল্পনা ক’রে থাকে, সেই অহংকারের দরজাটা বন্ধ
ক’রে দেওয়া।’

‘জানি।’ তেমনি শীতল গলা নির্মলের।

‘তা-ও জানেন? বাঃ, জ্ঞানের কোথাও কমতি নেই দেখছি।’

‘সেটাই আসল যন্ত্রণা।’ এক পলক তাকিয়ে নির্মল আবছা হাসলো।

হয়তো হাওয়ায় ধুলো ঢুকলো মানসীর চোখে, সিল্কের আঁচলে ঘ’ষে
নিলো সেটা। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ক’রে বললো, ‘আরো একটা কারণে
এসেছি—’

‘বলুন—’

‘আপনার কাছে কিছু ঋণ ছিলো আমার।’

‘ঋণ?’

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো মানসী, ‘হ্যাঁ।’

‘ও।’ এতোক্ষণে বোঝা গেলো ব্যাপারটা। কয়েক মুহূর্তের জ্ঞপ্তি হ’য়ে গেলো নির্মল। তারপরেই দুই চোখে যেন হাসির ফোয়ারা ছড়ালো, ‘ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেটা বোধহয় শোধ দেবার মতো—’

‘হ্যাঁ। সেটা আমি শোধ ক’রেই দিতে চাই।’

‘হিসেবটা কি মনে আছে?’

‘আছে।’

‘সব কি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘সব?’

‘সব।’

‘মনে পড়বে কি?’

‘পড়বে। পড়বে।’ সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এলো মানসী, ‘সব মনে পড়বে আমার। কড়ায় ক্রান্তিতে সে-হিসেব শোধ ক’রে দেবার জ্ঞপ্তি এতো রাত ক’রে এমন রিক্ত হাতে পাগলের মতো আমি ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু কোথায় সে? সে নেই।’

নির্মল হাতের পাঁচ আঙুলে মানসীর এইমাত্র পরিত্যক্ত আসনের পিঠটা সমস্ত শক্তিতে চেপে ধ’রে বললো, ‘কী?’

‘কিছু না।’ দু-সিঁড়ি নামলো মানসী, আর তারপরেই ছায়া হ’য়ে মিলিয়ে গেলো নির্মলের চোখ থেকে।

নির্মল হতবাক হ’য়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর কী ভাবলো

কে জানে। অধীর হ'য়ে নিচে নেমে এসে আধো-ঘুমন্ত সহকর্মীটির গলায়
নিজের ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিবে বললো, 'এক মিনিট, আসছি।'

ছয়

বাস্তায় নেমে ঝোঁকেন মাথায থানিকটা হেঁটে, দাঁড়িয়ে পড়লো মানসী।
নিখাসেব ওঠা-পড়া তাব এগনো স্বাভাবিক গতিতে ফিবে আসে নি,
হয়তো, বা দম নিতেই দাঁড়ালো। কিন্তু সবটাই তা নয়। বাসটা
তাকে কদর এনে ছেড়ে দিয়েছে সে জায়গাটা আন্দাজ কববাব জগুও
থামতে হ'লো। কালকেব মতো আজকেও ফুটফুট কবছে জ্যোৎস্না,
বডো-বডো গাছগুলো ভৌতিক ছায়া ফেলেছে ফটপাতের উপর। ঘুমন্ত
ভিথিরিব দল, সেই ছায়া জড়িয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে শুয়ে আছে এলোমেলো।
বাস্তা জুড়ে, কয়েকটা কুকুৰও কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সেখানে। সামনেই
একটা ডাস্টবিন, গন্ধ উঠছে থেকে-থেকে। ছোটো গোক বিশাল শব্দ
নিষে তাবই মধ্যে মৃথ ডুবিয়ে কী যেন বাব কবছে টেনে-টেনে। মানসী
ম'রে এলো এ পাশে। বোঝা গেলো জায়গাটা জগুবাবব বাজাবেব
কাছাকাছি।

এতো দূর। এতো দূর তো ভাবে নি সে। ভেবেছিলো পাড়াব মধ্যেই
ছ-চাব সপ এদিক-ওদিক। একটা বিকুশ নিয়েই ফিরে যেতে পারবে,
বাড়ি গিয়ে ভাড়া দিয়ে দেবে। কিন্তু এই মুহূর্তে, এই পবিবেশে, ভবানী-
পূবের প্রাণ শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গা ছমছম কবলো তাব। সাড়ে-আটটা
বাজতেই যে-শহবেব দোকানপাট বন্ধ হ'য়ে যায়, দশটা বাজতেই সে-শহর
ঝিমিয়ে আসে। আব তাব মধ্যে রাত এগারোটাব বাস্তা তো ম'রে গেছে
বলতে হবে। যেটুকু স্পন্দন সে শুধু লাইটপোস্টের তলায় অবসরান্তে

ভূতাদের গোল হ'য়ে ব'সে তাদের আড়াল, নয়তো নিশাচরদের পানের
 দোকানে ভিড। একা-একা বুক পেতে শুয়ে থাকা ইম্পাতের ট্রাম
 লাইনটার অজগর দেহের দিকে তাকিয়ে মানসী বৃক্বে ভেতবটা যে
 কেমন করলো, ইচ্ছে কবলো সেখানেই ব'সে পড়ে, ইচ্ছে কবলো সেখানেই
 দাডিয়ে থাকে, ইচ্ছে কবলো যেদিকে ছু-চোখ যায় চ'লে যায় সেদিকে,
 গঙ্গার জলে ডুবতেও ইচ্ছে করলো বৈকি। আরো যে কত কিছু ইচ্ছে
 কবলো অন্ত রইলো না কোনো। কিন্তু মানুষ ইচ্ছাব অধীন নয়, দুঃখের
 অধীন নয়, বুদ্ধিরই অধীন। সেই বুদ্ধি দিয়েই মানসী ভাবতে লগলো
 এখন কী উপায়ে বাড়ি ফিরতে পারে। হালভাঙা পালছেড়া ফুটো
 নৌকোর মতো উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে যতদূর চোখ চলে ততোদূর একবার
 উত্তবে একবার দক্ষিণে তাকাতে লাগলো বিহ্বল চোখে, কিন্তু কিছুই
 ঠিক করতে পারলো না। অপেক্ষা কবলে হযতো বা ছু-একটা ফিবতি
 টাম বাস ধরা যেতো, উপায় নেই। পরস্য নেই হাতে। একা ট্যাঙ্ক
 ক'বে যাবাব মতোও সাহস নেই। বিকশই বা কই? আর এতোদূর
 বাস্তা বিকশ ক'বে? ভয়ে-ভয়ে পা ফেলতে লাগলো সামনের দিকে।
 একজন পথচারী চ'লে গেলো পাশ ঘেমে, একটা ল'লি চ'লে গেলো প্রায়
 চাপা দিতে-দিতে। ঘুমিয়ে থাকা কুকুণ্ডলোব একটা সহসা জেগে উঠে
 দাকণ চ্যাচাতে লাগলো, ঘুম ভেঙে একটা বাবরি-চলো লোক উঠে ব'সে
 ছুই থান্সড়ে সাঁও করলো তাকে। আবাব স্তমসাম। আর তারপরেই
 ঠিক পিছনে একটা মানুষের নিঃশব্দ পদক্ষেপ অন্তর্ভব ক'বে পা থেকে
 মাথাব চুল পযন্ত খাড়া হ'য়ে উঠলো। 'কে! কে!' ভযার্ত কম্পিত গলার
 চাপা-চাপা আওয়াজ ভেসে গেলো বাতাসে। পিছনের অন্তঃসরণকারী
 লোকটি সামনে এসে দাঁড়ালো মাথা নিচু ক'বে, 'ভয় পেয়েছেন?' জনহীন
 নীরব রাস্তা তার নরম গম্ভীর গলাব আওয়াজে যেন গুমগুম ক'রে

উঠলো। শিহবিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো মানসী, তার নিশ্বাস গাঢ় হ'য়ে উঠলো, তাকালো বডো-বডো চোখে। পবমুহুর্তেই তীব্রভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি। আপনি এসেছেন কেন?'

'দোষ হয়েছে।'

'আমাকে অসম্মান কববার কোনো অধিকার নেই আপনার।'

'কোনো অধিকারের দাবি নিয়ে আমি আসি নি।'

'তবে কী চান?'

'আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবো।'

'না।'

'কেন?'

'আমি নিজেই যেতে পাববো।'

'পাববেন না।'

'পাববো, পাববো। আপনি যান।'

'অনেক বাত হয়েছে।'

'হোক।'

'পথ নির্জন হ'য়ে গেছে।'

'জানি।'

'মঞ্চে পয়সা নেই।'

'তাতে আপনার কী?'

'আমার।' দুটি সজল চোখ নিম্নল আকাশে তুললো, 'না, আমার আর কী।'

'তবে যান।'

চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে বইলো নির্মল। এক মুহূর্ত দু জনেই চূপ। একটা খালি ট্যাক্সি যেতে-যেতে মন্বব হ'লো তাদের দেখে। মানসীর অন্তিমতি

না-নিয়ে সেটাকে হাত বাড়িয়ে থামালো নির্মল। ক্লান্ত গলায় বললো,
'উঠুন।'

'না।'

'বলুন, কোথায় যেতে হবে।'

'না।'

'গাড়িটা থামালাম '

'আমি বলি নি।'

'আপনি বলবেন, সে-ভাগ্য নিয়ে আমিই কি এসেছি সংসারে?'

'ভাগ্য।' ঘাড় হেলিয়ে বাকি চোখে ঠিক টানি মতো ক'বেই তাকালো
মানসী, 'দয়া ক'রে ভাগ্যের দোহাই দেবেন না। ওটা পুরুষের লক্ষণ নয়।'

'হয়তো তা-ই।'

'হয়তো নয়। সেটাই সত্যি।'

'তর্ক থাক।' মাথার চুলে নির্মল আঙুল ডোবালো, 'মিহিমিছি দেখি
হচ্ছে।'

'আপনি যান না।'

'আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো।'

'আপনার সঙ্গে আমি যাবো না।'

'কেন?'

'সে-কৈফিয়ৎ আপনাকে আমি দেবো না।'

'আমার সঙ্গে একা যেতে কি আজ আপনার ভয় করছে?'

'ভয়!'

'লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না চেহারা দেখে?'

'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাই ওঠে না।'

'আত্মসম্মানে আঘাত লাগছে?'

‘আঘাত লাগবে কেন ?’

‘একটা থাকি প্যান্ট-পবা বাস কণ্ট্র— বাড়িতে বলবে কী, না ?’

‘নিজেকে ছোটো কবতে লজ্জা হয় না ?’

‘লজ্জা ! লজ্জা থাকলে কি আব এখানে এসে দাঁড়াই ?’

‘এখানে এসে দাঁড়ানোটাতেই অসল লজ্জা, অসল দুঃখ, না ।’

‘বাজে কথা থাক । আমি বডো ব্লাস্ট, চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে
আমি চ’লে যাই ।’

‘অম্মাকে পৌছে দেবাব দায়িত্ব তো আপনার নয় ।’

‘আব কোনো দায়িত্ব না থাক, আমি পুরুষ, সে-হিসেবে এই দায়িত্বটা
নিশ্চয়ই আছে ।’

‘ও, সেই হিসেবে । নাবীবক্ষা সমিতি থলেছেন বুঝি ?’

‘যা মনে কবেন ।’

‘মনে কববো কেন । যা সত্য, তা ই ।’

অদবে অপেক্ষমান ট্যাঙ্কিটার দিকে তাকিয়ে চূপ ক’বে বইলো নির্মল,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ‘তাহ’লে আমাব দবকাব নেই কোনো ?’ বেদনায
ভাবি হ’য়ে উঠলো তাব গলা ।

মুখ ফিরিয়ে কঙ্কসবে মানসী বললো, ‘না ।’

তব কী জানি কেন দাঁড়িয়ে বইলো নির্মল । কয়েক মুহূর্ত যেন
পৃথিবীতে একটা নিশ্বাসপতনের শব্দও শুনতে পেলো না সে । মাথাব
উপব অনন্ত আকাশের অজস্র তাবায় তাকিয়ে নিজের অস্তিত্বটা মুছে
দিতে চেষ্টা কবলো ভবানীপুবেব এই লম্বা রাস্তাটা থেকে । অনেক পবে
প্রায় দাঁনেব আকৃতি নিষে বললো, ‘একটা কথা ছিলো ।’

‘ক। কথা ? আমাব সঙ্গে আব আপনার কী কথা থাকতে পারে ?’
মানসীব গলা ২-বাথবো শোনালো ।

‘পাবে না, না ? ঠিক বলেছেন ।’ একটু থেমে, ‘এতো বছর ধ’বে নিজের স্ত্রীকে যত কথা বলবার জন্তু মাজিয়ে পেয়েছিলাম-’

‘কী ! কী বললে—’

‘সে-সব আজ পবেব স্ত্রীকে বলি কী ক’বে । তাব চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও যে অনেক ভালো ।’

‘পবেব স্ত্রী ।’

‘কিন্তু টুনি-’ অনিচ্ছাসহেও নামটা কেমন ক’বে উচ্চারণ ক’বে ফেললো নিমল । আব সেই ডাক শুনে বুকটা থবথব ক’রে, উঠলো মানসীব । বাগ অভিমান সব ভুলে ব্যাকুল গলায় বললো, ‘টুনি । এতো ক্ষণে নামটা মনে পড়লো তোমাব ।’

দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে নিমল মুছ হেসে বললো, ‘বব’ জিগ্যেস কবতে পাবো এ নাম ছাড়া এতোগুলো বছর আব আমাব কী মনে পাডেছে ।’

অভিমাণে বুক গলা ভাবি হ’য়ে গেলো মানসীব, ‘থাক, সে-থবন আমি জানতে চাই না ।’

‘তা ও আমি জানি ।’ নির্মলেব গলাও ভাবি শোনালো, ‘আজ সকালে তোমাব স্বামী আমাব বিকল্পে যে অভিযোগটি এনেছেন--’

‘আমাব স্বামী ।’

‘হযতো তোমাবও ভালো লাগে নি আমাব কাল বাস্তবের বিচলিত ব্যবহাব, কিন্তু এটুকু জেনো, তোমার স্বথের সংসারে আমি কোনোদিন, কখনো এতোটুকু বাধা হবো না ।’

সহসা শিশিবেব উপব রোদের বলকের মতো মানসীব বাপসা চোখে এক ফোঁটা হাসি টলটল ক’বে উঠলো । মেঘ স’রে গিয়ে মস্ত দিগন্তজোড়া নীলাকাশ এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত হ’য়ে গেলো তাব কাছে । মুছ হেসে চূপ ক’রে তাকিয়ে রইলো মুথের দিকে ।

বাস্তা থেকে ফুটপাতে পা দিলো নির্মল, ‘তাহ’লে বিদায় দাও, যাই।’
দ্রুত পায়ে তাকে অন্তঃস্বৰ্ণ করলো মানসী, ‘আব আমি?’

‘তুমি। তুমি কী?’

‘আমি কী কববো? বুল দাও।’

নির্মল অপলকে মানসীৰ মুখেৰ দিকে তাকালো এবাব। তাকিয়েই
গইলো। সহসা একটা ছবন্ত ভালোবাসাব আবেগে তাৰ পুরুষ-বুক যেন
ভেঙে যেতে চাইলো। কিন্তু চেউটা সন্তুৰ্ণে ব’য়ে যেতে দিলো সে।
অবসন্ন গলাৰ বললো, ‘তবু তোমাকে দেখলাম। দেখতে পেলাম। বোকা-
পড়া হ’য়ে গেলো একটা।’

‘বোকাপড়া। এতো বছৰেব দেনা-পাওনাৰ হিসেব কি এতোই সহজ?’
মানসীৰ কোমল গলা ঠিক টুনিব মতোই সলজ্জ শোনালো।

‘সহজ আব কোথায।’ নিশ্বাস নিলো নির্মল, ‘কী কঠিন মল্য যে আজ
আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি কোনোদিন বুঝবে না।’

মানসী ট্যাঙ্কিব দরজা খুলে ভেতবে উঠে এলো, বুকেব অস্বীতস্বী যেন
ছিঁড়ে গেলো নির্মলেৰ। চকিত হ’য়ে প্ৰায আৰ্ত্তস্ববে বললো, ‘যাচ্ছে।?’

‘যাবো না?’

‘ট্যাঙ্কি নিয়ে।’

‘হেঁটে যাবো?’

‘একা।’

‘এই ফাল্গুনেব বাস্তিবে বাস্তাব হিমে দাঁড়িয়ে অত কথা আমি বলতে
পাববো না, গাডিতে এসো।’

‘আমি?’

‘তবে আর কে আছে এখানে?’

‘ও।’

‘আব পৌছে দেবাব মতো আপাতত হাতের কাছে যখন আছোই একজন, তখন আর রাত ক’বে একাই ধাঁ যাই কেন ?’

কী জানি কী মজি । কিছু না-ব’লে ধীবে ধীবে উঠে এলো নির্মল । হৃদযেব সঙ্গে যুদ্ধ করবাব শক্তি তাব ফুরিয়ে গেছে ।

কিন্তু অন্ধকাব গাডিব স্তব্ধতায পাশাপাশি ব’সে আবাব স্মৃতিব পাপডেবা তাকে দংশন কবতে লাগলো । আবাব পানাতবা পুকুবেব ঢলোমলো জল, তীব্রব আম, জাম, জামবালব ঘন ছায়া, বন তুলসীব ঝোপ, ছুপুবেব নোদ বিকেলেব গোবলি, বত শত মেঘেব দিনেব নুকে চবির লীলা ।

‘কিছু বলছো না—’ কখন যেন মানসী শবীবের সমস্ত উত্তাপ নিগে স’বে এসেছে কাছে । তাব নবম গলা বৃকেব মধ্যে ছু লো । নির্মল জানালা দিয়ে চলন্ত বাস্তা দেখলো, জবাব দিলো না ।

‘বলো ।’ মানসী প্রায় ফিসফিস কবলো ।

— ‘কী বলবো ?’

‘কোনো কথা নেই ?’

‘না ।’

‘কেন ?’

‘বলেছি তো—’

‘কী বলেছো ?’

‘অন্তের স্ত্রীব কানে বলবাব মতো কথা আমার জানা নেই ।’

‘কিন্তু অন্তের স্ত্রী-ই যদি বাত ছুপুবে বেবিষে আসতে পারে সে-কথা শোনবার জন্ত, তাহ’লে তোমার বলতে বাধা কী ?’

‘সেটাই আসল বাধা ।’

‘সত্যি কথা বলো যে আমার জন্ত আর তোমাব মনে কিছু নেই ।’

মুখ ফেরালো নির্গল, ‘আর যা-ই হই, আমি লোভী নই টুনি।’

‘এখানে লোভের প্রজ্ঞা কোথায়?’

‘বোঝো না?’

‘না।’

‘এই ক্ষণিক বুদ্ধিতে আমার কিসের সুখ। শুধু এই মুহূর্তটুকুতে আমার
‘অনন্ত ক্ষুধার কতটুকু তৃপ্তি?’

চোখে বিছাৎ হানলো মানসী, ‘ক্ষণিক কেন? ইচ্ছে করলে এই
মুহূর্তটুকুকেই তো তুমি অনন্তকালে পরিণত করতে পারো।’

‘পারি নাকি?’

‘এই গাড়ি তুমি তোমার বাড়ির দিকে ফেরাতে পারো না?’

‘ছি!’

‘ছি কিসের?’

‘শেষে আমি চুরি করবো? তোমাকে।’

‘দোষ কী।’

‘একজন ভদ্রলোক হ’য়ে আর-একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়ে
পালাবো?’

‘সে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে’

‘তাহ’লেও না।’

‘তাহ’লেও না?’

‘না।’

‘কেন?’

‘মানুষের বুকের তলায় একটা হৃদয় থাকে টুনি, মানুষ শরীরসর্বস্ব নয়।’

‘যুক্তিটা ঠিক হ’লো না। ভালোবেসে ছিনিয়ে নেওয়াই পুরুষের কাজ।’

‘স্বীকার করছি সে-পৌরুষ আমার নেই।’

‘যোগ্যতাও নেই।’

না, তাও আমার নেই। তোমার শরীর ঘিরে আজ যে-আরাম,
দাচ্ছন্দ্য আর যে-তপ্তি ছড়িয়ে রেখেছেন তোমার স্বামী, নির্মল
কীরের সাধ্য কী তা তোমাকে দিতে পারে?’

‘তুমি ভীক।’

‘হয়তো।’

‘কাপুরুষ।’

‘হয়তো।’

‘আসলে এ-সব হীনীতি তোমার আমাকে এড়াবার যুক্তি।’

হাসিলো নির্মল, ‘তাহ’লে তো আজকের এই অসহ সময়গুলোর হাত
ক অন্তত রক্ষা পেতে পারতাম। কিন্তু আর কতদূর তোমার লাড়ি।
মি আর পারছি না।’

‘তবে তুমি এলে কেন আমার সঙ্গে?’

‘তুমি ভুল ক’রে পয়সা নিয়ে আসো নি।’

‘না-ই বা এনেছিলাম।’

‘কত রাত হ’য়ে গেছে, একা-একা—’

‘দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমন তো কত
কত দিন আমার শূণ্য হাতে একা পথে কেটেছে নির্মল, তুমি
থায় ছিলে?’

‘ছিলাম। তোমার সঙ্গেই ছিলাম।’ নির্মলের পুরুষ-গলা হাহাকারে
র উঠলো, ‘তোমাকেই পাগলের মতো খুঁজে বেড়াছিলাম দেশ থেকে
পালিয়ে, পথে ঘাটে ফুটপাতে।’

‘আমাকে?’

‘তোমাকে। শুধু তোমাকে।’

‘আমাকে তবে তুমি ভুলে যাও নি?’

‘ভুলবো!’ i

সহসা মানসী নির্মলের সারাদিনের খাটুনিরাস্তা ধূলিধূসরিত হুঁ-
হাত টেনে নিলো নিজের নরম স্নিগ্ধ হাতের মুঠোয়, ‘আর এতো
দেখা হ’লো?’

‘এতোদিনে।’

‘আর তারপর?’

‘তারপর!’ জলভরা চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেললো নির্মল, ‘তার
আশাটুকুও গেলো। এতোদিনে আমি সব রকমে কাঙাল হলাম, টুনি

এ-কথা শুনে বুক ভরা কত দুঃখের পাষণ আজ গ’লে গেলো টুনি
অসহ্য কান্নার বেগে কোলের উপর ভেঙে প’ড়ে বললো, ‘জাখো, ভা-
ক’রে জাখো, সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি আজও তোমার
চেয়ে ব’সে আছি কিনা।’

এলো খোঁপা খুলে গেলো মানসীর,— ঘন কালো চুল ছড়িয়ে গে
চারপাশে। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ’য়ে ব’সে রইলো নির্মল। তারপর সেই চু-
অরণ্যে মুখ ডুবিয়ে কখন যেন ডেকে উঠলো, ‘টুনি। আমার টুনি!।
পাখি আমার।’